চলমান জীবন

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়



রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী
কলকাতা-১২

প্রথম রূপা সংস্করণ : জ্যৈষ্ঠ,—১৩৬৪

প্রকাশক : ডি. মেহ্‌রা
রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলকাতা-১২

মুদ্রক : দেবেশ দত্ত
অরুণিমা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌
৮১ সিমলা স্ট্রীট, কলকাতা-৬

প্রচ্ছদ : পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়

আজ তুমি আর নাই, দূর হতে গেছ তুমি দূরে,
বিধুর হয়েছে সন্ধ্যা মুছে যাওয়া তোমার সিন্দূরে,
সঙ্গীহীন এ জীবন শূন্য ঘরে হয়েছে শ্রীহীন,
সব মানি—সবচেয়ে মানি, তুমি ছিলে একদিন।

চলমান জীবন

জীবনযাত্রার বিভিন্নস্তর ভেদ করে প্রত্নতাত্ত্বিকের মত লেখক অগ্রসর হয়েছেন। কত বিচিত্র চরিত্র, কত বিচিত্র ঘটনা তাঁর আবিষ্কারের পথ ধরে পাঠকের চোখের সামনে উপস্থিত হয়েছে।

একটি দীর্ঘ কালপ্রবাহে যে সকল কথাবস্তু পলিমাটির অন্তরালে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল, তা দক্ষ কৃষকের হাতে সার্থক সোনার ফসলে পরিণতি লাভ করেছে। চলমান জীবনের স্রোতে ঘটনা তুলেছে আবর্ত, আর মানুষ সেই আবর্তে বিচিত্র ছন্দে, রূপে আবর্তিত হয়েছে।

প্রথম সংস্করণের নিবেদন

'চলমান জীবন'-এর দ্বিতীয় পর্ব প্রকাশিত হল, কত পর্বে কোথায় গিয়ে শেষ হবে, তার কোন ভরসাই দিতে পারছি না, পথের চলার শেষ কি আছে?

জীবনযাত্রার অনেক স্তর ভেদ করে বিস্মৃতির গভীর গহ্বর থেকে স্মৃতির রাজ্যে যে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের কাজ স্বেচ্ছায় বরণ করে নিয়েছি, তাতে সমসাময়িক পত্র-পত্রিকার এবং চলমান জীবনের সাথীদের স্মৃতি আলোক-সম্পাত করেনি—তা নয়, কিন্তু সুরাহা খুব বেশী হয়নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্মৃতির উপর নির্ভর করতে হয়েছে। অসুবিধা যা বোধ করেছি তা হল স্মৃতির গহনে সব বৃক্ষ লতা গুল্ম-আগাছা জড়াজড়ি হয়ে একাকার হয়ে গেছে, তাদের পৃথক করে নিতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে, কোন কোন ক্ষেত্রে হয়ত জট খুলতেই পারি নি।

অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করেছেন, কথাবার্তা আলোচনা যেমন ভাবে লিপিবদ্ধ করেছি, আসলে ঠিক তেমনটি চলেছিল কি না। পাঠক সাধারণকে কৈফিয়তে জানাচ্ছি যে, কোন শর্টহ্যাণ্ড নোট বা নিজস্ব ডায়েরি না থাকার ফলে এতদিন আগের বাক্যালাপ যথাযথ পুনরুল্লেখ করা সম্ভব হয়নি। কার সঙ্গে মূলত কি বিষয় নিয়ে কখন আলোচনা হয়েছে তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মনে আছে, তারপর প্রতি ব্যক্তির চরিত্র ও দৃষ্টিভঙ্গী তখন যা ছিল, তার ওপর ভিত্তি করেই তাকে প্রকাশ করবার আগ্রহে স্মৃতিধৃত বাস্তবের কিছু কিছু যে এদিক ওদিক হয়নি, এমন কথা বলা চলে না। বাস্তব ঘটনা নিয়ে রচিত সাহিত্য ও জীবনী-মূলক সাহিত্যে এইভাবে কল্পনার বার্নিশ চড়ানো বর্তমানের পশ্চিমী সাহিত্য দর্পণের অননুমোদিত হয়। শাস্ত্রকারের নির্দেশ যে, চরিত্রের বৈশিষ্ট্যকে যথার্থভাবে প্রকাশ করার প্রয়োজনেই কিছু কাল্পনিক সৃষ্টি চলতে পারে, অন্যথায় নয়। এই নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালনের চেষ্টা করেছি, অবশ্য চরিত্র বলতে আমি বুঝেছি, আমার চোখে চরিত্রের যে দিকটা যেমন ভাবে ধরা পড়েছে, তাই। আপ্রাণ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যদি কারো প্রতি এতটুকু অবিচার করে থাকি ত তার জন্যে মার্জনা ভিক্ষা করছি।

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

চলমান জীবনের পথ চলা ইতিমধ্যে দশবছর এগিয়ে গেছে। চলমান জীবন গ্রন্থের পর্ব সংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়োজন বেড়েছে, অথচ আয়ু এসেছে কমে। দ্বিতীয় পর্ব রচনার পর দৈহিক আলস্যের ও মানসিক বন্ধ্যাত্বের এক পর্ব চলছিল। ইদানীং তৃতীয় পর্বে হাত দেওয়ার ফলে দ্বিতীয় পর্ব পুনর্মুদ্রণ প্রয়াস স্বভাবতই জাগল ও সার্থক হল 'রূপা'র আগ্রহে।

এতদিনে স্মৃতির দীপ ক্ষীণতর হবার আশঙ্কা, তবু তারই মধ্যে দু-একটি নতুন ঘটনা মনে পড়েছে এবং তা দ্বিতীয় পর্বে সংযোজিত হয়েছে। তবে যে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে জীবনের পথচলা তার মধ্যে কোন পরিবর্তন এসেছে বলে মনে হয় নি। যদি হত, তাহলে বর্তমান গ্রন্থের রূপায়নেও পরিবর্তনের কথা মনে জাগত। তা জাগে নি বলেই সামান্য সংযোজন ছাড়া বাকী অংশে কোন পরিবর্তন না করেই দ্বিতীয় পর্বের নতুন সংস্করণ প্রকাশ করলাম।

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

এতদিন যেখানে যেভাবেই থেকেছি, এবার জীবনকে যতখানি এলিয়ে দিতে পেলাম এর আগে তার এতটুকুও সম্ভব হয় নি। একেবারে ছোটবেলায় যখন ছিলাম গ্রামে, তখন অনেকখানি স্বাধীনতা উপভোগ করেছি বটে, তবে সে ছিল জোর করে অনধিকার আদায় করা। বিশেষত বাবা বা দাদারা কেউ থাকতেন না গ্রামে, আমি ছিলাম শুধু নিজের বাড়ীর নয়, পাশাপাশি আরও কয়েকখানা বাড়ীর একমাত্র পুরুষ অভিভাবক। তাই যখন যা-কিছু করেছি তাতে কেউ বাধা দেয়নি, তবুও স্বাধীনতা যে অন্যায়রকম বেশী ভোগ করেছি এ বিষয়ে মতভেদ ছিল না।

তারপর জোড়হাট থেকে ঢাকা, ঢাকা থেকে কোণ্ডা, কোণ্ডা থেকে বালিগঞ্জ 'কমলালয়'—সর্বত্রই পারিবারিক শৃঙ্খলাকে অল্পবিস্তর মেনে চলতে হয়েছে; স্বীকার করতে হয়েছে সেই-সেই পরিবারের ভালমন্দ, শালীনতা-অশালীনতার মাপকাঠিকে।

এবার এসে বসলাম একেবারে মুক্ত আকাশের নিচে। জানি, মাথায় ছাদ নেই, ঝড়ঝঞ্ঝা রৌদ্রতাপ—সব কিছু সহ্য করতে হবে। আত্মীয়-বন্ধু যাঁরা আছেন তাঁরাও কেউ এখানে কায়েম হতে আসেন নি। তাঁদের উপরেই বা নির্ভর করবার আছে কতটুকু? আর আমিও ত চলমান পথিক, কোন চটিতেই বেশী সময় অপচয় করব না। তবুও এই নিরাশ্রয়তার মধ্যেও মুক্তির স্বাদে হৃদয় আমার ভরে উঠল। চার পাশে মুক্তপ্রান্তর, চার দিক থেকে ডাক এসে পৌছতে বা সে ডাকে সাড়া দিতে এতটুকু বাধা নেই।

তিন তলার ছোট্ট কুঠুরিতে কেওড়া কাঠের তক্তপোশে সতরঞ্চি বিছানো বিছানা, সেখানে নটা অবধি ঘুমিয়ে দশটা অবধি বসে গুলতানি

করে এগারটা অবধি চা চেয়ে মেঝেতে পদক্ষেপ করলেও কেউ প্রশ্ন করবে না, এতটুকুও আপত্তি জানাবে না। প্রথম দু-তিন দিন ঝি চারু চা নিয়ে এসে তিন-চার বার ফিরে গেছে, ঘুম ভাঙাতে সাহস করেনি, আর তার দায়ই বা ছিল কি! শেষ পর্যন্ত চাপা দিয়ে চা রেখে গেলে সে জল-চা খাওয়ার দায়িত্ব আমারই।

কেরানী যাঁরা ছিলেন মেসে, তাঁদেরও স্বাধীনতা আমার সমান হলেও দশটায় আপিস পৌছতে হত তাঁদের, আর আমার দুটোর জায়গায় তিনটে হলেও কেউ কৈফিয়ৎ তলব করে না। আপিসের শেষে বেলা চারটের পরে চৌধুরী মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হত তাঁর আপিসে, সেও সপ্তাহে মাত্র তিন দিন, যে তিন দিন তিনি আসতেন আপিসে। বিশেষ কথাবার্তার জন্য অবশ্য রবিবার সকালে ওঁর বাড়ী যেতাম। অর্থাৎ রবিবারেই ছিল আমার সকাল সকাল ওঠার তাড়া, দশটার মধ্যে আপিসে বেরুবার প্রয়োজন।

সকালের দিকে যোগেশ, নীলুদা—এরাও আমাকে ব্যতিব্যস্ত করত না। নিজেদের ত বেরুবার তাড়া ছিলই, তা ছাড়া, তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, অনেক রাত পর্যন্ত আমি লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকি। অতএব সকালে ওঠা আমার জন্যে নয়। আমার যখন দিন শুরু হত, মেসে তখন আমিই একচ্ছত্র, ঝি আর ঠাকুর ছাড়া আর সবাই বাইরে। তাই স্নানাহারের পর্বটুকু ধীরে সুস্থে বাদশাহী চালে চালানোয় কোন অসুবিধা ছিল না কারুর। কতক্ষণ কলতলা জুড়ে রইলাম, কত জল খরচ করলাম সে-বিষয়েও আমি অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করি। যেদিন মনে হয়েছে ঠাকুর দীনবন্ধু বা চারুকে অকারণ আটকে রাখছি, সেদিনই ওদের বলে দিয়েছি খাবার ঢেকে রেখে নিজেদের স্নানাহার সেরে নিতে। চারু খাবার নিয়ে চলে যেত, কিন্তু দীনবন্ধুই ছিল মেসের বন্ধু, সর্বক্ষণই পাহারাদার, সে বড় একটা রাজী হত না আমার আগে খেয়ে নিতে।

বাড়ী ফিরবার পথে তিন নম্বর হেস্টিংস স্ট্রীট থেকে শেয়ালদা পায়ে হেঁটেই মেরে দিয়েছি, দশটা-পাঁচটা আপিসের ক্লান্তি ছিল না দেহে মনে। বারটায় ভাত খাওয়ার পর আপিসে বার দুয়েক চা খেয়ে পাঁচটার সময় যখন বার হতাম তখন শরীর রীতিমত চাঙা, টানা দু-তিন মাইল হেঁটে মেসে ফেরা—সে ত হাঁটা নয়, সান্ধ্যভ্রমণ।

আমি ফিরবার আগেই প্রায় সকলেই ফিরে আসে। ট্রামে আসে তারা, আপিস থেকে সটান মেসে। আর আমি আসি ঢিক ঢিক করে, যেখানে একটু গুলতানির গন্ধ আছে সেখানে ঠোকর মারতে মারতে।

মেসের দরজা পেরিয়ে উপরে আর ওঠা হয় না। পায়ের শব্দ পেতেই সামনের বড় ঘর থেকে প্রবীণ হরেন চাটুজ্যে হেঁকে ওঠেন, 'আরে পবিত্র, এসো এসো। সকালে ত তোমার দর্শন পাওয়াই যায় না।'

ঘরে ঢুকে অনেকগুলো তক্তপোশের যে-কোন একটায় বসে পড়ি। লম্বা হল-ঘরে ছ-খানা তক্তপোশ পাতা, বিছানা সবই গোটানো, সতরঞ্চি বা মাদুরই তখন সেই হাঁ-করা কাষ্ঠাসনগুলির আবরণ এবং আভরণ।

হরেন চাটুজ্যেই আসর জাঁকিয়ে থাকেন, তাঁর হুকুমেই চায়ের অঢেল বন্যা বয়ে যায়, আর তার সঙ্গে খাবার ও মিষ্টির ঠোঙাও এসে জোটে মাঝে মাঝে। শুধু বৈকালিক আড্ডার রসদ হিসেবেই খাবার নয়, এই প্রৌঢ় ভোজনরসিক মহাশয় সকলকে পরিতৃপ্ত ভোজন করিয়ে নিজের ভোজন পূর্ণাঙ্গ করেন। বর্ষার দিনে কত দিন তাঁর নির্দেশে ইলিশ মাছ ভাজা হয়েছে, অতিরিক্ত বখশিশ দিয়ে অসময়ে ঠাকুরকে দিয়ে ভাজিয়ে দিয়েছেন। ভোজনরসিক মানুষ, নিজে হাতে বাজার করলে তবে তৃপ্তি পান তিনি, অথচ প্রয়োজনবোধে নানাজনকে বাজার করবার ভার দিতে হয়। খেয়ে অখুশী হলে তাঁর যত রোখ পড়ে গিয়ে বাজার-করিয়ের উপর। সুরেশদাকে ত একদিন একেবারে তেড়ে উঠলেন।

আপনার পছন্দ না হয়, নিজেই যান না বাজারে, জবাব করেন সুরেশদা।

চাটুজ্যে মশায় দমবার পাত্র নন, কাজ ক্ষতি করেও বাজার করার দায়িত্ব হাতে তুলে নেন। খাসা বাজার আসে, নিমন্ত্রণ চলে। কিন্তু মাসের শেষে হিসাব করে খরচা ভাগের সময় সবার চক্ষু স্থির! খেতেই যদি এত লাগে, তবে দেউলে হতে আর কত দিন!

একদিন রেগে বলে ওঠেন চাটুয্যে মহাশয়, যাও যাও, অতিরিক্ত খরচ যা হয়েছে, আমার নামে ধরে দাও।

জানি জানি, বলেন সুরেশদা, টাকা থাকলে আপনি বার মাস আমাদের বিনা খরচে মেসে রেখে নেমন্তন্ন খাওয়াতেন, কিন্তু আপনার

ট্যাকের খবরও ত রাখি, আপনাকে দেউলে করে রোজ ভোজ খেলে আমাদের কি তা হজম হবে?

হজম না হয়, নিয়মিত নাক্সভমিকা খেয়ো, দাম তার বেশী নয়,, বলেন চাটুয্যে মশায়।

সন্ধ্যার মেসের আড্ডা নিয়মিত টানলেও সে আকর্ষণ আমাকে ঠেকাতে হল। যে উদ্দেশ্যে 'কমলালয়' ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছি সে ত শুধু ছেঁড়া চাটাইয়ে বসে রাজা-উজির মারা নয়। নানা দিকে নানা সাহিত্যিক গোষ্ঠীর সঙ্গে পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়ে সাহিত্য-আন্দোলনের আবর্তে গা ভাসিয়ে দিতে চাই।

আপিস থেকে বেরিয়ে একদিন সোজা এসে তাই হাজির হলাম বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-মন্দিরে। বিশেষ উদ্দেশ্য, তাঁদের জানিয়ে যাব যে, আমি এখন মুক্ত পুরুষ, যে-কোন কাজে লাগতে পারি।

রামকমলদার ঘরে বসে বিশেষ কোন কথা পাড়বার আগেই দেখলাম বগলে যথারীতি দৈনিক, সাময়িক পত্রিকা এবং বইয়ের বাণ্ডিল চেপে ধরে হন্তদন্ত হয়ে নলিনী পণ্ডিত মহাশয়ের প্রবেশ। টেবিলের উপর বোঝা নামিয়ে আমার পাশেই একটা চেয়ারে বসে পড়লেন তিনি। প্রশ্ন করলেন, কি খবর পবিত্র?

আমি নিঃসঙ্কোচে তাঁকে আসবার উদ্দেশ্য জানিয়ে দিলাম। চোখ-মুখ তাঁর আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। বলে উঠলেন, সাধে কি বলি রামকমলবাবু, ভগবান আছেন!

রামকমল সিংহ নলিনীদার মুখের দিকে তাকালেন।

সাহিত্য-সম্মেলন এসে গেছে, বলে চললেন নলিনীদা, তার মধ্যে অনেক জটিল সমস্যা, অথচ ছুটাছুটি করবার লোক নেই। ভেবে মরছি, এমন সময় অভাবনীয় ভাবে পবিত্রর আবির্ভাব। এ কি ঈশ্বরের দয়া না হলে হয়!

ঈশ্বরের দয়ায় আপনার নির্ভরতা সুবিদিত পণ্ডিতজী, রামকমলদা মন্তব্য করলেন। কিন্তু উৎসাহের আতিশয্যে গলে পড়বেন না। পবিত্রকে কাজে লাগাতে হলে কতটা কি ও করতে পারবে—সব বুঝে ও ছকে নিয়ে কাজ করবেন।

নলিনীদার মুখ এবার দেখলাম গম্ভীর। বললেন, তা তুমি ত এলে পবিত্র, কিন্তু তোমার সামান্য আয়ে মেস খরচা দিয়ে চালাবে কি করে?

ভগবান চালাবেন, আমি জবাব করলাম।

ঠিক বলেছ, বললেন নলিনীদা, ওইটুকু নির্ভরশীলতা না থাকলে ভাবনা ভাবতে ভাবতেই দিন যাবে, কাজের কাজ হবে না কিছুই। তুমি ভেবো না পবিত্র, ব্যবস্থা যা-হোক হয়ে যাবে।

আমি আর ভাবছি কই, আমি জবাবে বললাম। আর আমার ভাবনার দরকারও ত দেখছি না। আমার ভাবনার ভার ত আপনিই মাথায় তুলে নিলেন। এখন কাজ করিয়ে নিন আমাকে দিয়ে, অবশ্য আমার যোগ্যতায় যেটুকু কুলোবে।

তুমি বোধ হয় জান যে, ছয়ই বোশেখ থেকে তিন দিন হাওড়া ময়দানে আমাদের বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলন বসবে। প্রধান সভাপতি হবেন স্যার আশুতোষ, অথচ পরিষদের বড় কর্তারা থাকবেন অনুপস্থিত।

কেন, আমি প্রশ্ন করলাম।

রামেন্দ্রবাবুর মাতৃবিয়োগ হয়েছে, তিনি শ্রাদ্ধাদির জন্য দেশে চলে যাচ্ছেন, আর হীরেনবাবু, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, খগেনদা—এঁরা সকলেই যাচ্ছেন মৈমনসিংহে প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে। ঈস্টারের ছুটি বুঝে দুই সম্মেলনই একসঙ্গে বসছে।

আমাকে দিয়ে ত আর মণ্ডপ ঝাঁট দেওয়ার বেশী কাজ পাবেন না, বললাম আমি। যাঁরা অনুপস্থিত তাঁরা সকলেই দিকপাল। তাঁদের অভাব মিটবে কি দিয়ে?

মিটবে না ঠিক ভাই, তবু বালির বাঁধ দিয়েই ইটপাথরের কাজ চালিয়ে নেবো আমরা। আর তা ছাড়া, জান ত অঙ্গাঙ্গী ভাবমজ্ঞাত্বা কথং সামর্থ্যনির্ণয়ঃ, কাজেই তোমাকে দিয়ে কতখানি কাজ হতে পারে তা তুমি এখনও বুঝে উঠতে পারবে না। যা-হোক, সে সব আলোচনা পরে হবে, তবে তোমাকে একটু খেয়াল রাখতে হবে যে, এই কটা দিন তোমাকে পুরোপুরি আমরা পেতে চাই।

সে সব কথা পরে হওয়াই ভাল, বললেন রামকমলদা, আপাতত রামেন্দ্রবাবুর বাড়ী রওনা হওয়া যাক। তুমিও যাবে নাকি পবিত্র? রামেন্দ্রবাবু আজ দেশ চলে যাচ্ছেন—মা'র শ্রাদ্ধ করতে।

নিশ্চয়ই। আগ্রহাতিশয্যে আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম।

বসো, বললেন পণ্ডিত, সেখানে আজকে চা নাও পেতে পারি, অতএব ও-পর্বটা এখান থেকে সেরে যাওয়াই ভাল। রামকমলবাবু—

চা এখুনি এসে যাবে, বললেন রামকমলদা, সময় হয়ে গেছে, সে

কথা ত জানেন পণ্ডিতজী। আর পবিত্রও ত চালাক ছেলে, সময় না বুঝে কি আর এসেছে!

পবিত্রকে আপনি যে লজ্জা দিলেন, বললেন নলিনীদা, এর পর হয় ত ও এসময় আসবেই না, 'কিন্তু' করবে।

আরে দুর্, বললেন রামকমলদা, ও রকম পর-পর ভাবলে পবিত্র নিজে থেকে এসে হাজির হত কি? আপনার আমার চা কেড়ে ভাগ করে খাবার অধিকার নিয়েই ও এসেছে।

চা এসে গেছে, আমি বললাম। এখন কাপে ঝড় থামিয়ে চুমুক লাগানো যাক।

আমহার্স্ট স্ট্রীট ধরে পা চালিয়ে পটলডাঙায় রামেন্দ্রসুন্দরের বাড়ী যখন আমরা এসে পৌঁছেছি তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। দরজার সামনেই চোখে পড়ল খালি একটা পালকি। রাস্তার একধারে বসে জন আষ্টেক উড়ে বেহারা জটলা করছে।

বেরুবার দেরি নেই, মনে হচ্ছে, বললেন নলিনীদা।

সদর পার হয়েই ডান দিকের ঘরে ঢুকে দেখা গেল একখানা কম্বলের উপর তিনি বসে আছেন। দেহ যথেষ্ট শীর্ণ, মুখে চোখে অসুস্থতার ছাপ।

তিনি এসো বলতেই আমরা মেজের উপর বসে পড়েছি। রামেন্দ্রবাবু হা-হা করে উঠলেন। একটা বসবার কিছু—

আপনার বাড়ীর ধুলোই ত আমাদের আসন, আমি হঠাৎ বলে ফেললাম।

যে সমাজে পবিত্রর মেলামেশা তার সংস্কৃতি বহন করে এনেছে ও কথার মধ্যে, বললেন রামেন্দ্রসুন্দর।

একটা সুখবর আছে, বললেন নলিনীদা, সম্মেলনের কাজে পবিত্রকে পাওয়া যাবে।

পাওয়া যাবে? খুব ভাল কথা, রামেন্দ্রসুন্দরের চিন্তাকুল মুখে মুহূর্তের জন্য একটা স্বস্তির আবেশ প্রকাশ পেল। দেখো পবিত্র, দেশে আমাকে যেতেই হচ্ছে, আর শরীর যে অসুস্থ, তাতে এখানে থেকেই যে কি করতে পারতাম, জানি না। তোমরাই দেখে-শুনে চালাও। আর ভার ত তোমাদের একদিন নিতেই হবে, আমরা আর কতদিন থাকব!

গাড়ীর ত অনেক দেরি আছে, বললেন রামকমলদা, আপনি এখনি বেরুবেন বলেই মনে হচ্ছে যেন!

শরীর যা অসুস্থ, কি করি বল। কোন তাড়াহুড়োই সামলাতে পারব না। ভালয় ভালয় দেশে পৌঁছে মা'র কাজটুকু করতে পারি, তা হলেই হয়, নইলে দিন ত ফুরিয়ে এল।

এই শরীর নিয়ে দেশে না গিয়ে গঙ্গাতীরে মা'র আদ্যকৃত্য করলে ভাল হত না কি? আমি প্রশ্ন করলাম।

তা হয় না পবিত্র, একটু মুচকি হেসে উত্তর করলেন তিনি। আমার গ্রামের দশজন লোক গরীব সাধারণ প্রজা—সবাই জানে রামেন্দ্রসুন্দরের মা মরেছেন। তাদের কিছু প্রাপ্য আছে সে অনুষ্ঠানে, হয় ত এক পেট খাওয়ার বেশী কিছুই নয়, কিন্তু তাতে তাদের বঞ্চিত করি কি করে!

তা বলে এ শরীর নিয়ে, বললেন নলিনীদা।

শরীরের অজুহাত দেখিয়ে অন্যের ন্যায্য পাওনা ঠেকানো যায় না ভাই। আর আমার মা'র আত্মাও কি তাতে তৃপ্ত হবে? তাঁর গাঁয়ের মাটি, দেশের দশজন, তাঁর সব চেয়ে বড় তীর্থ ছিল, সে কথা আমি ভুলি কি করে?

সম্মিলনী সম্বন্ধে আর কোন নির্দেশ রেখে যাবেন কি, জিজ্ঞাসা করলেন নলিনীরঞ্জন।

নির্দেশ ত সব দেওয়াই আছে, বললেন রামেন্দ্রসুন্দর। গুরুত্ব বুঝে এর উপর নিজের বিচারবুদ্ধি খাটাবে, আর কাশিমবাজারকে বললে তিনিও সব দিক দিয়ে তোমাদের সাহায্য করবেন। চুণীবাবু এবং গিরিশবাবুর সঙ্গেও পরামর্শ করতে পার।

আমার উপরও ত হুকুম রেখে যাচ্ছেন, আমি বললাম, নির্দেশ যা-কিছু নলিনীদার কাছ থেকেই নেবো। তবু আশীর্বাদ রেখে যান, সবটুকু গুরুভার যেন বহন করতে পারি।

এত ভয় পাচ্ছ কেন তুমি, বললেন রামকমলবাবু।

ভরসা পাওয়ার মত আত্মবিশ্বাস নেই বলে।

ভিতর থেকে একজন এসে জানালেন রওনা হবার সময় হয়ে গেছে।

তা হলে আমি চলি। ভগবানের ইচ্ছা থাকলে আবার দেখা হবে।

অত্যন্ত আয়াসে উঠে দাঁড়ালেন ত্রিবেদী মহাশয়। এগিয়ে এসে হাত ধরলেন শীতলবাবু, রামকমলদা ধরলেন আর এক পাশে। অত্যন্ত কষ্টে ধীর পাদক্ষেপে এগিয়ে চললেন তিনি। আমি আর নলিনীদা এলাম পিছনে পিছনে।

আট বেহারা অতি সন্তর্পণে পালকি কাঁধে তুলে নিল, চারপাশে অনেকে ভিড় করেছেন, তাঁদের অনেকেই পালকির সঙ্গে সঙ্গে পায়ে হেঁটে হাওড়া স্টেশনে যাবেন। বেহারাদের ডেকে শীতলবাবু বললেন, ছাখো বাপু, খুব আস্তে আস্তে সাবধানে যাবে, কোন ঝাঁকুনি না লাগে। নইলে গাড়ী ছেড়ে পালকীর ব্যবস্থা করা হোত না।

বড় রাস্তা পর্যন্ত আমরাও পালকির পিছনে পিছনে এলাম। তারপর রামকমলদা ও নলিনীদা পরিষদে ফিরে গেলেন, আমি পরদিন দেখা করবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মেসে ফিরলাম।

সকাল বেলাই নলিনীদা এসে মেসে হাজির।

হঠাৎ কি মনে করে নলিনীদা? আমি প্রশ্ন করলাম।

হঠাৎ কি হে, নলিনীদা জবাব করলেন, পরশু সাহিত্য-সম্মিলনী। আর সে বিষয়ে ত্রিবেদী মশায় যাবার সময় সবটুকু দায়িত্ব আমাদের হাতে দিয়ে গেছেন, তাকি এরই মধ্যে ভুলে গেলে নাকি!

না, ভুলে যাব কেন? তবে ব্যাপারটা সব ত ঠিক জানিনে। তাই বুঝতে একটু অসুবিধা হয়েছিল। এখন খুলে বলুন ত, কি পরিস্থিতি এবং কি আমাদের করতে হবে।

আপাতত আমার সঙ্গে যেতে হবে কাশিমবাজারের বাড়ি। চটপট তৈরি হয়ে নাও। তারপর সেখানেই সব কথা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

আমার আবার তৈরি হওয়া! গেঞ্জি গায়েই ছিল, পাঞ্জাবিটা কাঁধে ফেলে নাগরাই জুতোটা পায়ে দিয়ে বের হতে এক মিনিট সময় লাগল। এর চেয়েও চটপট চান নলিনীদা? মন্তব্য করলাম।

ঠিক আছে। চলো।

ট্রাম থেকে নেমে কাশিমবাজারের প্রাসাদে ঢুকতেই চোখে পড়ল নকল পাহাড়; সব কিছু দিয়ে পরিপাটি করে সাজানো সে প্রাসাদের পরিবেশ।

পণ্ডিত মহাশয় সে বাড়িতে পূর্ব-পরিচিত, কাজেই মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে কালবিলম্ব হল না।

আসবার পথেই নলিনীদা আমাকে কিছু কিছু বলেছিলেন। স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বময় কর্তা, হাইকোর্টের জজ এবং

বাংলার শিক্ষাজীবনে একাধিপতি বললেই হয়। অথচ সাহিত্য-পরিষদে তিনি নেই। সেই সাহিত্য-পরিষদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সাহিত্য সম্মেলনেও আশুতোষের প্রভাব যথেষ্ট নয়। সাহিত্য-সম্মেলনটিকে সাহিত্য-পরিষদ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করে গড়বার চেষ্টা করছেন তিনি। সাহিত্য-পরিষদ সর্বতোভাবে তাঁর বিরোধিতা করবার জন্য কোমর বেঁধেছে।

মহারাজ মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে অগ্রগণ্য। সাহিত্য-পরিষদের উদ্যোগে প্রথম যে সাহিত্য সম্মেলন হয় তাঁরই কাশিমবাজারস্থ প্রাসাদ প্রাঙ্গণে তা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। পরিষদ-গৃহের জমিটুকুও মহারাজের দান। কাজেই সাহিত্য-পরিষদের এই সঙ্কটে তিনিই হলেন প্রধান শরণ।

আমাকে পরিচিত করে দিলেন পণ্ডিত মশায়। বদান্যতা ও বিদ্বৎ-পোষকতা সম্বন্ধে মহারাজের খ্যাতি আমার অগোচর ছিল না। তাঁর আকৃতি ও ব্যবহারের মধ্যে সেই বদান্যতার সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি দেখতে পেলাম।

নলিনীদা বললেন, আপনার পরিষদকে দুর্বল করে দেওয়ার জন্য আশু-বাবু এবার আসরে নেমেছেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হয়েছেন হাওড়ার উকিল রায় বাহাদুর মহেন্দ্রনাথ রায়। তিনি আবার সিণ্ডিকেটের সদস্য এবং সে হিসেবে আশুবাবুর সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট সৌহার্দ্য রয়েছে। কাজেই সেদিক থেকে উদ্দেশ্য সাধনে তাঁর চেষ্টার ত্রুটি হবে না। এখন আপনার সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখবার দায়িত্ব আপনার।

এক মিনিট চুপ করে থেকে মহারাজ বললেন, আমাকে কি করতে হবে বলুন।

প্রথমত কোন কারণেই আপনার সম্মিলনীতে অনুপস্থিত থাকা চলবে না, বললেন নলিনীদা।

সম্মিলনীতে উপস্থিত আমি নিশ্চয়ই থাকব, বললেন মহারাজ। আর আশুবাবুর প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার ব্যাপারে যাকে যা বলতে হবে তাও আমি বলব।

নলিনীদা বলে চললেন, যতদূর জানতে পেরেছি, সাহিত্য-সম্মিলনীকে রেজিস্টার্ড বডি হিসেবে আলাদা প্রতিষ্ঠান গড়বার প্রস্তাবের আগে তিনি ডেলিগেটদের বিশ্বাস অর্জনের জন্য আর একটি প্রস্তাব উত্থাপন করবেন। তা হল, দুঃস্থ সাহিত্যসেবীদের সাহায্যের জন্য একটি তহবিল খোলার প্রস্তাব।

সে ত খুব ভাল কথা, পণ্ডিত মশায়। উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন মহারাজ, সর্বান্তঃকরণে সমর্থনের যোগ্য।

ঠিক এইভাবে সহজ সমর্থন লাভের জন্যই ত এ প্রস্তাব, বললেন নলিনীদা। আপনিও বিপ্রলব্ধ হচ্ছেন মহারাজ। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, দুঃস্থ সাহিত্যসেবীদের সেবার জন্য এ তহবিল নয়, কারণ সাহিত্য-পরিষদ থেকে পৃথক করে এমন একটি প্রতিষ্ঠান খাড়া করেই সাহিত্য-পরিষদকে দুর্বল করে দেওয়া সহজ হবে। আর সেই জনপ্রিয়তার সুযোগেই আশুবাবু সাহিত্য-সম্মিলনীকে আলাদা প্রতিষ্ঠান করে নিজের তাঁবে রাখতে পারবেন।

এরকম উদ্দেশ্য আরোপ করে আমরা আশুবাবুর উপরে একটু অবিচার করছি না তো, আমি না বলে পারলাম না।

ঠিক তা নয়, পবিত্র। বললেন নলিনীদা, যে-কোন কারণেই হোক, পরিষদের সঙ্গে তাঁর সদ্ভাব নেই, এবং সেই কারণেই পরিষদের প্রতি তিনি বিরূপ। মহারাজ অবশ্য সে কথা জানেন।

খুব ভাল করেই জানি, বললেন মহারাজ। তারপর আমার দিকে চেয়ে বললেন, আপনি ছেলেমানুষ, একজন দেশবিখ্যাত সম্মানিত ব্যক্তির সম্বন্ধে কোন ইঙ্গিতে আপনি যে বেদনাবোধ করছেন, এতে আপনার সুরুচিরই পরিচয় পেলাম। তবে ক্ষমতার লড়াই যেখানে চলে সেখানে পরস্পরের দোষ বড় করেই দেখতে হয়। যাই হোক পণ্ডিত মশায়, আমাকে আর কি করতে হবে? সময় ত নেই।

কিচ্ছুনা মহারাজ, ব্যবস্থা যা করবার, আমরাই করব। আপনি ভাববেন না! তবে আমাদের ঘোরাঘুরির সুবিধার জন্য আপনার একখানা মোটরগাড়ি যদি দিতে পারেন, তা হলে ভাল হয়।

গাড়ি দেওয়ার অসুবিধা আছে, পণ্ডিত মশায়। একখানা মেরামতে আছে। আর ছেলে অসুস্থ, কাজেই অপরখানা যে-কোন মুহূর্তে প্রয়োজন হতে পারে। তার চেয়ে ট্যাক্সি করে ঘোরাঘুরির জন্য বরং আপনি কিছু টাকা নিয়ে যান। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ভৃত্যকে হুকুম দিলেন, খাজাঞ্চির কাছ থেকে পঁচিশটি টাকা এনে দিতে।

টাকা হাতে নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। বিদায়-প্রসঙ্গে নলিনীদা মহারাজকে জানালেন যে, আশুবাবুর প্রস্তাব নাকচ করার ব্যাপারে তিনি যথেষ্ট আশা রাখেন।

সেখান থেকে সোজা এসে পৌছলাম অধ্যক্ষ গিরিশ বসুর বাড়ীতে। পথেই আমি নলিনীদাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আশুতোষের সঙ্গে গিরিশবাবুর যে বিরোধ আছে বলে শুনেছি, তাকি সত্যি ?

ব্যক্তিগত সদ্ভাব বা বিরোধ আজ আমাদের বিচার্য নয় ভাই, নলিনীদা মন্তব্য করলেন। সাহিত্য-পরিষদের প্রভাব এবং প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ন রাখবার প্রয়োজনে যদি আশুতোষের বিরোধিতা করতে হয়, তার মধ্যে ব্যক্তিগত প্রশ্ন অবান্তর এবং সে বিষয়ে গিরিশবাবুর সম্পূর্ণ সমর্থন পাব—এ বিশ্বাস আমার আছে।

বিজ্ঞান শাখার সভাপতি হিসাবে কোন বিশেষ ক্ষমতা আছে কি তাঁর ? আমি জিজ্ঞাসা করলাম। প্রভাব খানিকটা বেশী থাকবে নিশ্চয়ই, জবাব করলেন নলিনীদা।

ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলের বিপরীত দিকে তখন আচার্য গিরিশচন্দ্রের বাস। সেখানে তাঁর সঙ্গে যে আলোচনা হল, তাতে বুঝতে পারলাম, সবই তাঁর জানা ছিল। নলিনীদা একবার ঝালিয়ে নিলেন শুধু। আশুতোষের চেষ্টা যাতে ব্যর্থ হয় সে বিষয়ে গিরিশবাবু ঐকান্তিক চেষ্টা করবেন,—এ আশ্বাস তিনি দিয়ে দিলেন।

সেখান থেকে সোজা চলে এলাম শ্যামবাজার মহেন্দ্র বসুর গলিতে। রায় বাহাদুর ডাক্তার চুণীলাল তখন বাংলা সরকারের প্রধান রাসায়নিক পরীক্ষক। তা সত্বেও সাহিত্য এবং সাহিত্য-পরিষদ সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ ছিল অপরিসীম। বস্তুত, পরিষদের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে তিনিও ছিলেন একজন।

এ ছেলেটি কে ? জিজ্ঞাসা করলেন ডাঃ চুণীলাল।

ইনি 'সবুজপত্র'-এ প্রমথ চৌধুরীর সহকারী, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। নলিনীদা পরিচয় করিয়ে দিলেন।

'সবুজপত্র'-এর লোক, আপনাদের সঙ্গে ত তার বনিবনাও হবার কথা নয় —হেসে মন্তব্য করলেন রায় বাহাদুর।

'সবুজপত্র'-এর সঙ্গে সাহিত্য-পরিষদের বিরোধ কোন্‌খানটায়, তা ত আমি বুঝতে পারলাম না। আমি একটু রূঢ় ভাবেই মন্তব্য করলাম।

নিশ্চয়ই কোথাও বিরোধ আছে, ডাঃ চুণীলাল বললেন, নইলে প্রমথ বাবুকে ত সাহিত্য-পরিষদের ছায়া মাড়াতেও দেখেননি কেউ।

তিনি একটু কোটরপ্রিয় লোক, সে কথা ত দেশশুদ্ধ লোক জানে, আমি বললাম, চৌধুরী মশায়ের নিজের ভাষায় তিনি হলেন—উদাসীন গ্রন্থকীট।

তা ত জানি, বললেন রায় বাহাদুর, আরও একটু বেশি খবর জানি—যা আপনি জানেন না।

কি সেটা? আমি জানতে চাইলাম।

সাহিত্য-পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হবার আগে, চুণীবাবু বলে চললেন, মহারাজ নবকৃষ্ণের বাড়িতে যখন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ সাহিত্য পরিষদের বর্তমান কর্তা-ব্যক্তিরা বেঙ্গল লিটারেরি সোসাইটির অধিবেশন বসাতেন, তখন সেখানে আসতেন তরুণ প্রমথ চৌধুরী। একবার কবি জয়দেব সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ পাঠ করে তাতে এমন বম্ব্‌শেল ছাড়লেন তিনি, যে প্রাচীন-পন্থীদের সঙ্গে তাঁর দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান রচিত হয়ে গেল।

সমস্ত মুখে প্রশ্ন নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি আর নলিনীদা।

—প্রবন্ধে এক জায়গায় তিনি বলেছিলেন, গীতগোবিন্দে গীত আছে, গোবিন্দ নেই।

লাখ কথার এক কথা রায় বাহাদুর, উল্লসিত হয়ে বলে উঠলেন বৈষ্ণবভক্ত নলিনীদা, এমন কথা বীরবলই বলতে পারেন।

তর্ক থামিয়ে অল্প কথায়ই কাজের কথা সাঙ্গ করে নেওয়া গেল। রায় বাহাদুর জানালেন—ঠিক আছে। আশুতোষের প্রস্তাব পাশ হতে দেওয়া হবে না।

পরদিন শুক্রবার সকালে নলিনীদা আমাকে নিয়ে এসে হাজির হলেন শিবপুর। গিরিজাদার (কবি গিরিজাকুমার বসু) সঙ্গে আমার 'কমলালয়'-এই পরিচয় হয়েছিল। কাজেই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসে কোন অসুবিধা হল না।

গিরিজাদার সঙ্গে সলা-পরামর্শ সেরে আমরা চলে এলাম সালকিয়া ব্রজমোহন দাসের কাছে। ব্রজমোহন সম্মিলনের অন্যতম কর্মকর্তা। হাওড়ার ডেলিগেটদের পরিচয় এবং অন্যান্য ডেলিগেটদের তালিকা সংগ্রহে ব্রজমোহন আমাদের সহায়তা করবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। অবশ্য আমাদের মূল উদ্দেশ্য তাঁর কাছে ব্যক্ত না করেই কেবলমাত্র তাঁর সৌজন্যের সুযোগে কাজ হাসিল করে এলাম।

শনিবার অপরাহ্ণে হাওড়া ময়দানের সুসজ্জিত প্যাণ্ডেলে সম্মিলনীর কাজ শুরু হল। জাঁকজমকের অন্ত নেই, রাজনীতির ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের যে চরম সঙ্কট ঘনায়মান তার এতটুকু ইঙ্গিতও নেই সেখানে। বস্তুত, আমরাও সেকথা ভেবে বিব্রত ছিলাম না। আশুতোষের অভিভাষণের ভাবগাম্ভীর্য আমাদের

মনে বিন্দুমাত্র রেখাপাত করেনি। আমার মন তখন রণক্ষেত্রে ব্যূহ রচনায় ব্যস্ত।

সভামঞ্চে দেখলাম বিভিন্ন শাখার সভাপতিগণ সমাসীন। সাহিত্যে মহা মহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, দর্শনে রায় বাহাদুর যদুনাথ মজুমদার, ইতিহাসে ডক্টর প্রমথনাথ বন্দোপাধ্যায়। বিজ্ঞান শাখার সভাপতি গিরিশচন্দ্র বসুও আছেন। প্রদর্শনীর উদ্বোধক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় আর রায় বাহাদুর মহেন্দ্রনাথ রায়, চুণীলাল বসু, মহারাজ মনীন্দ্রচন্দ্র—এঁরাও মঞ্চে আছেন।

ডেলিগেটদের একখানি তালিকা ইতিমধ্যেই ব্রজমোহনের চেষ্টায় আমার হস্তগত হয়েছিল। অভ্যর্থনা সমিতির অধিকাংশ সদস্যই এই বিরোধে আশুতোষের পক্ষে। এই অবস্থায় সম্মিলনী-মণ্ডপের মধ্যে ডেলিগেট ভাঙানোর মত কঠিন কাজের দায়িত্ব একাকী বহন করতে আমি খুব স্বস্তিবোধ করছিলাম না। ডেলিগেট-তালিকায় চট্টগ্রামের কবি শশাঙ্কমোহন সেনের নাম চোখে পড়তেই তাঁকে খুঁজে বার করলাম। পূর্ব-পরিচয়ের সূত্রে তিনি আমাকে স্নেহ-ভরেই গ্রহণ করলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমার আসল উদ্দেশ্য তাঁর কাছে আর ব্যক্ত করা হল না। কারণ, তাঁরই কাছে জানলাম, বর্তমানে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙলার অধ্যাপনা করছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের পক্ষে আশুতোষের প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধাচরণ যে কোনমতেই সম্ভব নয়, এটুকু হৃদয়ঙ্গম করেই আমি অন্য কথা বলে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

ডেলিগেট-তালিকায় তিনজন মুসলমানের নাম—বিশেষ করে একই ঠিকানায়—আমার ঔৎসুক্য জাগ্রত করল। বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-সমিতির প্রতিনিধি তাঁরা। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, মৌলবী মোজাম্মেল হক আর মুজফ্ফর আহমদ। এঁদের খুঁজে বার করে আত্মপরিচয় প্রদান করলাম এবং তাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচিতির আগ্রহ জানালাম। বত্রিশ নম্বর কলেজ স্ট্রীট তাঁদের ডেরায় আসবার সাগ্রহ আমন্ত্রণ জানালেন, সেই ডেরার মালিক মুজফ্ফর আহমদ।

সেদিনকার অধিবেশন ভাঙার পর তাঁদেরই সঙ্গে সোজা তাঁদের ডেরায় এসে হাজির হলাম। তিন জনেই আমার প্রায় সমবয়সী। মোজাম্মেল হক সাহেব হেয়ার স্কুলের শিক্ষক ও কারমাইকেল মুসলিম ছাত্রাবাসের অধ্যক্ষ। শহীদুল্লাহ্ সাহেব তখন সদ্য এম. এ. পাশ করে ভাষাতত্ত্বের গবেষণায় নিযুক্ত। আর এঁদের মধ্যে তরুণতম মুজফ্ফর তখন বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-সমিতির অন্যতর সম্পাদক। তাঁদের আন্তরিকতায় আমি সহজেই ঘনিষ্ঠ

হয়ে উঠলাম। চা, পান, দোক্তা—অতিথি সৎকারের এবং আড্ডা জমাবার এই প্রধান উপাদান কয়টি সবই এসে হাজির হল। সময় ও পরিবেশ বুঝে আমি তাঁদের কাছে আমার প্রস্তাব পাড়লাম। তিনজনেই গভীর অভিনিবেশে আমার বক্তব্যগুলি শুনলেন। জবাব দিলেন কিন্তু সব চেয়ে স্বল্পভাষী মুজফ্‌ফর আহমদ। শান্ত ও ধীর ভাবে মৃদুকণ্ঠে তিনি যা বললেন তার মর্মার্থ হল: সাহিত্যসেবার ব্যাপারে কোন দলাদলিতে তিনি বিশ্বাস করেন না। বরং দলাদলির মূলোচ্ছেদ করাই তাঁর অভিপ্রায়।

এবারে আমি দলাদলির মূল কারণটি বিশ্লেষণ করলাম। আবার জবাব দিলেন মুজফ্‌ফর:

আপনার কথায় বুঝতে পারছি যে, এখানে ব্যক্তির সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের বিরোধ বেধেছে, অর্থাৎ—বাংলা-সাহিত্যের প্রসারে প্রধান হবেন কে,—স্যর আশুতোষ, না বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, এই ত?

ঠিক তাই, আমি মন্তব্য করলাম। বিশেষত, সাহিত্য-পরিষদের একমাত্র ব্রত সাহিত্যের সেবা আর স্যর আশুতোষ বহুব্যাপারী। পণ্ডিত, বিচক্ষণ, এবং কর্মবীর হলেও সাহিত্য-সেবার কাজে তিনি তাঁর সময় এবং শক্তির একটি সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র নিয়োগ করতে পারবেন।

আশুতোষের সঙ্গে পরিষদের সহযোগিতা সম্ভব হয় না কি? প্রশ্ন করলেন মুজফ্‌ফর।

সে বিষয় আমার সন্দেহ আছে, মন্তব্য করলেন শহীদুল্লাহ্‌।

পরিষদের পরিচালকেরা কেউ আশুতোষকে চান না, বললাম আমি। তাঁদের আশঙ্কা, আশুতোষের প্রভাবে পরিষদে আর কারুর ব্যক্তিত্ব বা মতামত স্বীকৃত হবে না, যেমন হয় না বিশ্ববিদ্যালয়ে।

ব্যক্তির চেয়ে প্রতিষ্ঠানের দাবি সব সময়েই বড়, বললেন মুজফ্‌ফর। কাজেই পরিষদের প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা অক্ষুন্ন রাখবার জন্য ব্যক্তি-নির্বিশেষে যে-কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধাচরণ প্রয়োজন হয়, করতেই হবে। এ বিষয় আমরা নিশ্চয়ই আপনাদের সহযোগিতা করব।

শহীদুল্লাহ্‌ সাহেব ও হক সাহেব উভয়েই সর্বান্তঃকরণে সমর্থন জানালেন। হক সাহেব বললেন, পরিষদ কোন ব্যক্তিবিশেষের প্রতিষ্ঠান নয়। বাংলা-সাহিত্য-সেবীমাত্রই সেখানে সমানাধিকার ভোগ করবে।

হক সাহেব বললেন, যাঁরা পরিষদ প্রতিষ্ঠা করেছেন তাঁরা সকলেই

দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তি। সকলের সমবেত প্রচেষ্টাই একজনের নিয়ন্ত্রণের চেয়ে বেশী কার্যকরী হবে, এটুকু আমি বুঝি।

ঠিক আছে, পবিত্রবাবু, আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। যে-কোন অ-গণতান্ত্রিক প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে আমরা দাঁড়াব।

মুজফ্ফর আহমদের কাছে এই আশ্বাস পেয়ে হৃষ্টচিত্তে মেসে ফিরলাম।

পরদিন রবিবার বিভিন্ন শাখার অধিবেশন। এই অধিবেশনগুলির মধ্যে বিশেষ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হল ইতিহাস শাখায়। পণ্ডিত মন্মথনাথ কাব্য-তীর্থ দাবি করলেন যে, কবি কালিদাস বাঙালী ছিলেন। এই প্রসঙ্গে কাব্যতীর্থ মহাশয় যে সব যুক্তির অবতারণা করেছিলেন তার কিছু কিছু আমার মনে আছে।

'রঘুবংশম্' কাব্যে কবি-বর্ণিত রঘুর দিগ্বিজয় রাঢ় দেশ থেকে শুরু হয়ে আসামে গিয়ে পরিসমাপ্ত হয়। এই প্রসঙ্গে কবি যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব বা মধ্যপ্রদেশের কোন অঞ্চলেরই উল্লেখ করেন নি।

কালিদাসের বিভিন্ন কাব্যে ও নাটকে নায়ক-নায়িকার আচার, ব্যবহার, চালচলন—সবই বাঙালী-জনোচিত।

কালিদাস নাম বাংলার বাইরে কোথাও শোনা যায় না। পাঞ্জাব, মাদ্রাজ বা মধ্যভারতে কালিদাস নাম রাখার কোন রেওয়াজ নেই।

'মেঘদূত'-এর মধ্যে বিষ্ণুকে গোপবালকরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। বাংলা দেশ ছাড়া আর কোথাও গোপবালকরূপী বিষ্ণুর পূজা প্রচলিত নেই।

কালিদাস যখন বনের বর্ণনা করেছেন, তাঁর বর্ণিত গাছপালা লতাপাতা —সবই বাংলার নিজস্ব। গ্রাম বা তপোবনের বর্ণনায় কবি সর্বত্রই বঙ্গীয় পল্লীর পরিবেশ চিত্রিত করেছেন। বিশেষত, পরিবর্তনশীল ছয়টি ঋতু এবং প্রতি ঋতুতে প্রকৃতির রূপান্তর, কালিদাসের কাব্যে যেভাবে বর্ণিত আছে, বাংলার বাইরে তার বাস্তব রূপ কোথাও দেখা যায় না।

কাব্যতীর্থ মহাশয় বক্তৃতা প্রসঙ্গে অনর্গল শ্লোক উদ্ধৃত করে তাঁর বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করেন। কিছু কিছু বিতর্কের সৃষ্টি হলেও উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে অধিকাংশই তাঁর যুক্তি স্বীকার করে নেন।

নানা সোরগোলের ভিতর চঞ্চল হয়ে এধার ওধার ঘুরে বেড়াচ্ছি, এমন

সময় গিরিজাদার সঙ্গে দেখা। বললেন, চল্ পবিত্র, এক জনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।

কার সঙ্গে? আমি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলাম।

আয়ই না। বলে তিনি সভামঞ্চের পিছন দিকে অগ্রসর হলেন। আমিও তাঁর অনুবর্তন করলাম।

মঞ্চের পিছনে বেশ খানিকটা খোলা জায়গা, সেখানে খানকয়েক চেয়ার ও টুল দেখে মনে হল এখানেও আড্ডা জমছে। তখনকার মত একটি মাত্র লোককে একখানি চেয়ারে উপবিষ্ট দেখতে পেলাম। পাঞ্জাবি-চাদর পরিহিত চশমাধারী এক ভদ্রলোক বসে বসে সিগারেট ফুঁকছেন। মুখময় দাড়ি কিন্তু দাড়ির কেশ ঘনসন্নিবিষ্ট নয়।

এই যে শরৎদা, দেখুন কাকে নিয়ে এসেছি, বলেই গিরিজাবাবু আমার দিকে নির্দেশ করলেন। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ইনিই শরৎ চাটুজ্যে, অনেকবার এঁকে দেখতে চেয়েছ। হল ত!

আমি আশ্চর্য হয়ে সেই মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমার স্মৃতি চলে গেল অনেক দূরে, স্থান এবং কালের দুস্তর ব্যবধান পেরিয়ে।

১৯১৩ সাল, আমি তখনও স্কুলে পড়ি। পরিবেশের বিশেষ বিরূপতায় রেঙ্গুনে দিন কয়েকের জন্য পালিয়েছিলাম। সে কাহিনী চলমান জীবনে অবান্তর মনে করে আমি যথাস্থানে তার বর্ণনা করি নি। কিন্তু কথাসাহিত্য-সম্রাট শরৎচন্দ্রকে প্রথম দর্শনে আমার সেই স্মৃতি মনের মধ্যে আলোড়িত হয়ে উঠল। এই সেই শরৎচন্দ্র! রেঙ্গুন, ১৪ লোয়ার পোজংডং স্ট্রীটের সেই লোকটি, যাকে মামুলী বাঙালী সমাজ পরিহার করে চলত!

ওই বাড়ীরই এক অংশে আমার এক বন্ধুর অতিথি হয়েছিলাম আমি। রাস্তা থেকে উঠে যাওয়া একই কাঠের সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা করতে হয়। কর্মহীন আমি অনেক সময় চুপচাপ সিঁড়ির পাশে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে পথের বিচিত্র শোভা দেখি।

ওঠা-নামার পথে বার কয়েক আমাকে ওই অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে

একদিন এক ভদ্রলোক স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন, সহাস্যে প্রশ্ন করলেন, একা একা চুপচাপ রাস্তার দিকে তাকিয়ে এত কি দেখেন আপনি? পরিচয় নিয়ে নিজের ঘর দেখিয়ে দিলেন, বললেন, আসুন না সন্ধ্যার দিকে। আমি সম্মতি জানালাম। নিজের পরিচয়ও তিনি দিলেন, নাম শরৎ চাটুজ্যে, এ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট জেনারেল অফিসের কেরানী।

সন্ধ্যার সময় আমি তাঁর দ্বারে এসে টোকা মারতেই, নিজে এসে দরজা খুলে দিলেন। দেয়ালের একপাশে দেখলাম র‍্যাক-জোড়া বই, আর একপাশে কাঁচা কাঠের একখানি টেবিল ও চেয়ার। পাশ দিয়ে চলে যেতে টেবিলের উপরকার সরঞ্জামগুলির দিকে দৃষ্টি পড়ল। টেবিলের মাঝখানে চতুষ্কোণ একটা কাঠের কলমদানিতে পাঁচ-ছটা ফাউণ্টেন, স্টাইলো খাড়া করা; চামড়ায় বাঁধানো ফুল্‌স্কেপ আকারের ঝক্‌ঝকে একখানা প্যাড। প্যাডের মাথায় বৃত্তাকারে বড় হরফে 'শরৎ' লেখা মনোগ্রাম। প্যাডের উপরকার কাগজখানাতে খুব ছোট অথচ ঝক্‌ঝকে মুক্তা-হরফে বাংলা লেখা রয়েছে। লেখা দেখে থমকে দাঁড়ালাম, এক পলকের মধ্যে লেখার বিষয় সম্বন্ধে কিছু আঁচ পাওয়া যায় কি-না সে চেষ্টায়। শরৎচন্দ্র ফিরে দাঁড়ালেন। আরে ওসব পাগলামি, দেখবেন না। চলুন ওদিকের ঘরে। বসে আড্ডা জমানো যাবে। আরও জন কয়েক বন্ধু উপস্থিত আছেন।

পাশের ঘরে সতরঞ্চির উপর আরও জন তিনেক বসে আছে, তার মধ্যে একজন বর্মী। আমাকে বসিয়ে দিয়ে শরৎচন্দ্র নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন এবং একটু পরেই ফিরে এলেন একখানি বই হাতে নিয়ে।

'সাহিত্য' মাসিক পত্রিকায় এই যে পবিত্র গাঙ্গুলীর কবিতা বেরিয়েছে এই পবিত্র গাঙ্গুলী কি আপনি? শরৎচন্দ্র প্রশ্ন করলেন।

সম্মতিসূচক জবাবটা ঠিক স্পষ্ট প্রকাশ করতে পারলাম না। কিন্তু তাই বলে তাঁর বুঝে নিতে অসুবিধে হল না।

তবে ত আমরা দলে একজন কবি পেয়ে গেছি!

আলাপ-পরিচয় জমিয়ে আড্ডায় একাত্ম হয়ে বসবার আগেই বন্ধুর চাকর এসে আমাকে ডেকে নিয়ে গেল।

আরে তোমার কাণ্ড! বন্ধুবর বেশ তিরস্কারের সুরেই বলে উঠলেন, গিয়ে জুটেছ ওই ওঁচা আড্ডায়! আমার কথা শুনে ওখানে না গেলেই ভাল করবে! বিভুঁই বিদেশ, আর রেঙ্গুনটাও তেমন ভাল জায়গা নয়।

সেই শরৎ চাটুজ্যে! সেই দাড়ি, চোখে সেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি! কথা বলার সুরে অপূর্ব দরদমাখানো। কোন মতেই তা ভুলে যাবার নয়।

আমি চুপ করে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে ভাবছি। শরৎচন্দ্র প্রশ্ন করলেন, আপনাকে আগে কোথায় দেখেছি বলুন ত?

দেখেছেন রেঙ্গুনে, আপনার পোজংডং স্ট্রীটের বাড়ীতে, আমি মনে করিয়ে দিলাম।

ও, আপনিই সেই 'সাহিত্য'-এর কবি পবিত্র গাঙ্গুলী! বললেন শরৎদা, তা সাহিত্য-সম্মিলনীতে এসে কবির সাক্ষাৎ পাব—এ আর বিচিত্র কি!

তুমি তা হলে দাদাকে চিনতে পবিত্র! বিস্ময়ের সুরে গিরিজাদা বললেন, অথচ আমাকে বহুবার তাগিদ দিয়েছ পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে!

আমি জবাবে বললাম, কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র আর রেঙ্গুনের সেই শরৎচন্দ্র যে এক, সে আবিষ্কার ত আমি এখন করলাম।

নিরাশ হয়েছেন খুব, না! শরৎদা বলে উঠলেন। আচ্ছা, সেদিন সেই যে বেরিয়ে গেলেন, আর আমার ছায়া মাড়ান নি, ব্যাপারটা কি বলুন ত?

আমি বললাম, সে আলোচনা থাক। তা ছাড়া, দু-দিন বাদেই আমি চলে এসেছিলাম রেঙ্গুন থেকে।

দু-দিনেই অনেক কিছু ঘটতে পারত, একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে শরৎদা বলে চললেন, আমাকে না বললেও আমি বুঝতে পারি পবিত্রবাবু। এই অদ্ভুত লোকটাকে তারা পছন্দ করত না কেউ। আমি নাকি দুশ্চরিত্র, নেশাখোর। আমার ঘরে নিশ্চয়ই আপনার আসা বারণ হয়েছিল। আমি ত জানতাম, আমার সম্বন্ধে কে কি ভাবে। আমার ঘরটা নাকি ছিল মাইফেলের আড্ডা।

ঠিক তা নয়, আমি আমতা-আমতা করে কৈফিয়ৎ দেবার চেষ্টা করলাম।

কিছু ঢাকবার দরকার নেই পবিত্রবাবু, লোকের গালাগাল আমার গায়ে বেঁধে না। তারা কি করবে বল? আমার চরিত্রটা এমনই খাপছাড়া

যে, তার হদিস পেল না কেউ আজ পর্যন্ত। আমি নিজেই মাঝে মাঝে অবাক হয়ে যাই। তুমি কি বল গিরিজা? আমার সম্বন্ধে তুমি কি কোন মতামত গড়তে পেরেছ?

তা আমি নিশ্চয়ই পেরেছি দাদা, বললেন গিরিজাকুমার, আপনি যতই ঢাকতে চেষ্টা করুন না কেন। সব মানুষকে তাদের ব্যক্তিগত পরিবেশ থেকে বিচার করা আপনার স্বভাব। ঠিক সেই কারণেই আপনার সঙ্গে আর পাঁচ জনের মতের অমিল ঘটে।

অমিল ঘটে বলেই ত সভা পালিয়ে এখানে বসে আছি, বললেন শরৎদা।

শরৎদা বলে চললেন, দেখো, তোমাদের এই তত্ত্বভারাক্রান্ত বক্তৃতা আমার বরদাস্ত হয় না। মানুষকে বাদ দিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি, হৃদয়কে অবজ্ঞা করে শুধু বুদ্ধির চর্চা—এর কোন অর্থ আমি খুঁজে পাই নে। যে সরস্বতী লোকালয় থেকে বহু দূরে বিহার করেন, সেখানে লক্ষ লক্ষ অমল ধবল শতদল প্রস্ফুটিত থাকলেও সেখানে পূজায় বসবার প্রবৃত্তি আমার হয় না। তার চেয়ে চল আমার সঙ্গে, ঘরে বসে মন খুলে দুটো কথা কওয়া যাবে। সে-ই আমার সাহিত্য, সে-ই আমার গল্প উপন্যাস।

প্রস্তাব এবং ভোটযুদ্ধ পরের দিন, আর দল পাকানোর কাজ আমার সুসম্পন্ন। কাজেই শরৎদার সঙ্গে তাঁর বাড়ী যাওয়ার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না। পালিয়েই চলে গেলাম। নলিনীদাকে জানাতে গেলে নিশ্চয়ই বাধা দেবেন এ আমি জানি।

ঘণ্টা দুই কাটল শরৎদার বাজেশিবপুরের বাড়ীতে বসে। ঘরে ঢুকেই ভোলাকে হাঁক দিয়ে হুকুম করলেন, চা নিয়ে আয় শিগগির। দেখছিস না কে এসেছে। কাগজের সম্পাদক!

ভোলা কি বুঝল জানি না। তবে চা আনতে মোটেই বিলম্ব হল না।

এখানে আর সিগারেট নয়, নিয়মিত গড়গড়া টেনে চললেন শরৎদা। আমার হাতে আধপোড়া চুরুট দেখে সহাস্যে গড়গড়ার নলটা এগিয়ে দিলেন একবার, বললেন, ওসব পথের নেশা, ঘরে কেন? ছুটে মরার তাড়া নেই ত এখানে! ধীরে সুস্থে আয়েস করেই না হয় একটু পরিস্রুত ধোঁয়া টানলে!

আমার ঘর-গৃহস্থালীর খবর থেকে শুরু করে আমি কি করছি, কি করব, কেন করছি—সব কথাই একে একে জেনে নিলেন শরৎদা। একবার চোখ বুজে একটু ভেবে নিয়ে বললেন:

এটা কি ভাল করছ পবিত্র? নিজের খেয়াল-খুশি চরিতার্থ করবার জন্য, নিজেকে লোক-সমাজে প্রতিষ্ঠিত করবার স্বার্থে আর একজনের উপর কতখানি অত্যাচার করছ, ভেবে দেখেছ কি? কি নিয়ে, কি আশায় তার দিন কাটছে! একবার কল্পনাও করেছ কি তার ম্লান মুখচ্ছবি?

শরৎদার ওখান থেকে বেরিয়ে সম্মিলনীতে আর ফিরে যাওয়া হল না। সোজা চলে এলাম মেসে, নিচেকার ভিড় থেকে গা-ঢাকা দিয়ে কোটরস্থ হলাম এসে আমার তিন তলার কুঠুরিতে। মনের অন্তস্তলের সুপ্ত বেদনাকে শরৎদা জাগিয়ে দিয়েছেন।

আবার সে বেদনাকে ঘুম পাড়াতে হল। আমার 'আমি'কে লুপ্ত করে দিতে হল সমাজ-জীবনের কোলাহল ও চাঞ্চল্যের মধ্যে।

সোমবার অপরাহ্ণে সাহিত্য-সম্মিলনীতে আশুতোষ তাঁর প্রস্তাব আনবেন। সে প্রস্তাব বাতিল করবার চাবুক আমার হাতে, অতএব কোমর বেঁধে যথা-সময়ে এসে সভায় হাজির হলাম। সভার কাজ শুরু হল। পরিষদের পক্ষ থেকে সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করবার দায়িত্ব নিয়ে আমি আর রামকমলদা মঞ্চেরই এক পাশে একখানা টেবিল নিয়ে বসেছিলাম।

প্রথম প্রস্তাব হল দুঃস্থ সাহিত্যিকদের সাহায্যের জন্য তহবিল প্রতিষ্ঠিত করা হবে এবং তার পরিচালনার ভার থাকবে একটি স্বতন্ত্র সংগঠনের উপর। প্রস্তাবের পক্ষে বক্তৃতা ত দূরের কথা, কেউ উঠে সমর্থন করবার আগেই আমি দাঁড়িয়ে বলে উঠলাম, এই প্রস্তাবের শেষ অংশ সম্পর্কে আমাদের ঘোরতর আপত্তি আছে।

আশুতোষের চোখে মুখে চরম বিরক্তি ও উষ্মা ফেটে পড়ল। চার দিক থেকে চেঁচামেচির ফলে স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কোন বক্তৃতাই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হল না। আমি আবার দাঁড়িয়ে উঠে দাবি করলাম, বক্তৃতার দরকার নেই, এ সভায় উপস্থিত সকলেরই যথেষ্ট বুদ্ধি আছে প্রস্তাবের মর্মার্থ উপলব্ধি করবার। অতএব প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া হোক।

নিরুপায় হয়ে সভাপতি প্রস্তাবটি ভোটে দিতেই বিরুদ্ধ দল প্রচুর ভোটাধিক্যে তা বাতিল করে দিলেন। যাঁদের কাছে কথা পেয়েছিলাম তাঁরা সকলেই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে হাত তুললেন।

এর পর আশুতোষের পক্ষ থেকে উত্থাপিত আরও দুটি প্রস্তাব বাতিল হয়ে গেল। প্রতিবারেই আমি বিরোধিতা জানালাম। রাগের মুখে আশুতোষের মুখ থেকে একটি কথা বেরিয়ে গেল, আর কারুর কানে তা পৌঁছল কি না জানি নে, কিন্তু আমার শুনতে ভুল হয় নি : কে এই ছেলেটা?

এ প্রশ্নের জবাব তিনি পেলেন না।

হট্টগোলের মধ্যে সভা ভেঙে গেল। সাহিত্য-সম্মিলনীকে পৃথক প্রতিষ্ঠান হিসেবে রেজিস্টারি করার প্রস্তাব শেষ পর্যন্ত আর ওঠানই হল না।

সভার শেষে পিঠ চাপড়ে নলিনীদা আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তুমি। পরিষদের পক্ষ থেকে এবার আমরা নিশ্চিন্তে যে-কোন দায়িত্ব তোমার উপর দিতে পারব।

সে যুগে ফরডাইস লেন মূলত ছিল ফিরিঙ্গিপাড়া। দেশীয় বাসিন্দার সংখ্যা শতকরা বিশ-পঁচিশ জনের বেশী নয়। ফিরিঙ্গির সংখ্যা যে কত তার প্রমাণ পাওয়া যেত সন্ধ্যার দিকে দু-কদম ঘুরে এলে। প্রত্যেক দরজায় বৈঠকখানা বসে যায়। দু-একটা মোড়া পেতে বসে যায় বুড়ীরা, আর ছেলে-ছোকরার দল, মায় মেয়েরা পর্যন্ত সেখানে দাঁড়িয়ে গল্প করে। হয়ত বাড়ীর ভিতর হাওয়া নেই বলে ওইটুকু তাদের হাওয়া খাওয়ার প্রয়াস। মাঝে মাঝে জনবিরল ও যানবিরল পথে ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে তরুণ-তরুণীদের পায়চারি করতেও দেখা যায়।

ওই দেখা পর্যন্তই। তাদের ভিতরকার ইতিবৃত্ত নিয়ে আমার মনে কোনই ঔৎসুক্য জাগে নি, কিন্তু কিছুটা অনভিজ্ঞতাবশত, কিছুটা শিভারলি বশে এদের এক ঘটনার চক্রে আমাকে জড়িয়ে পড়তে হল।

বেলা বেশী হয় নি, খাওয়া দাওয়া একটু সকাল সকালই সারা হয়ে গেছে। মেসের আর সবাই বেরিয়ে গিয়েছে। নিচের ঘরে দুজন সাময়িক অতিথি ভোজনান্তিক বিশ্রামে গা এলিয়ে দিয়েছেন। আমি আমার সীটে বসে বেশ আরাম করে একটু খৈনি খাওয়ার উদ্যোগ করছি, এমন সময় সব ভণ্ডুল হয়ে গেল। আর্ত নারীকণ্ঠের চীৎকার শুনতে পেলাম : 'হেল্প্—হেল্প্—কিলিং!'

একক কণ্ঠের চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে আরো নারী এবং পুরুষ কণ্ঠে অবোধ্য

কলরোলও ভেসে এল। হাতের খৈনি মুখে পুরে দিয়ে আমি ধড়মড় করে উঠে সিঁড়ি বেয়ে নীচে দৌড় মারলাম। দেখি অপর দুজন—সেই সাময়িক অতিথি—তাঁরাও বেরিয়ে পড়েছেন। চীৎকারটা আমাদের মেসবাড়ীর লাগোয়া উত্তরের বাড়ীর ভিতর থেকে আসছে। অতএব আমাদের ছুটোছুটি করতে হল না। গেট খোলাই ছিল, ঢুকে পড়তেই দেখা গেল সামনের ঘরের দরজার শিকলি বন্ধ, এক মেম-সাহেব প্রহরিণী দাঁড়িয়ে, আর একজন যুবক একেবারে বন্দুক হাতে উঠোন থেকে সেই ঘরের দিকে তাকিয়ে পরমাক্রোশে চেঁচাচ্ছে: কাম্ আউট ইউ সোয়াইন, আই'ল কিল্ ইউ! আর এক বুড়ী তার দুটো হাত ধরে থামাবার চেষ্টা করছে, আর চেঁচাচ্ছে: ডু স্টপ্ প্লীজ্। দরজার প্রহরিণী চেঁচাচ্ছে: হেল্প্! মার্ডার!

আমাদের তিনজনকে দেখতে পেয়ে সেই মহিলা করুণকণ্ঠে বলে উঠলেন: লুক্ বাবুজ, হেল্প্! প্লীজ্—

আমাদের দেখতে পেয়ে বৃদ্ধাও বলে উঠলেন, লুক্ জ্যাক্, দি বাবুজ আর হীয়ার, আরনট্ ইউ এশেম্ড্ অফ ইউর কন্ডাক্ট্! উইল ইউ স্টপ্ এণ্ড গো ইন?

বন্দুকধারী বুড়ীর কথা রাখলে, আমাদের দিকে একবার বিষদৃষ্টি নিক্ষেপ করে বন্দুকটা নামিয়ে ধীরে ঘরের ভিতর ঢুকে গেল! বুড়ী আমাদের দেখে অপ্রতিভ হয়ে পড়েছে, সলজ্জভাবে বলে ওঠে, কিছু মনে করো না বাবু। আমার পাগলা ছেলেটার অত্যাচারে তোমাদের দুপুরের বিশ্রামের ব্যাঘাত হল। এ দিকের মেম-সাহেবও দরজার শিকল খুলল। বললে, ধন্যবাদ! তোমরা এসেছিলে বলে অবস্থাটা সামলানো গেল।

মেম-সাহেব ঘরে ঢুকে গেল। তাকিয়ে দেখলাম সে সুন্দরী এবং তরুণী।

বিকেল বেলা বেরুতে যাচ্ছি, নীচের ঘর থেকে যোগেশ ডাকলে, বেরুচ্ছিস যে বড়! আজ না চাটুজ্যে মশাইর রসগোল্লার ফিস্ট?

ঘরে ঢুকে বসে গেলাম। রসগোল্লার রস ছেড়ে অকারণ পথে পথে ঘুরে বেড়াবার কোন দরকার নেই। ক্রমে ঘরে ভিড় জমে উঠল, চাটুজ্যে মশাইর নেমন্তন্ন খেতে আপিস-ফেরত মেসের বাসিন্দা সবাই মুখহাত ধুয়ে কাপড় বদলিয়ে ঘরে এসে জমায়েত হল। চাটুজ্যে মশাই একখানি তক্তপোশে বসে গড়গড়া টানতে লাগলেন।

দরজার ভিতর দিয়ে মুখ ঢুকিয়ে কে যেন বলে উঠল, মে আই কাম্ ইন্?

দেখলাম এক প্রৌঢ় সাহেব। সবাই সমস্বরে বলে উঠল, ইয়েস, কাম্ ইন্।

দুপুর বেলা মেম-সাহেবের ঝগড়ায় নাক গলাতে গিয়েছিলাম আর সন্ধ্যের সময় একটা খোদ সাহেব ঘরে এসে হাজির। ব্যাপার কি, ঠিক অনুমান করতে না পারলেও তার সঙ্গে যে এর একটা সম্বন্ধ আছে এটা বুঝে নিলাম। তবুও চাটুজ্যে মশাইর উপস্থিতিতে মেসের মুখপাত্র হয়ে কথা বলার তাঁর স্বাভাবিক অধিকার ক্ষুণ্ণ না করে চুপ করে রইলাম।

মুখ থেকে নলটা নামিয়ে চাটুজ্যে মশাই বললেন, বসো সাহেব। কি ব্যাপার বল দেখি?

জবাবে সাহেব যা বললে তার মর্ম হল এই:

সে পাশের বাড়ী দশ নম্বরে থাকে সস্ত্রীক। শিয়ালদায় ইঞ্জিন-ড্রাইভারী করে। অনেক সময় ডিউটি উপলক্ষ্যে রাত্রে বাসায় অনুপস্থিত থাকতে হয়।

ওই কম্পাউণ্ডেই নয় নম্বর বাড়ীতে থাকে জ্যাক ডি'ক্রুজ আর তার মা। জ্যাকও শিয়ালদায় ড্রাইভার—ইয়া তাগ্ড়া যোয়ান। ওর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে জ্যাক ওর তরুণী স্ত্রীকে ফুসলাবার চেষ্টা করছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা আমায় বলেছে, তারা দেখেছে ওদের অনেক রাত্রে অসংযত মত্ত অবস্থায় বাসায় ফিরতে। খুব শান্ত সংযত সুরেই কথাগুলো সে বলে চলে।

আজ সকালে আচমকা তার ছুটি মিলে গেছে, বেলা দশটায় হঠাৎ বাড়ী ফিরেছে। এত বড় সাহস ওদের. দরজা খোলা রেখেই জ্যাক্ মেম-সাহেবের ঘরে এমন অবস্থায় ধরা পড়েছে যা দেখলে যে-কোন স্বামীর মাথায় খুন চড়ে যায়।

আমি কিন্তু কোন গোলমাল করি নি। ওকে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সুযোগ দিয়েছি। আর তারপর আমার স্ত্রীকে প্রশ্ন করেছি, ব্যাপার কি! সে প্রশ্ন করবার অধিকার আমার আছে, বলে সাহেব।

চোখের জলে কেঁদে কেটে মেম-সাহেব নিজের অসহায়তা প্রকাশ করেছে, জ্যাক্ অনবরত তাকে বিরক্ত করে। সব সময় এড়ানো সম্ভব নয়। তা ছাড়া, জ্যাক্ যোয়ান, বেপরোয়া, একটু ভয়ও লাগে তাকে। তাই জ্যাক্কে ঠাণ্ডা রাখার জন্য মাঝে মাঝে তার সঙ্গে বাইরে যেতে হয়েছে। আর জ্যাক্ যে ঘরে আসে তা কোন অনুমতির অপেক্ষা না রেখেই।

বুঝলাম জ্যাক্ যোয়ান, জ্যাক্ বেপরোয়া আর আমার বয়স হয়েছে, আমি নিরীহ লোক—এই সুযোগ নিতে চায় হারামজাদা।

জোর গলায় জ্যাক্‌কে শুনিয়ে স্ত্রীকে শাসিয়ে দিয়েছে ওর মত লোফার সোয়াইনের সঙ্গে কোন সংশ্রব যেন সে না রাখে।

সঙ্গে সঙ্গে হৈ-হৈ করে ছুটে বেরিয়ে আসে জ্যাক্, হাতে গাদা বন্দুক নিয়ে, আমাকে নাকি খুন করবে। আমিও আমার বন্দুক বার করতে যাচ্ছিলাম। আত্মরক্ষা করতে হবে ত!

সেই সুযোগে মেম-সাহেব বাইরে থেকে শিকলি টেনে দিয়ে আর্তনাদ করে ওঠে। জ্যাক্-এর মা বুড়ীও জ্যাক্‌কে থামাতে চেষ্টা করে।

তোমাদের এখান থেকে কয়েকজন সেই মুহূর্তে গিয়ে না পৌঁছলে নির্ঘাত একটা খুনোখুনি হয়ে যেত। থ্যাঙ্কস্ সো মাচ্ ফর্ দি কাইন্‌ড্‌নেস্।

এখান থেকে আবার কে গিয়েছিল? জিজ্ঞাসা করলেন চাটুজ্যে মশাই। সবাই একবার আর-সবাইয়ের দিকে জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকিয়ে নিলে।

আমি গিয়েছিলাম, বললাম নিঃসঙ্কোচে।

হাঁ, চশমা চোখে বাবু, বলেছে আমার মেম-সাহেব।

আর কে? খুব গম্ভীর ভাবে প্রশ্ন করলেন চাটুজ্যে।

অমৃত আর বিনোদ, আমি বললাম।

যত সব ছেলেমানুষী কাণ্ড তোমাদের, বিরক্তি-ভরে তিরস্কার করলেন প্রৌঢ় চাটুজ্যে। আরে, ওদের বৌ নিয়ে টানাটানি খাওয়াখাওয়ি লেগেই আছে। ওরা কেউ মাথা ঘামায় না তা নিয়ে। তোমার কি দরকার ছিল ওর মধ্যে জড়াবার!

নারীকণ্ঠের আর্তচীৎকারে স্বভাবতই আকৃষ্ট হলাম।

শিভাল্‌রি জেগে উঠল আর কি! বলে উঠল যোগেশ।

ছুঁড়ী দেখে এক ব্যাটা মজেছে, তুমি এবার ডোবো, বললেন চাটুজ্যে। আর অমৃত আর বিনোদ দুদিনের জন্য এসেছে, তাদেরও আবার পিছু পিছু টেনে নিয়ে গেছ!

টেনে আমি নিয়ে যাই নি, ওরা নিজেরাই গিয়েছিল, আমি বললাম।

ছোকরাগুলোর সব একই হাল দেখছি, বললেন চাটুজ্যে।

সাহেব মুখ খুললে, বাবু, আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ। এবার আমার ইজ্জত বাঁচাতে সাহায্য কর।

সে কি করে সম্ভব ? বললে যোগেশ। তোমার ইজ্জত তুমি সামলাও যে ভাবে পার, আমাদের নিয়ে টানাটানি কেন !

আমি ও ব্যাটাকে জেলে পাঠাতে চাই, বললে সাহেব। উকিলের কাছে গিয়েছিলাম, থানায় ডায়েরিও করে এসেছি। উকিল বলেছে, ও যে বন্দুক নিয়ে তেড়ে এসেছিল তার উইটনেস পাওয়া গেলে কন্‌ভিক্‌শন্‌ সার্টেন। আমার রিকোয়েস্ট বাবু, তুমি ঠিক যা দেখেছ তা-ই বলবে।

ওকে আবার সাক্ষী করে মামলায় জড়াতে চাও কেন ? বললেন চাটুজ্যে। ও যে তখন গিয়েছিল এ-ই ত ঢের।

দ্যাখো বাবু, বুড়ো বিনীত স্বরে বললে, আমি তোমাদের কাছে প্রে করছি, শুধু দুটো মুখের কথা, তাও সত্যি কথাই বলবে, কিছু বানিয়ে বলতে হবে না। তোমার কোন ক্ষতি নেই, আমি লোকটা বেঁচে যাব।

তারপর তোমার ওই খুনে ডি'ক্রুজ আমাদের পিছনে লাগুক আর কি, বললে যোগেশ।

ও ব্যাটাকে ত গারদে পাঠিয়ে দেবো, ও লাগবে কেমন করে ? বুড়ো বললে, গুণ্ডাকে শায়েস্তা করা মহল্লার সবার ইন্‌টারেস্ট।

ডেঁপোমি করে আমি বলে উঠলাম, যাও সাহেব, সাক্ষী আমি দেবো। সত্যি কথা বলতে ভয় পাই না আমি।

যা ভাবছ, তা হবে না, যোয়ান নাগরকে জেলে পাঠিয়ে মেম-সাহেবের অনুগ্রহ লাভ হবে না ! বলে উঠল যোগেশ।

হ্যাঁ, তারই জন্যে যেন যাচ্ছি আমি, আমি রেগে উঠলাম।

যার জন্যে যাচ্ছ যাও, আমরা বারণ করব না, বললেন চাটুজ্যে মশাই। পুলিশ কোর্টের উকিলের জেরা, কোর্ট-ঘর করা বা গুণ্ডা ডি'ক্রুজের ভয় কিছুই আমি আমলে আনছি না, কিন্তু ফিরিঙ্গি ছুঁড়ীর পাল্লায় পড়ো না, কি হালত হবে, জান না ত !

আমি তা হলে নিশ্চিন্ত, তোমার হেল্‌প্‌ আমি পাব। বলে আর একবার ধন্যবাদ দিয়ে সাহেব বেরিয়ে গেল।

আরে, রসগোল্লার ফিস্ট হবে, আর লোকটা চলে গেল ! ডাকলে হয় না ? বলে উঠল নীলুদা।

পবিত্রকে বলুন, বললে যোগেশ, ও মেম-সাহেবকে ডেকে নিয়ে আসবে।

যত সব অনাছিষ্টি কাণ্ড, বললেন চাটুজ্যে।

ওর সামনে আমরা যে সব আলোচনা করলাম, সেটা কি খুব শোভন হল? আমি বলে উঠলাম।

ঘাবড়িও না পবিত্র, বললে যোগেশ, ও ইংরিজিও নয়, হিন্দিও নয়, একবর্ণও বোঝেনি ও। তারপর তুমি সাক্ষী দিতে রাজি হয়েছ, এই ত ওর মস্তবড় খুশির কথা।

দিন তিনেক বাদে বেলা এগারোটা নাগাদ এক পাহারাওয়ালা এসে মেসে হাজির, সঙ্গে সেই প্রৌঢ় সাহেব। আমি তখন কলতলায় স্নান করছি। সাহেব আমাকে সনাক্ত করে দিলে। সিপাহী বললে, থানার বড়বাবু এসেছেন এদের বাড়ী, আমাকে নাকি একবার সেখানে যেতে হবে, বড়বাবু তলব করেছেন।

দারোগার এই ঔদ্ধত্যে আমার মেজাজ চড়ে গেল। বললাম, তোমার বডবাবু ডেকে পাঠালেই আমি যাব না। সিপাহী সাহেবের দিকে তাকাল। সাহেব আমাকে অনুনয়ের স্বরে বললে, 'প্লীজ বাবু, তোমার একটা স্টেটমেণ্ট চায় ও, সি, তুমি যা দেখেছ শুধু তাই বলবে।

আমি কড়া স্বরে জবাব দিলাম, তাই ত বলব এবং সত্যের অপলাপ হওয়া চাই না বলেই সাক্ষী দিতে রাজী হয়েছি। তাতে কার কি উপকার বা অপকার হবে, তাতে কিছু যায় আসে না আমার।

হ্যাঁ হ্যাঁ, বলতে গিয়ে থতমত খেয়ে যায় বুড়ো। না, না, আমি তা বলছি না, তবে যা দেখেছ তাও ত পুলিশের খাতায় লেখাতে হবে।

হবে। আমি নির্বিকার ভাবে উত্তর করলাম। তার জন্যে, দরকার হয়, তোমার ও, সি, আমার এখানে আসবে, আমার সুবিধামত সময় বুঝে।

কিন্তু সাহেব ত আপনাকে যেতে বলল, বললে পাহারাওয়ালা।

তোমার সাহেবকে গিয়ে বল, আমি তার খাস তালুকের প্রজা নই যে, পাইক দিয়ে ডেকে পাঠালেই সুরসুর করে গিয়ে হাজির হব। আমার কাছে আসা তার ডিউটি।

বুড়ো হতাশ হয়ে পড়ল, মিনিটখানেক চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল, পাহারাওয়ালাটাও গেল সঙ্গে।

পুলিশ সাহেব কষ্ট করে পাশের বাড়ীর চৌকাঠ মাড়ালেন না, তবু কেস চালান হয়ে গেল, আমার কাছে সাক্ষীর সমনও এসে পৌঁছল।

একদিন পাঁচটা নাগাদ মেসে ফিরছি, নিজের বাড়ীর সদরে দাঁড়িয়ে বুড়ী মেম আমাকে ডাকলে, প্লীজ বাবু, মে আই টক্ টু ইউ ?

বৃদ্ধার করুণ মুখের দিকে তাকিয়ে আমার 'না' বলা সম্ভব হল না। ফটক পেরিয়ে ওদের অঙ্গনে দাঁড়িয়েই বুড়ীর সঙ্গে কথা বললাম।

তুমি সেদিন একটা ডিসাস্টার বাঁচিয়ে দিয়েছিলে, আজ আবার আর একটা ডিসাস্টার সৃষ্টি হচ্ছে। ইউ ক্যান্ হেল্প্।

কি ভাবে আমি হেল্প্ করতে পারি, বুঝতে পারছি না ত, আমি বললাম।

ছেলেটার জেল হয়ে যাবে, বন্দুক নিয়ে রসারকে মারতে গিয়েছিল, তুমি তার একমাত্র ডিজ্-ইণ্টারেস্টেড সাক্ষী, কাজেই তোমার কথার দাম অনেক।

অনেক দাম বলেই ত অনেক সাবধানে কথা বলতে হবে আমাকে। আমি জবাব করলাম।

অত্যন্ত কাঁদ-কাঁদ সুরে বুড়ি বললে, আমি উইথ ফোল্ডেড্ হ্যাণ্ড্স্ প্রে করছি তোমার কাছে, মাই বয়, তুমি না বাঁচালে ছেলেটার নিশ্চয় জেল হয়ে যাবে। আর তার পর চাকরিটাও যাবে।

কিন্তু তাই বলে মিথ্যে কথা আমি বলতে পারব না।

মিথ্যে কথা আমি তোমাকে বলতে বলব না, বিশেষ করে, তোমাকে অন্ ওথ্ বলতে হবে, কিন্তু আমি বলছি, তুমি যদি সাক্ষী না দাও, তা হলে আর যারা আই-উইটনেস্ আছে, তারা ইন্টারেস্টেড পার্টি, তাদের এভিডেন্স উকিল কাটিয়ে দিতে পারবে।

বুড়ীর করুণ মুখছবি ও অনুনয়ের সুরে আমি নির্বিকার থাকতে পারলাম না। একটু থেমে নিয়ে বললাম, তা কি করে হয়, কোর্টের সমন আমি ত উপেক্ষা করতে পারি না।

কিন্তু পুলিশ তোমার কাছ থেকে কোন স্টেটমেণ্ট নেয় নি, কাজেই তুমি যদি বল যে আমি কিছু জানি না, তবেই ত হয়ে যায়।

সেটাও মিথ্যে সাক্ষী হবে মাদাম। তা ছাড়া, আমার মেস শুদ্ধ লোক জানে, মায় কুক-মেড্সারভেণ্ট পর্যন্ত, যে, আমি সেখানে গিয়েছিলাম। তারপরেও কি সম্ভব আদালতে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলে আসা—আমি কিছু জানি না।

কিন্তু ছেলেটার জেল হবে, চাকরি গেলে এই বুড়ীটাকে স্টার্ভ করতে

হবে। গড ওভারহেড বলছি, আমার আর কোন উপায় নেই। টেক পিটি অন্ দিস্ ওল্ড লেডি।

আমি কোন জবাব করতে পারলাম না।

আবার বলে চলল বুড়ী, জানি ছেলেটা গোঁয়ার, মাতাল, কিন্তু আই হ্যাভ নো হেল্প্।

তোমার প্রতি আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে, কিন্তু আই ক্যানট অলসো হেল্প্ বলে আমি চলে আসবার উপক্রম করলাম। বুড়ী একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস নিয়ে বলল, যা ভাল বোঝ করবে, গড ব্লেস্ ইউ।

রসার ইতিমধ্যে একদিন আমার কাছে এসে হাজির হল। মেমসাহেব আমাকে চায়ের নিমন্ত্রণ করেছে। মিঃ ডি'সিলভাও আসবেন।

মিঃ ডি'সিলভা কে? আমি বিস্ময়ের সঙ্গে প্রশ্ন করলাম।

মিঃ ডি'সিলভা আমার ল-ইয়ার। বুড়ো জবাবে বলল।

জবাব শুনে আমি একটু থমকে গেলাম, বললাম, মেম-সাহেবকে আমার এপলজি দিও, আমি যেতে পারব না। মিঃ ডি'সিলভা যখন থাকবেন তখন নিশ্চয়ই মামলার কথা উঠবে, সাক্ষী হিসেবে আমি টিউটর্ড হতে রাজী নই। ইফ শী ওয়ান্টস মি য়্যাট টী, অন্য সময় যাব।

হতাশ হয়ে চলে গেল রসার।

সমনে লেখাছিল এগারটার সময় ব্যাঙ্কশাল কোর্টে আমায় হাজির হতে হবে। নচেৎ শাস্তির ভয়ও দেখানো ছিল তাতে। অতএব কেরানীর মত নাকে মুখে ভাত গুঁজে সোজা এসে আদালতে হাজির হলাম। কিন্তু দিশেই পেলাম না এখানে। প্রত্যেক ঘরের দরজায় দরজায় পুলিশ, উঁকি মারতে গেলেও তেড়ে আসে। উকিলদের ঘরে তাকিয়েও মনে হল সেখানেও গিয়ে আসন দখল করে অপেক্ষা করলে অনধিকার প্রবেশ হবে। কোথায় রসার, আর কোথায় ডি'সিলভা কে জানে! সাক্ষীদের বসবার ঘর আছে কি-না জিজ্ঞাসা করে একেবারে বোকা ব'নে গেলাম, এ কি জামাই এসেছেন মশাই যে, আদর করে বসতে দেবে! জবাব করলেন ভদ্রলোক।

লোকে গিস্ গিস্ করছে। সরু গলি, বারান্দার পাশে সরু ফালি। আর এক নম্বর কোর্টের সামনে যেটুকু জায়গা সেখানে এক পা এগোতে গেলে অন্তত তিনজনের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। তবে দেখলাম, 'উদভ্রান্ত প্রেম'-এ চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় শ্মশানের যে বিশেষণ দিয়েছেন—'এইখানে আসিলে

সকলেই সমান হয়'—তা এই আদালতের পক্ষেও প্রযোজ্য। কেবল উকিল আর পুলিশ—এ রাজ্যের দেবতা। চোস্ত পোশাক পরা ভদ্রলোক, কড়া স্যুট পরা বাঙালী সাহেব, পোশাকে একমণ ময়লা বহনকারী কাবুলীওয়ালা, ইয়া-মোচ্-বিশিষ্ট গলায় কার্-ঝুলানো পালোয়ান চৌধুরী, কানে বিড়িগোজা ছেঁড়া ফতুয়া গায়ে ছিঁচকে চোর, এতবড় কাঁচপোকার টিপ্-পরা বস্তির বারবণিতা —সবাই এখানে সমান। কে গাঁটকাটা, কে ডাকাত-সর্দার, আর কে যে ভাল মানুষ, প্যাঁচে পড়ে মিথ্যে মামলায় জড়িয়ে গেছে—তার কোন হদিস পাওয়া যায় না। বসবার কোন ব্যবস্থা নেই, দারুণ গুমট গরমে না আছে বাইরের একটু হাওয়া আসার পথ, আর পাখা ত নেই-ই, কারণ শ্বশুরবাড়ী ত নয় এটা।

একটু উদভ্রান্ত দৃষ্টি বুঝতে পারলেই উকিলের মুহুরি এসে মক্কেল পাকড়াবার চেষ্টা করছে। আধ ঘণ্টার মধ্যে আমাকে অন্তত বার দশেক বলতে হল যে, আমি ফরিয়াদী পক্ষের সাক্ষী, আমার নিজের কোন উকিল দরকার নেই এবং তাদের উকিল ঠিক আছে।

এগারোটার পর বারোটা, একটাও বাজল, আমি যেমন তেমনি ঘুরছি। মাঝে মাঝে কোর্ট-ঘরের দরজা থেকে পাহারাদার একটা হাঁক দেয়—মনে হয় কোন নাম ডাকছে, কিন্তু তার হুমকির তলায় আসল নামটা চাপা পড়ে যায়।

কি বিচিত্র সমারোহ এখানে! ভীত সন্ত্রস্ত আসামীদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে ডাকসাইটে ফরিয়াদী। এক কোণে দেখলাম, দু-ভায়ের ঝগড়া মেটাবার চেষ্টা করছেন উকিল, কিন্তু অনেক বলেও তাদের চোখা-চোখি করাতে পারছেন না। একটা লুঙ্গি-পরা ছেঁড়া-গেঞ্জি-গায় দরিদ্র বেচারা পড়েছে মুহুরির খপ্পরে কি পয়সা দিয়েছে, জানি না, মুহুরির তাগিদে অতিষ্ঠ হয়ে সে লুঙ্গির বাঁধন আলগা করে বলে ওঠে, 'মাইরি বলছি, মা কালীর দিব্যি, একটা পাই পয়সাও আর নেই।'

এককোণে মেঝে জাঁকিয়ে বসে আছে ভারিক্কী বাড়ীওআলী আর চার-পাঁচ জন খেঁদি-পুঁটির দল। টহলদারী জমাদার রস জমাবার চেষ্টা করে। মুখে জর্দা ফেলতে ফেলতে উত্তর করে বাড়ীওআলী, এত যদি শখ, তা হলে দিক্ করিস কেন? দুদিক দিয়ে লুটতে চাইলে হয় নাকি?

বেলা গোটা দেড়েকের সময় রসারের দেখা পেলাম, সে নাকি এতক্ষণ খুঁজে ডি'সিলভাকে বার করেছে। বললে, কেস উঠতে চারটেও বাজতে পারে। আমি ততক্ষণে বিরক্তি, ক্লান্তি, গরম ও দুর্গন্ধে প্রায় শেষ হয়ে

গিয়েছি। এখনো চারটে অবধি এই পরিবেশে এই ভাবে কাটাতে হবে শুনে হতাশ হয়ে পড়লাম। বললাম রসারকে, রইল তোমার মামলা, আমার ঢের শিক্ষা হয়েছে। রসার প্রায় কেঁদে ফেলে আর কি, বাবু, তুমি অন্যায়ের বিরুদ্ধে একটা রাইট ক্যজ্‌কে সাপোর্ট করতে এসেছ, কালচার্ড ইণ্ডিয়ান্স তার জন্য অনেক সাফার করে, স্টেক করে, আর তুমি স্টেপ ব্যাক করবে—এ আমি ভাবতেও পারি না।

কালচার্ড ইণ্ডিয়ান্স—এই গর্ববোধ মনের নীচে চাপা আছে, অতএব আর সরে পড়া চলে না। বললাম, বরং ঘুরে আসি, চারটে নাগাদ হাজিরা দেবো।

তা হয় না বাবু, বলে রসার, যদি আগে ডাক হয়ে যায়! সব গোলমাল হয়ে যাবে। চল, মিঃ ডি'সিলভাকে বলে নিচে কোন একটা দোকানে বসে চা খাওয়া যাক। ইউ উইল বি রিফ্রেশ্‌ড্‌। ডাব খাবে? কিছু সলিড্স্‌?

চারটের সময় শুনলাম মামলার আবার তারিখ পড়েছে। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, আর নয়। একবার যা নাম লিখিয়েছি, হিতাকাঙ্খী বন্ধুদের কথা শুনিনি, বাহাদুরী নেবার সেই প্রচেষ্টার মূল্য আমাকে দিতেই হবে। কিন্তু ভবিষ্যতে শখ করে ফরিয়াদী পক্ষে সাক্ষী হয়ে আদালতে আসব না কিছুতেই। চোখের সামনে নিরীহ লোকের বিড়ম্বনা, নারীর লাঞ্ছনা, এমন কি, খুন পর্যন্ত প্রত্যক্ষ করলেও সাক্ষী দিতে আসব না তার জন্য।

প্রতিজ্ঞা শুনে যোগেশ বললে, কেন, কালচার্ড ইণ্ডিয়ান্স সব সময় মর‍্যাল ক্যজ সাপোর্ট করবে না?

আমি জবাবে বললাম, এ রাজত্বে কালচার আর মর‍্যাল ক্যজের জায়গা নেই। বোধ হয়, কালচার্ড লোক মর‍্যাল ক্যজের সমর্থনে সাক্ষী দিতে যাতে না আসে, সেই জন্যই এরকম ব্যবস্থা।

আসামী পক্ষের দুঁদে ফিরিঙ্গি উকিল জেরা করে আমাকে কাবু করতে পারে নি। তবু ডি'ক্রুজের সাজা হয়ে গেল, অবশ্য রায় দানের দিন আমি আদালতে হাজির ছিলাম না। চাকরিও গিয়েছে ওর, রসার সোল্লাসে আমাকে খবর দিলে। বুড়ীও নাকি এখান থেকে চলে গেছে। মেম-সাহেবের নাম করে রসার আমাকে চা-পানে আপ্যায়নের প্রস্তাব করলে। কিন্তু বৃদ্ধার করুণ মুখছবি মনে জেগে উঠল আমার। রসারের আমন্ত্রণ আমি গ্রহণ করতে পারলাম না।

মহাত্মা গান্ধীর গ্রেফ্‌তারে দেশব্যাপী যে বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছিল তা চরমে উঠেছিল পাঞ্জাবে। বিশেষ করে রংরুট সংগ্রহের জুলুমে পাঞ্জাবীরা আগে থেকেই ছিল ক্ষেপে। কিন্তু পাঞ্জাবীদের সেই বিক্ষোভ প্রকাশের বিরুদ্ধে ইংরেজ শাসকের নৃশংসতা যে কত দূর পৌঁছতে পারে সে ধারণা কারুর ছিল না। জালিয়ানওআলাবাগের হত্যাকাণ্ডে ইংরেজ বুঝিয়ে দিল যে, তাদের রাজশক্তির স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ চলবে না। জেনারেল ডায়ারও সদম্ভে নিজ মুখে ঘোষণা করেন যে, ভারতবাসীকে এ কথা ভাল করে বুঝিয়ে দেবার জন্যই সে ওই হত্যাকাণ্ড করেছিল।

কিন্তু ফল হল উলটো। জালিয়ানওআলাবাগের খবর চেপে রাখার জন্য ইংরেজ-সরকার প্রাণপণে চেষ্টা করা সত্ত্বেও খবর ছড়িয়ে পড়ল দেশের সর্বত্র।

রাউলট আইন ও গান্ধীজীর গ্রেফ্‌তারের প্রতিবাদে জালিআনওয়ালা বাগিচায় অনুষ্ঠিত জনসভার একমাত্র প্রবেশ-দ্বারে মেশিনগান বসিয়ে সসৈন্য ডায়ার নর-নারী-শিশু-নির্বিশেষে সকলের উপর দশ মিনিট ধরে ষোলশ' গুলি চালায়। বিক্ষিপ্ত জনতা যে দিকে ভিড় করে সেই দিকেই তাক করে গুলি ছোঁড়ার আদেশ দেওয়া হয়। ইতিপূর্বে জনগণ ইংরেজ-বিদ্বেষ প্রকাশ করে লেডি ডাক্তার মিস শেরউডের উপর অপমান সূচক ব্যবহার করেছিল। সেই রাস্তায় লোককে হামাগুড়ি দিয়ে চলতে বাধ্য করা হয়। আর যার উপর সন্দেহ হয়, প্রকাশ্যে টিকটিকিতে বেঁধে তাকেই নৃশংসভাবে বেত মারা হয়। শুধু অমৃতসরে জঙ্গী আদালতের বিচারে একান্ন জনের প্রাণদণ্ড, ছেচল্লিশ জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর এবং একশ ষোল জনের দশ থেকে তিন বছর কারাদণ্ড হয়। মহিলাদের উপরও চলে বীভৎস অত্যাচার।

এই সব খবর সংবাদপত্রের উপর কড়া নিষেধ সত্ত্বেও যখন সর্বত্র ছড়িয়ে গেল, দেশের আপামর সাধারণের মনে তার প্রতিক্রিয়া হল অসাধারণ। গান্ধীজীর ভাষায় বলতে গেলে, 'এই আত্মবলিতে হিন্দু-মুসলমান ও শিখের সম্মিলিত ধারা এক খাতে প্রবাহিত হয়। মহামৃত্যুর মধ্যেই তারা ঐক্য লাভ করে।' আর মৃত্যুর ভিতর দিয়েই আসে জাগরণ। কলকাতায় যে প্রতিক্রিয়া দেখা যায় তাতে

পুলিশের গুলিতে ছ' জন নিহত ও বারো জন আহত হয়। ভারতের অন্যান্য শহর ছাড়া বাঙলার মফঃস্বল অঞ্চলেও বিক্ষোভ প্রকাশ পায়। কদিন এমন অবস্থা হয় যে আমাদের ক্ষুদ্র স্বার্থ ও খুঁটিনাটি-নিয়ে-মেতে-থাকা মনগুলিও আর কিছু ভাবতে পারে না। চাটুজ্যে মহাশয়ের খাওয়ার গল্প বন্ধ হয়ে গেছে, বন্ধ হয়েছে যোগেশের আমাকে ও প্রতিবেশী মেমসাহেবকে নিয়ে রসিকতা। 'সবুজপত্র'-এর প্রেসের শশীবাবু থেকে শুরু করে সনৎ বোস পর্যন্ত একই কথা বলছে, বলুন ত এমনি করে রাজ্যশাসন করবে ইংরেজ! যাবে, যেতে যে বসেছে, এই মরণ-কামড়ই তার প্রমাণ। এমন যে নিস্তরঙ্গ 'কমলালয়', সেখানেও যেন মনে হল ঢেউ এসে লেগেছে। বিশেষ করে যেদিন রবীন্দ্রনাথ সারা দেশের কোটি কোটি মূক জনসাধারণের প্রতিবাদকে রূপায়িত করলেন ইংরেজের দেওয়া 'নাইট' খেতাব বর্জন করে, সেদিন তার প্রতিক্রিয়া দেখেছিলাম চৌধুরী মহাশয়ের মধ্যে।

তেসরা জুন (১৯১৯) তারিখের 'স্টেট্‌স্‌ম্যান' পত্রিকায় প্রকাশিত ভাইসরয় লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ডকে লিখিত ত্রিশে মে তারিখের পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন—হতভাগ্য জনগণকে যে নৃশংস শাস্তি দেওয়া হয়েছে, প্রাচীন ও আধুনিক কোন সভ্য শাসন-ব্যবস্থায় তার কোন জোড়া নেই···সরকারী সম্মানের প্রতীক আজ জাতীয় অসম্মানের মধ্যে আমাদের লজ্জাকেই প্রকট করে তুলেছে। তথাকথিত নগণ্যতার অপরাধে আমার যে দেশবাসীকে অমানুষিক অপমান সহ্য করতে হচ্ছে, সমস্ত বিশেষ সম্মান-বর্জিত হয়ে তাদেরই পাশে এসে আমি দাঁড়াতে চাই।

'স্টেট্‌স্‌ম্যান' পত্রিকায় বিনা মন্তব্যে চিঠিখানা ছাপা হলেও ইংরেজের মুখপত্র 'ইংলিশম্যান'-এর স্তম্ভে লেখা হল: যখন বুঝতে পারবেন যে, এর ফলে এক কাণাকড়িও কারুর এসে যাবে না, তখন রবীন্দ্রনাথ নিজে ছাড়া আর কেউ তার জন্য এতটুকু বেদনা বা বিস্ময় বোধ করবেন না। যে রবীন্দ্রনাথের নাম পর্যন্ত পাঞ্জাবে কখনও কেউ শোনে নি, লেখক হিসেবে পাঞ্জাবে কর্নেল ফ্রাঙ্ক জন্‌সনের (মার্শাল আইনের প্রয়োগ-কর্তা) মত জনপ্রিয়তা যিনি কোন দিনই লাভ করতে পারেন নি, তিনি সরকারী নীতি সমর্থন করেন, কি, না করেন তাতে যেন ভারী বয়ে যাচ্ছে। এই বাঙালী কবি 'নাইট' থাকতে চান, কি নেহাৎ 'বাবু' বলে পরিচিত হতে চান, ব্রিটিশ-শাসন ও ন্যায়-বিচারের সুনাম, সম্মান ও নিরাপত্তার পক্ষে তার এতটুকু মূল্য নেই।

ইংরেজ সরকার বা তাদের মুখপত্র যাই মনে করুন না কেন, দেশের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের এই প্রতিবাদ গভীর প্রভাব সৃষ্টি করল। 'ইংরেজ-ঘেঁষা' 'বিশ্বপ্রেমিক' বলে রবীন্দ্রনাথকে যারা এতদিন শ্লেষ করেছে তারাও অভিভূত হয়ে পড়ল তাঁর দেশপ্রেমের এই অভিব্যক্তিতে, কবির নামোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে কপালে জোড় হাত ঠেকাতে দেখলাম সকলকে।

দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিরাও সকলে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু তা যে কতখানি গভীর হয়েছিল তার চাক্ষুষ পরিচয় পেলাম রামেন্দ্রসুন্দরের মধ্যে।

মাতৃশ্রাদ্ধের শেষে দেশ থেকে যখন রামেন্দ্রসুন্দর কলকাতায় ফিরলেন তখন তাঁর অসুস্থতা রীতিমত বেড়ে গিয়েছে। নিজে ত জীবনের আশা ত্যাগ করছেনই, আত্মীয়-পরিজন, এমন কি, চিকিৎসক পর্যন্ত ভরসা পাচ্ছেন না।

শোথের রোগী, সকালের দিকে ভাল থাকেন, বেলা বাড়ার সঙ্গে শরীর খারাপ হয়। সকালের দিকে খবরের কাগজ পড়ে শোনানো হয় তাঁকে। মধ্যে মধ্যে সকালের দিকে আমি উপস্থিত থাকি। নলিনীদা, রামকমলদা, ব্যোমকেশ মুস্তফি মশায়—এঁরাও আসেন। দেশের নবজাগরণের সংবাদে মুখচোখ উৎফুল্ল হয়ে উঠে রামেন্দ্রসুন্দরের। বলেন, আর একবার বাঁচতে ইচ্ছে করছে ভাই। এই মরা জাতের মধ্যে নতুন প্রাণের জোয়ার এলে তার যা শক্তি তার ভাঙন-টুকুই শুধু দেখব, তার সৃষ্টি দেখব না! আবার উত্তেজনার প্রতিক্রিয়ায় ক্লান্ত বোধ করে বলেন, ভাঙারও ত শেষ দেখতে পেলাম না! তবুও স্রোত চলতে শুরু করেছে, এ স্রোত যে প্রবল বন্যার আকার ধারণ করবে, তাকে রোধ করবে কে? সরকারী অত্যাচারের কাহিনী শুনে ঘৃণায় শিউরে উঠতেন, এই ইংরেজের মানবতা-বোধ, এই তাদের সংস্কৃতি! ছেলেবেলা থেকে যে মানবতা-বোধের প্রত্যক্ষ কাহিনী মুখস্ত করিয়ে আমাদের মনে রাজভক্তির শিকড় গাড়া হয়েছে, আমরা চাক্ষুষ করলাম সেই মানবতা-বোধের এই বিষময় ফল!

আবার কখনও হয় ত বলে ওঠেন, হয় ত মরে যাওয়াই ভাল। এই সব দেখে শুনে আর কি পারব ওদের জাতের উপর শ্রদ্ধা রেখে ওদের মানবতার শেখানো বুলি তোতাপাখীর মত আওড়াতে?

কবির চিঠিখানা সেদিন 'স্টেটস্‌ম্যান' থেকে পড়ে শোনানো হল, সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজনায় উঠে বসলেন তিনি। সকলে তাড়াতাড়ি তাঁকে শুইয়ে দিলেন। তিনি বললেন, বল কি, উঠব না? ছুটে গিয়ে এই মুহূর্তে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে আসতে হবে! তা যদি না করি, কত বড় অকর্তব্য হবে বুঝতে পারছ!

ভাই দুর্গাদাস জবাব দিলেন, তা বলে যে আপনার শরীর অসুস্থ দাদা।

অসুখ বলেই ত এত বড় কর্তব্যে অবহেলা করে পড়ে থাকতে হচ্ছে। তুমি ভাবতে পার দুর্গাদাস, অন্তরে কতখানি গভীর ক্ষত হলে ইংরেজ সরকারকে এমনভাবে ধিক্কৃত করেছেন কবি! আর দেশের জনসাধারণের প্রতি কতখানি ভালবাসা থাকলে তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এমন প্রতিবাদে এগিয়ে আসতে পারেন!

তিনি সকলেরই বরেণ্য এবং নমস্য, এর মধ্যে কি বিন্দুমাত্র সংশয় আছে, দুর্গাদাস ত্রিবেদী মহাশয় জবাব করলেন।

আমার দিকে তাকিয়ে একবার রামেন্দ্রসুন্দর বললেন, কবি এখন কোথায় আছেন, জান পবিত্র?

তিনি কলকাতায় এসেছেন, আমি জবাব দিলাম।

তবু তাঁর পায়ের ধুলো নেওয়া আমার সম্ভব হবে না? রামেন্দ্রসুন্দরের কণ্ঠে আকুতি ও হতাশা। একবার দুর্গাদাসের মুখের দিকে তাকালেন, বললেন, মরবার সময় এই দুঃখটাই থেকে যাবে।

দুর্গাদাস আশ্বাস দিলেন, কবিকে একবার এখানে ডেকে আনবার চেষ্টা করতে পারি।

পারবে? রামেন্দ্রসুন্দরের সমগ্র মুখমণ্ডল উৎফুল্ল হয়ে উঠল, পারবে, পারবে তুমি?

আপনার কথা বললে তিনি নিশ্চয় আসবেন, এ বিশ্বাস আমার আছে, জবাব দিলেন দুর্গাদাস।

পরদিন দুর্গাদাসবাবু কবির সঙ্গে দেখা করে বক্তব্য নিবেদন করতেই কবি সাগ্রহে রাজী হলেন রামেন্দ্রসুন্দরের রোগশয্যায় এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে।

উনিশে জ্যৈষ্ঠ। কবি আসবেন, সকাল থেকেই রামেন্দ্রসুন্দর আনন্দে পরিপ্লুত। প্রতি মুহূর্তে চঞ্চল হয়ে উঠছেন, ওই বুঝি এলেন কবি। কবি যখন দরজায় এসে পৌঁছেছেন তখনই রামেন্দ্রসুন্দর ব্যগ্র; একমুহূর্তও যেন কালবিলম্ব সইছে না। দুর্গাদাস সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন কবিকে আগিয়ে আনতে।

এই আমি চাক্ষুষ করলাম বাঙলার রবিকে—যাঁর দীপ্তি ধারণ করার ক্ষমতা অসীম গগন ছাড়া আর কারুর নেই। তিনি এলেন পটলডাঙায় রামেন্দ্রসুন্দরের গৃহে। সাদা থান ও সুতির সাদা পাঞ্জাবি পরিধানে, গায়ে সাদা চাদর জড়ানো, তার উপর দিয়ে ঝুলছে চশমার কালোফিতে, পায়ে কটকি চটি—সূর্যেরই মত

রক্তাভ গৌর বর্ণ ঝলমল করছে তাঁর অঙ্গে। এতদিন শুধু ছবিতেই যা দেখেছি সেই মানব-মূর্তি সশরীরে দেখলাম, এতদিন যে মূর্তি ধ্যান করেছি, তাঁর সামনা সামনি দাঁড়াবার সুযোগ পেলাম।

কবি আসছেন শুনে প্রতিবেশী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও হাইকোর্টের উকিল নরেন্দ্র কুমার বসু উপস্থিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঘরে ঢুকেই হাত তুলে শাস্ত্রী মহাশয়কে নমস্কার জানালেন। শাস্ত্রী মহাশয় ও বসু মহাশয় দুজনেই করলেন প্রত্যভিবাদন। উপস্থিত আর সকলে কবির পদধুলি গ্রহণ করলেন।

রামেন্দ্রসুন্দর উঠে বসবার উপক্রম করলেন, আমাকেও ত কবির পায়ের ধুলো নিতে হবে। তাই জন্যই ত টেনে এনেছি তাঁকে এখানে।

দুর্গাদাসবাবু ও আর সকলে তাঁকে নিরস্ত করলেন, রামেন্দ্রসুন্দর বললেন, তবে কবির পায়ের ধুলো আমার মাথায় দিয়ে দাও।

কবি আসন গ্রহণ করলেন। বললেন, বড়ই কাহিল হয়ে পড়েছেন দেখছি। ব্যাপার কি?

দুর্গাদাস রোগের বিষয় বুঝিয়ে বললেন কবিকে।

রোগ ত তা হলে কঠিন, বললেন কবি, ভুগছেনও ত অনেক দিন। আর উপশমও কিছু হচ্ছে না—এ ত বড় ভাবনার কথা।

ভাবনার আর কিছু নেই, রামেন্দ্রসুন্দর তাঁর স্বভাবহাসি হেসে মন্তব্য করলেন, এখন যাবার পালাটুকু শুধু বাকী।

কিন্তু দেশের লোকের যে আপনাদের দিয়ে অনেক প্রয়োজন আছে, কবি বললেন।

রামেন্দ্রসুন্দরের প্রয়োজন কোন দিন ফুরাবে না, বললেন শাস্ত্রী মহাশয়। আপনারই ভাষা পুনরাবৃত্তি করে বলি রবীন্দ্রবাবু, বুদ্ধির জ্ঞানের, চরিত্রের ও উদারহৃদয়তার এমন সমাবেশ দেখা যায় না।

তাই ত সকলে সমান ভাবে ভালবাসেন ওঁকে, নরেন্দ্রকুমার মন্তব্য করলেন।

রামেন্দ্রসুন্দর শুধু অজাতশত্রু নন, কবি বললেন, একেবারে সকলের প্রিয়পাত্র, আর হৃদয় যে তাঁর কত বড় উদার তার পরিচয় আমিই ত পেয়েছি। প্রবল প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ থেকে আমার প্রশস্তি-সভার আয়োজন করেছিলেন, সে কথা আমি কোন দিনই ভুলতে পারব না।

আমরা চলে গেলে দেশের কোন ক্ষতি নেই, রামেন্দ্রসুন্দর বললেন, আপনি একাই পারবেন জাতিকে মুক্ত করতে, রক্ষা করতে, তার সমগ্র জীবন সৌন্দর্যে ভরিয়ে দিতে।

কিন্তু আপনার দেশপ্রীতির জোড়া পাওয়া যাবে কোথায়? বললেন কবি। আপনার চিত্তের মধ্যে ভারতের যে মানসী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত, ভারতের সনাতন বাণীর উপকরণেই তা তৈরি। তার সঙ্গে আছে আপনার নিজের ধ্যান, নিজের মনন। ব্রাহ্মণের জ্ঞান-গাম্ভীর্য ও ক্ষত্রিয়ের তেজস্বিতার অপূর্ব সমন্বয় দেখেছি এঁর মধ্যে, বলতে বলতে রবীন্দ্রনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের মুখের দিকে তাকালেন।

রবীন্দ্রবাবুর এই মন্তব্য সর্বাংশে সত্য, বললেন শাস্ত্রী মহাশয়। সাহিত্য-পরিষদের তিনি যে একাধারে দেহ ও আত্মা এ খবর রবীন্দ্রবাবুরও জানা আছে।

নিজের সম্বন্ধে আলোচনায় সঙ্কোচ বোধ করে রামেন্দ্রসুন্দর একেবারে চুপ করে গেলেন। তাঁর চোখের দৃষ্টিতে লজ্জা ও বিনয় মূর্ত হয়ে উঠেছে। ছুটি হাত জোড় করে শয়ান অবস্থায় বুকের উপর রেখেছেন।

রামেন্দ্রসুন্দরের মুখের দিকে তাকিয়ে কবি অনুভব করলেন, আত্মপ্রশংসা শুনতে তাঁর কতখানি পীড়া বোধ হচ্ছে। বললেন, এমন একজন অনুরাগী বন্ধু, প্রকৃত সুহৃদ দুরারোগ্য রোগে শয্যাশায়ী হয়ে থাকলে আমাদের অন্তর যে কতখানি ব্যথিত হয় তা বলে বোঝানো সম্ভব নয়, বলবার প্রয়োজনও নেই।

কি যেন বলি-বলি করে রামেন্দ্রসুন্দর দুর্গাদাসের মুখের দিকে চেয়ে ইঙ্গিত করলেন। বালিশের তলায় হাত দিয়ে দুর্গাদাস বার করে দিলেন 'স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকা থেকে কেটে রাখা কবির চিঠিখানা। সেখানা হাতে নিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর কবির সামনে ধরলেন। বললেন, অন্যায়ের এতবড় প্রতিবাদ আর কখনো কোন দিন কেউ করেছেন বলে আমি জানি না।

কিন্তু অন্যায়ের তুলনায় যথোচিত প্রতিবাদ করতে পারলাম কোথায়! বললেন রবীন্দ্রনাথ, যে রাজশক্তির দম্ভ সমস্ত মানবতা-বোধকে ধিক্কৃত করেছে, তার উপর বজ্র ও অগ্নি বর্ষণ করার মত কোথায় সেই রুদ্র ও ইন্দ্র! আমি শুধু পারি তাঁদের দেওয়া সম্মান ছুড়ে ফেলে দিতে। আমার দেশবাসীকে চূড়ান্ত অপমান ও অত্যাচার করে আমার একটু পিঠ চাপড়াবে

—এ আমি কেমন করে সহ্য করব? অন্তত তারা জানুক, আমি তাদের অনুগ্রহ-ভিখারী নই। এদেশের কোটি কোটি সাধারণ মানুষেরই একজন।

সেই একজনেরই পায়ের ধূলো আমার মাথায় পড়ুক, এই আকাঙ্ক্ষা নিয়েই আমি আপনাকে টেনে এনেছি, রামেন্দ্রসুন্দর বললেন।

তা হয় না, বললেন কবি, আপনার মত প্রাচীন বিজ্ঞ মনীষী আমার পদধূলি নেবেন, বয়সে সামান্য বড় হওয়ার জোরে সে অপমান আমি করতে পারি না আপনাকে।

শুধু বয়সে বড়, হেসে বললেন রামেন্দ্রসুন্দর, আপনি ত আকাশের সূর্য, আর আমি মাটির মানুষ। মধ্যে লক্ষ লক্ষ যোজনের বিরাট ব্যবধান। তাই কি পায়ের ধুলো পেতে পারব না?

আপনিও ব্রাহ্মণ, মন্তব্য করলেন শাস্ত্রী মহাশয়, বয়সে বড়, মনীষার প্রশ্ন না-ই তুললাম। রামেন্দ্রসুন্দরকে পদধূলি দেওয়ায় আপনার কোন প্রত্যবায় নেই—না শাস্ত্রীয়, না-লৌকিক।

দুর্গাদাসবাবু বললেন, চিঠিখানি যেদিন কাগজে প্রথম বেরোয়, সেই দিন থেকেই আপনার পদধূলি নেওয়ার জন্য সে কি আকুল আগ্রহ! বলছেন, আমার জীবন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

ক্ষণকাল মাথা নীচু করে কি ভাবলেন কবি, তারপর বললেন, এই দুঃখ ওঁকে দেওয়া আমার পক্ষে বন্ধুকৃত্য হবে না। অতএব যা বলেন—

রামেন্দ্রসুন্দর একবার চারপাশে তাকিয়ে দেখলেন জামাতা শীতলবাবু একটু দূরে দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি এগিয়ে এলেন একখানা টুল নিয়ে। খাটের পাশে টুলখানা পেতে দিলেন তিনি। রামেন্দ্রসুন্দরের ইঙ্গিতে কবি উঠে দাঁড়ালেন সেই টুলের উপর। রামেন্দ্রসুন্দর হাত দুখানি বাড়িয়ে দিলেন কবির পায়ের উপর, তারপর অনেকক্ষণ ধরে পায়ে হাত বুলিয়ে ধূলিশূন্য স্পর্শশুচি করযুগল নিজের মাথায় মুখে চোখে বুকে সর্বাঙ্গে বোলাতে লাগলেন। মুখে চোখে অপূর্ব প্রসন্নতা ফুটে উঠল। বললেন, এই পরম মুহূর্তের পর মৃত্যুই আমার একমাত্র কাম্য।

কবি আসন গ্রহণ করলেন। উত্তেজনার পর সাময়িক ক্লান্তিতে একটু চুপ করে থেকে রামেন্দ্রসুন্দর আবার বললেন, আর একটা আবদার আমার আপনার কাছে। এই চিঠিখানার ব্যক্ত বাণীমূর্তি আপনার মুখ থেকে প্রত্যক্ষ করতে চাই।

কাগজের টুকরাটা এগিয়ে দিলেন কবির হাতে এবং সহজভাবেই কবি তা গ্রহণ করলেন। কবি পড়তে শুরু করে দিলেন :

Your Excellency,

The enormity of the massacres...

দেখলাম তাঁর চোখে মুখে অত্যাচার ও নৃশংসতার বিরুদ্ধে যুগ যুগান্তরের পুঞ্জীভূত প্রতিবাদ বজ্রমূর্তিতে রূপ পরিগ্রহ করেছে, বেজে উঠেছে যেন রুদ্রের পিনাক ও ডমরু—একসঙ্গে। পাষাণ-মূর্তিবৎ নিশ্চল হয়ে সেই বজ্র-নির্ঘোষ শুনলেন শাস্ত্রী মহাশয়, রামেন্দ্রসুন্দর, নরেন্দ্রকুমার—সকলে। কবি-কণ্ঠের সেই ধিক্কার-বাণী বাতাসে যে তরঙ্গ সৃষ্টি করল, সাম্রাজ্যবাদ ও অত্যাচারের অবসান-কল্পে মহাপ্রলয়ের আলোড়ন জেগে উঠল তাতে। খালি-খালি মনে পড়তে লাগল আমার, ইংরেজ পত্রিকার দম্ভ উক্তি : কি যায় আসে ইংরেজের, বাঙালী কবি 'নাইট' থাকে কি 'বাবু' হয়ে যায়! সে কণ্ঠে, সে উচ্চারণে, সেই অন্তর-নিঃশেষ-করা ধিক্কার বাণীতে বিধাতার আসন টলে উঠেছিল নিশ্চয়ই। অনুভব করলাম, বিচলিত বিধাতা এ অন্যায়ের প্রতিবিধান না করে নিশ্চিন্ত হতে পারবেন না।

কবির পাঠ সাঙ্গ করার পরও সুরের রেশে ভরে রইল ঘর। আরো কিছুক্ষণ অভিভূত বাক্‌হীন হয়ে রইলেন সকলেই।

কবির সঙ্গে সঙ্গে গেলেন শাস্ত্রী মহাশয়, নরেন্দ্রকুমার, দুর্গাদাসবাবু ও শীতলবাবু এবং আরও অনেকে। আমি ঘরের ভিতরেই একপাশে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার দিকে দৃষ্টি পড়তেই রামেন্দ্রসুন্দর বলে উঠলেন, সার্থক জনম আমার জন্মেছি এ দেশে। এমন মানুষ আর কোথাও পেতাম কি!

শান্ত হয়ে শুয়ে রইলেন রামেন্দ্রসুন্দর।

পরদিন থেকে অবস্থা ক্রমশ খারাপের দিকে যেতে থাকে। আশার ক্ষীণ রেখাটুকুও আর দেখা যায় না। এখন শুধু সময়ের প্রতীক্ষা। সেই সময় এসে পৌঁছল উনত্রিশে জ্যৈষ্ঠ রাত্রি দশটায়। সর্বাঙ্গসুন্দর রামেন্দ্রসুন্দর এই ধরণী ত্যাগ করে চিরসুন্দরের মধ্যে বিলীন হলেন।

বহু আত্মীয়, গুণমুগ্ধ বন্ধু, বান্ধব ও ছাত্রসমাজ চাইলে রামেন্দ্রসুন্দরের শবদেহকে যোগ্য মর্যাদা দিয়ে শোভাযাত্রায় শ্মশানঘাটে নিয়ে যাওয়া হোক।

কিন্তু দুর্গাদাসবাবু বললেন, নিজেকে নিয়ে কোন আড়ম্বর কোন দিনই পছন্দ করেন নি দাদা। অতএব সর্বসম্মতিক্রমে অনাড়ম্বর ভাবেই রামেন্দ্রসুন্দরের নশ্বর দেহের সৎকার করা হল

খাওয়া-দাওয়া করে যথাসময়ে 'সবুজপত্র'-এ এসেছি। তারে-নারে করে একটা বাজতেই বেরিয়ে পড়লাম হাইকোর্ট বার লাইব্রেরিতে। এটা ইদানীং প্রায় আমার দৈনিক কর্তব্যে দাঁড়িয়ে গেছে। সেখানে আলি সাহেব ও চক্রবর্তী সাহেব আমি গেলেই মনের আনন্দে নানা গল্প জুড়ে দেন। 'সবুজ-পত্র,' 'সাহিত্য-পরিষদ,' 'রবীন্দ্রনাথ,' 'র‍্যাশনালিস্টিক সোসাইটি,' সমাজ, রাজনীতি—কোন কিছুই আলোচনার আওতা থেকে বাইরে পড়ে থাকে না। আশপাশ থেকে আরও দু-চারজন আমাদের আলোচনায় যোগ দেন। এই উপলক্ষ্যে যাঁদের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল তাঁদের মধ্যে ছিলেন ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, চিত্তরঞ্জন দাশ, প্রভাসচন্দ্র মিত্র, বিজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হরিদাস বসু, সুরেন হালদার, এস. আর. দাশ, প্রফুল্লরঞ্জন দাশ প্রভৃতি। এঁরা সকলেই আমাকে স্নেহের চক্ষে দেখতেন, দেখা হলেই কুশলাদি জিজ্ঞাসা করতেন। ডেকে চা খাইয়েছেন কতদিন। তাঁদের স্নেহের সুযোগে আমি নিজেকে কতকটা তাঁদের আশ্রিত মনে করতাম। নিঃসঙ্কোচে এসে কত সময় বক্তব্য নিবেদন করেছি।

মাঝে মাঝে ঢুকতাম উকিলদের ঘরে অতুলবাবুর সঙ্গে পরিচয়ের সুবাদে। সেখানে ঢুঁ মারার ফলেও আমি কম লাভবান হইনি। যে-কোন কারণেই হোক, বর্ষীয়ান, বিদ্বান ও সংস্কৃতিবান ব্যক্তিমাত্রেরই স্নেহ আমি পদে পদে অর্জন করে গিয়েছি। অতুলচন্দ্র গুপ্ত, ফজলুল হক, চারুচন্দ্র সান্যাল, মন্মথনাথ মুখার্জি, সতীশ সিংহ, বিজন মুখার্জি, গিরিজা সান্যাল, ফণিভূষণ চক্রবর্তী—এঁদের পোষকতা পরবর্তী জীবনে আমার পাথেয় হয়েছে।

অকারণ এই হাইকোর্ট ঘোরাফেরার মধ্যে আমি নগদ কি পেতাম জানি না, তবু এর আকর্ষণ আমার কাছে ছিল তীব্র। হয় ত শিক্ষা, সংস্কৃতি ও আদর্শবাদে এই সমাবেশে আমি নিজেকে অনেকখানি উন্নত বোধ করতাম। নিজের কাছে যে নিজের গুরুত্ব বেড়ে যেত সে কথা সেদিন পুরোপুরি অনুধাবন করতে না পারলেও আজ স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারছি।

এমনি দৈনন্দিন হাইকোর্ট-পরিক্রমা সেরে আপিসে ফিরতেই নিচের তলায় সঙ্গে সঙ্গে সনৎবাবু খবর দিলেন, এক বাঙালী মিলিটারিম্যান আপনার খোঁজে এসেছিল, উপরে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম।

আছে কি এখনো? আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

না, চলে গেছে। কিছু বলে গেছে কি-না শশীবাবুর কাছে জানতে পারবেন।

ভয়ানক আগ্রহ বোধ হল। বাঙালী মিলিটারিম্যান কখনো কারুর সঙ্গে আমার পরিচয় আছে, এ আমি স্মরণে আনতে পারলাম না। হন্ হন্ করে উপরে চলে এলাম। আমাকে দেখেই শশীবাবু বলে উঠলেন, আপনি ত ঘুরে বেড়াচ্ছেন, এদিকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সোজা এক মিলিটারিম্যান আপনার খোঁজে এসে হাজির! এই নিন চিঠি রেখে গেছে।

কাগজখানা তুলে নিয়ে দেখতেই বিস্ময় কেটে গেল। কিন্তু আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠল সমস্ত অন্তর। চিঠিতে লেখা:

পবিত্রবাবু, কাল কলকাতায় এসে পৌঁছেছি। দেখা করতে এলাম, কিন্তু বরাত খারাপ। আছি ৩২নং কলেজ স্ট্রীটে। বাড়ীটা আপনার সুপরিচিত। দেখা পাওয়ার আগ্রহে বসে থাকব।

হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম

তা হলে নজরুল ইসলাম কলকাতায় এসে পৌঁছেছে! ক'দিন আগেই ওর চিঠি পেয়েছি। ওদের উনপঞ্চাশ নম্বর বাঙালী পল্টনের দল ভেঙে দেওয়া হয়েছে। এবার ওর দেশে ফেরার পালা। শৈলজানন্দ, মুজফ্ফর, নাসিরউদ্দিন ও পবিত্র গাঙ্গুলী ছাড়া আর কারুর সঙ্গে কলকাতায় ও পরিচয় দাবি করতে পারে না। এদের মধ্যে এক শৈলজানন্দ ছাড়া আবার আর কারুর সঙ্গে ওর পরিচয় চাক্ষুষ নয়। চিঠিতে চিঠিতে, নামে নামে জানাজানি শুধু। চিঠির জানাজানি কত গভীর হতে পারে তা অনুভব করলাম নিজের মনের মধ্যে। কত ভালবাসার আপনার জন যেন বহুদিন প্রবাসের পর ফিরে এসেছে ঘরে।

প্রায় মাস আষ্টেক আগে 'সবুজপত্র' আপিসে আমি সর্বপ্রথম নজরুলের চিঠি পাই। 'সবুজপত্র'-এ প্রকাশের জন্য সম্পাদকের বরাবরে একটি কবিতা পাঠিয়েছিল প্রকাশের আশায়। কবিতাটি আমি যথাসময়ে চৌধুরী মহাশয়ের

কাছে এগিয়ে দিই। কদিন বাদে তিনি আমায় জানান, কবিতাটি প্রকাশে তিনি ইচ্ছুক নন।

মনে বড় ব্যথা পেলাম। বহুদূর প্রবাসে এক বাঙালী যুবক আত্মীয় পরিজন-বর্জিত হয়ে জীবন-মরণের খেলা খেলছে, দুটো মনের কথা নিপুণ হাতে ছন্দে গেঁথে সে জানাতে চাইছে তার বাঙালী আপনার জনকে। হয়ত রবীন্দ্রনাথের কবিতার পাশে রেখে তাকে ভাল কবিতাও বলা চলে না। কিন্তু তার মধ্যে যে প্রাণের কথা উৎসারিত, আর যে মিষ্টি বাঁধুনী—তা আমাকে মুগ্ধ করল। ভেবে ভেবে একদিন কবিতাটি পকেটে নিয়ে রওনা হলাম 'প্রবাসী' আপিসের দিকে।

'প্রবাসী' আপিস তখন সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের পাশের গলিতে। চারু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সম্পাদনার কাজ দেখাশুনা করেন। তাঁর সঙ্গে আমার ইতিপূর্বেই পরিচয় হয়েছিল, সেই সুবাদে কবিতা পাওয়ার ঘটনাটি বিবৃত করে কবিতাটি এগিয়ে দিলাম তাঁর হাতে।

একবার চোখ বুলিয়েই চারুবাবু বলে উঠলেন, নিশ্চয়ই ছাপব এ কবিতা। পৌষ সংখ্যা বেরুতে আর মাত্র সাত-আট দিন বাকী আছে। তাতে অসুবিধা কিছু হবে। কিন্তু পরবর্তী সংখ্যার জন্য ফেলে রাখা সঙ্গত হবে না।

পৌষেই (১৩২৬) 'প্রবাসী'তে কবিতাটি প্রকাশিত হয়ে গেল। কবিতাটি এই ঃ

আশায়

(হাফেজ)

নাই বা পেল নাগাল, শুধু সৌরভের আশে
অবুঝ সবুজ দূর্ব্বা যেমন জুঁই কুঁড়িটির পাশে
বসেই আছে, তেম্‌নি বিভোর থাকবে প্রিয়ার আশায়,
তার অলকের একটু সুবাস পশ্‌বে তোরও নাসায়।
বরষ শেষে একটি বারও প্রিয়ার হিয়ার পরশ
জাগাবেরে তোরও প্রাণে অমনি অবুঝ হরষ।

'প্রবাসী' যেদিন বেরুল, ব্যক্তিগত জয়গর্বে আমি গর্বিত হয়ে উঠলাম। 'প্রবাসী' থেকে সরাসরি নজরুলকে বই পাঠানো হবে জেনে আমি তাকে চিঠি লিখলাম ব্যাপারটা সব জানিয়ে। নজরুল তখন করাচীতে পণ্টনের সঙ্গে। আমি তাকে জানালাম, 'সবুজপত্র'-এ কবিতাটি প্রকাশ করা সম্ভব না হওয়ায় আমি নিজের দায়িত্বে তার অনুমতি না নিয়েই 'প্রবাসী'তে সেটি ছাপিয়েছি। এর জন্যে যদি তার কোন ক্ষোভের কারণ হয়, সে দায়িত্ব সম্পূর্ণ আমার।

সোল্লাস কলরব বহন করে জবাব এল—যেন অতি-পরিচিতকে জড়িয়ে ধরেছে আগ্রহের আতিশয্যে। নজরুল লিখেছে :

··· 'প্রবাসী'তে বেরিয়েছে 'সবুজপত্র'-এ পাঠানো কবিতা, এতে কবিতার মর্য্যাদা বেড়েছে কি কমেছে, তা আমি ভাবতে পারছি না। 'সবুজপত্র'-এর নিজস্ব আভিজাত্য থাকলেও 'প্রবাসী'র মর্য্যাদা এতটুকুও কম নয়। প্রচার আরও বেশী। তা ছাড়া, আমি কবিতা লিখেছি; পারসিক কবি হাফেজের মধ্যে বাঙ্গলার সবুজ দূর্ব্বা ও জুঁই ফুলের সুবাস আর প্রিয়ার চূর্ণ কুন্তলের যে মৃদু গন্ধের সন্ধান আমি পেয়েছি, সে সবই ত খাঁটি বাঙ্গলার কথা, বাঙ্গালী জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, আনন্দরসের পরিপূর্ণ সমারোহ। কত শত বছর আগের পারস্যের কবি, আর কোথায় আজকের সদ্য শিশির ভেজা সবুজ বাঙ্গলা। ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তের রুক্ষ পরিবেশে মৃত্যুসমারোহের মধ্যে বসে এই যে চিরন্তন প্রেমিক-মনের সমভাব আমি চাক্ষুষ করলাম, আমার ভাষায়, আমার আপনার জন বাঙ্গালীকে সেই কথা জানাবার আকুল আগ্রহই এই এক টুকরো কবিতা হয়ে ফুটে বেরিয়েছে। জানি না, জুঁই ফুলের মৃদু গন্ধ, ও দূর্ব্বার শ্যামলতা এর মধ্যে ফুটেছে কি না। তবু বাঙ্গালীর সচেতন মনে মানুষের ভাবজীবনের এই একান্ত-বোধ যদি জাগাতে পারে তবে নিজেকে ধন্য মনে করব। অবশ্য বাঙ্গালীর কাছে পৌঁছে দেবার ও যোগ্য বাহনে পরিবেশন করবার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব আপনার। ···'

হয় ত কৃতিত্বটুকুর মোহেই আমি কবিতাটি নিয়ে 'প্রবাসী' পর্যন্ত দৌড়েছিলাম। কিন্তু তার পরে যা পেলাম, তাতে সেই কৃতিত্বের আত্মাভিমান কোথায় তলিয়ে গেল!

ইতিমধ্যে নজরুল আর আমাকে কোন কবিতা পাঠায় নি, অন্য কোথাও পাঠিয়েছে বলে আমি শুনি নি কোন দিন। কাজেই একজন কবি আবিষ্কার করে ফেলেছি এমন আত্মপ্রসাদ বোধ করবার কোন কারণ ঘটে নি আমার। কিন্তু

একটি প্রকৃত কবি-মনা দরদী অন্তরঙ্গ বন্ধু যে লাভ করেছি, সে বিষয়ে সাক্ষাৎ পরিচয়ের আগেই নিঃসন্দেহ হবার সুযোগ পেয়েছিলাম। আমার চিঠির জবাবে সে লিখলে ঃ

... চুরুলিয়ার লেটুর দলের গান লিখিয়ে ছোকরা নজরুলকে কে-ই বা এক কানাকড়ি দাম দিয়েছে! স্কুল-পালানো, ম্যাট্রিক-পাশ-না-করা পল্টন-ফেরত বাঙ্গালী ছেলে কী নিয়েই-বা সমাজে প্রতিষ্ঠার আশা করবে! আমার একমাত্র ভরসা মানুষের হৃদয়। হয় ত তা আগাছা বা ঘাসের মত অঢেল খুঁজে পাওয়া যায় না, কিন্তু বাঙ্গালা দেশে তা যে দুর্লভ নয়, তার প্রমাণ আমি এই সুদূরে থেকেও পাচ্ছি। নিঃসঙ্কোচে ও নির্ব্বিকারে প্রাণ-দেওয়া-নেওয়া প্রত্যক্ষ করেছি কিন্তু মন-দেওয়া-নেওয়া যে স্থান-কাল দূরত্বের ব্যবধান মানে না, তাও উপলব্ধি করছি। ...

আপিস ছুটি পর্যন্ত আমার দেরি সইল না। অনুমতির অপেক্ষা ছিল না বটে, তবু শশীবাবুকে জানিয়ে আমি বেরিয়ে পড়লাম।

সেই ঘোড়ায়-চড়া ছেলেটির কাছে ছুটলেন বুঝি?

ঘোড়ায় চড়া কেন? আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

ওরে বাবা, ঘোড়ায় চড়া নয়? খাকি পোশাক, পা-চাপা পাৎলুন, হাঁটু পর্যন্ত বুট, যে রকম গট্‌গট্‌ করে এসে ঢুকল, মনে হল, যেন দোর গোড়ায় ঘোড়াটা থামিয়ে এসেছে, সেটার মুখ দিয়ে ফেনা কাটছে এখনো।

লড়াই-ফেরত কি-না! হাবিলদার! সেই রেশ এখনো বোধ হয়—কাটেনি।

তা, আপনি যে চিঠি পাওয়া মাত্রই ছুটলেন! শ্যামের বাঁশি বাজার পরে রাধিকাও ঘর ছাড়তে একটু বেশী সময় নিত।

আপনি আবার এর মধ্যে রাধা-কৃষ্ণ টেনে আনলেন দেখছি! হেসে ফেললাম আমি।

টেনে আনলাম কি সাধে মশায়, শশীবাবু বললেন, পরনে ঘোড়-সোয়ারি পোশাক থাকলে কি হবে, মাথায় ইয়া ফাঁপানো বাবরি চুল, মোহনচূড়া বেঁধে দিলেই হয়! আর মুখখানিও ননীগোপালের মত নধর। ইয়া বড় টানা টানা চোখ!

আমি হলাম সেই শ্রীকৃষ্ণের রাধা, না শশীবাবু? আর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই

আপনি তার নাক মুখ চোখ চাউনি বুকের মধ্যে গেঁথে নিয়েছেন!

আমি গেঁথে নেবো কেন? সে যে নিজে থেকেই গেঁথে দিয়ে চলে গেল! শশীবাবু বললেন, বেশ বুঝতে পারছি, কী যেন একটা অদ্ভুত কি লুকিয়ে রয়েছে তার ভিতরে!

আমি যাই, দেখে আসি। আমি বললাম।

ও, আপনি বুঝি এখনো দেখেনইনি তাকে! তা হলে আর দেরি করবেন না, চলে যান।

আমি বেরিয়ে এলাম। পিছন থেকে শুনলাম, শশীবাবু সুর করে বলছেন, 'না-দেখিতেই ভালোবেসেছি!'

বত্রিশ নম্বর কলেজ স্ট্রীট। নজরুলই লিখেছে এই ডেরাটা আমার সুপরিচিত। মুজফ্ফরের কাছে শুনেছে নিশ্চয়। কিন্তু মুজফ্ফরের ঘরে এসে দেখি কেউ নেই। ভোঁ-ভাঁ খালি পড়ে আছে। সামনে আফজলের ঘরও তালা বন্ধ। আর মুসলিম-সাহিত্য-সমিতির আপিস এখনো খোলবার সময় হয় নি। একটু ইতস্তত করে খোলা ঘরখানার ভিতর ঢুকে পড়লাম। এ প্রান্তের দরজা থেকে লম্বা ঘরের ও-প্রান্তে এলাম চলে। হঠাৎ কানে বেজে উঠল হারমোনিয়ামের সুর, তার সঙ্গে কে যেন গলা মেলাবার চেষ্টা করছে। আওয়াজটা আসছে ভিতর থেকে, ঘরের এ-পাশের দরজা পেরিয়ে একটু অন্দরমহল আছে যেন। তবে একক মানুষের ডেরা, অন্দর থাকলেও সেখানে জানানা নেই—এই ভরসায় একটু উঁকি মারলাম। দেখি, একটি কেওড়া কাঠের নেড়া তক্তপোশে বসে একজন হারমোনিয়াম বাজাচ্ছে, পরনে লুঙ্গি, গায়ে গেঞ্জি। সুরের আবেগে মাথা নাড়াতে যে-ভাবে তার চুল দুলে উঠছে, আমার লেশমাত্র সংশয় রইল না—এ-ই শশীবাবুর শ্রীকৃষ্ণ।

ভিতরে সোজা ঢুকে যাব কি-না ভাবছি, এই সময় সে এদিকে দৃষ্টি ঘোরাতে আমার সঙ্গে চোখা-চোখি হয়ে গেল। জিজ্ঞাসু দৃষ্টির উত্তরে বললাম, হাবিলদার সাহেবকে চাই।

কোলের উপর থেকে হারমোনিয়ামটা নামিয়ে উঠে দাঁড়াল নজরুল। এক লাফে উঠে এসে একবার আমায় আপাদমস্তকে দেখে নিলে, তার পরই, আপনি পবিত্র গাঙ্গুলী!—এই মন্তব্য করে সঙ্গে সঙ্গে দু-হাত দিয়ে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরল আমায়। বললে, খবর পেলে একটুও দেরি করবেন না, এ আমি জানতাম।

বাইরের ঘরে দুজনে এসে তক্তপোশ জাঁকিয়ে বসলাম। প্রশ্ন করলাম, আমি যে পবিত্র গাঙ্গুলী, একথা বুঝলে কি করে ?

বুঝতে সময় লাগে নি, হেসে উঠল নজরুল। সে যেন আসবে আমার মন বলেছে, গেয়ে উঠল গানের কলিটা। অবশ্য অঙ্ক কষেও প্রমাণ করতে পারতাম—এ পবিত্র গাঙ্গুলী না হয়ে যায় না। যদিও অঙ্কে আমি বরাবরই নিরেট।

অঙ্ক কষে পবিত্র গাঙ্গুলী, মানে ? ঔৎসুক্য জাগল আমার।

মানে, আমাকে এই বিরাট কলকাতার শহরে চেনে মাত্র চারজন লোক, আর তাঁদের মধ্যে তিন জনকে ইতিমধ্যেই আমি চোখে দেখেছি, অতএব চতুর্থ জন আমার না-দেখা প্রিয়া পবিত্র গাঙ্গুলী না হয়ে যায় না।

কবে এলে কলকাতায় ? আমি জিজ্ঞাসা করলাম। আর ক-দিন থাকবে ?

এসেছি কাল, থাকব যে-ক-দিন তোমরা রাখ।

আমরা রাখি, মানে ?

সে অনেক গল্প দাদা, এক দিনেই দুবার বাসা বদল হয়ে গেছে।

ব্যাপারটা সব বলবে না ? আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

বসো তা হলে, বললে নজরুল। জাঁকিয়ে আড্ডা দিতে হলে রসদ চাই। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আসছি, বলেই চটি পরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আমি চুপচাপ বসে মানুষটির কথা ভাবতে লাগলাম। কোথায় যেন একটা অসামঞ্জস্য আছে। এ আগুন, না, মাটি ? ডগডগে লাল জবাফুল, না, চিকন শ্যামল নব দূর্বা ? দু-ই বোধ হয় একসঙ্গে মিলে গেছে, মিশে গেছে একেবারে। তা নইলে পল্টনের শিবিরে বসে কেউ হাফেজের অনুবাদ করে, তাও জুঁইয়ের গন্ধে ভরা !

একটু পরেই ফিরে এল নজরুল, এক হাতে চায়ের কেটলি ঝুলছে, আর এক হাতে সিঙাড়ার ঠোঙা, কলা পাতায় মোড়া একগাদা পান।

কি হে তুমি যে ফিস্টি বসাচ্ছ দেখছি, আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

বসাব না কেন ? হেসে বললে নজরুল। বাঙালীর ছেলে, বহুদিন বাদে বন্ধুমিলন হলে খেয়ে দেয়ে উৎসব করবে না ত কি ? চা, সিঙারা, পান—মজলিস করবার তিন প্রধান রেস্ত।

টেবিল থেকে কাঁচের গেলাস এনে নিজ হাতেই চা ঢেলে দিলে। তক্তপোশের উপর একটা কাগজ পেতে ঢাললে সিঙাড়াগুলি।

চায়ে চুমুক দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, করাচী থেকে সোজা আসছ কলকাতায় ?

না দাদা, বাড়ীতে দু-দিন থেকে এসেছি। লেটুর গান লিখে ত আর দিন চলবে না, লেখাপড়াও শিখিনি যে, চাকরি খুঁজব। কাজেই বন্ধু-বান্ধব ভরসা। তবে ভয় হয়, তাদের ভরা ডুবি না করি।

তাদের ভরা ডুবি করবে কেন ? আমি প্রশ্ন করলাম।

আমি করব কেন ? বললে নজরুল, আমার বোঝায় নদীই যে গর্জে উঠেছে। শৈলজাকে ত মেস-ছাড়া হতে হল।

শৈলজা কে ? আর সে মেস-ছাড়লই বা কেন ?

তা হলে, শোন সব গল্প : ইস্কুল জীবনের বন্ধুদের মধ্যে তার সঙ্গেই মন মজেছিল, অথচ এক স্কুলে পড়তাম না, শুধু এক ক্লাশে।

তা হলে পরিচয় হল কি করে ?

আরে, রানীগঞ্জ শহর, সে ত আর তোমার কলকাতার মত মানুষের কারখানা নয়, ছোট্ট জায়গা, সবাই সবাইকে চিনে ফেলে। তা ছাড়া, থাকতাম পাশাপাশি, আমি হস্টেলে, আর ও থাকত দাদামশায়ের বাড়ী।

শৈলজা এখন কি করে ?

শর্টহ্যাণ্ড টাইপরাইটিং শেখে বাগবাজার কাশিমবাজার পলিটেকনিক ইস্কুলে। কিন্তু কিচ্ছু হবে না।

তাও তুমি এর মধ্যে বুঝে ফেলেছ ? আমি বললাম।

বুঝব না, যে ছেলে খালি প্রেমের কবিতা লেখে, কল টিপে ইংরেজি হরফ সাজানোর কাজে তার হাত পাকতে পারে কখনো ?

প্রেমের কবিতা লেখে ? তা হলে ত তার সঙ্গে আমার আলাপ করতে হচ্ছে।

সবুর কর, সেও এখানে আসবে একটু বাদেই।

তাকে মেস-ছাড়া করলে কিরকম, সে কথা ত বললে না !

আগে থেকেই কথা ছিল, শৈলজার মেসে এসে উঠব। হাওড়া স্টেশন থেকে শৈলজা সঙ্গে করে নিয়ে এল বাদুড় বাগানের মেসে। সেখানে আমার অট্টহাসি আর উৎকট গানে এমনিতেই ত বাসিন্দারা একবেলাতেই ক্ষেপে আগুন হয়ে

গেছে, তার পর যখন শৈলজা 'নুরু নুরু' বলে ডাকছে আমায়, তারা আমার নাড়ীনক্ষত্রের খোঁজ নিতে শুরু করে দিল। দুপুর বেলা ত এক পংক্তিতে খেয়ে ওদের জাত মেরে দিলাম, তারপর যখন ওরা আবিষ্কার করল আমি মুসলমান, তখন ওদের মেজাজ যা হল, তা ত বুঝতেই পার। দল বেঁধে ঘর চড়াও হল, রুচিবোধের সীমা ছাড়িয়ে কোরাস-কণ্ঠে বলে উঠল, আপনি মশায়, মুখুজ্যে বামুনের ছেলে হয়ে লেড়ের কাছে বোন দিতে পারেন, আমরা কিছু বলব না, কিন্তু জেনে শুনে আপনি আমাদের জাতধর্ম নষ্ট করছেন, এর জন্য আপনাকে কি করা উচিত জানেন?

নির্বিকারভাবে শৈলজা জবাব করলে, না।

আপনি বেরিয়ে যাবেন কি-না এই মুহূর্তে মেস থেকে, ঘুঁষি পাকিয়ে দাবি জানাল মেসের বাসিন্দারা।

তা হলেই কি আপনারা খুশি হন? গম্ভীর ভাবে প্রশ্ন করল শৈলজা।

খুশি কি? যেতেই হবে আপনাকে, আর তা এই মুহূর্তেই।

জিনিসপত্র গুছিয়ে নেবার সময়টুকু দেবেন ত? কিছুই যেন হয়নি— শৈলজার কথার সুরে এমনি ভাব।

রিক্সা চড়ে যখন বাক্স-বিছানা নিয়ে দুজনে বেরিয়ে পড়লাম, তখন পর্যন্ত আমাদের গন্তব্য স্থান ঠিক নেই।

কোথায় যাচ্ছি? আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

চল্, এক জায়গায় ভিড়ে যাব।

আমি বুঝতে পারলাম, নজরুল বলে চলে, আমাকে নিয়ে শৈলজার মুশ্‌কিল আছে। তাই আমি চলে এলাম এখানে, শৈলজা গেল তার দাদা-মশায়ের বাড়ী। তবে মেসের বাবুরা যেরকম চটেছে, তাতে দাদামশায়কে দিয়ে ওকে একঘরে করবার চেষ্টা করলেও আমি আশ্চর্য হব না।

এখানে ত কারুর জাত মারবার আর ভয় নেই, আমি বললাম। স্থির হয়ে থাকতে পারবে দিন কয়েক।

হ্যাঁ, মুজফ্‌ফর সাহেবের উপর যে কয়দিন চালানো যায়।

এমন সময় কোঁকড়ানো বাবরি চুল, গোঁফ-ওঠা, পাঞ্জাবি গায়ে একটি ছেলে এসে ঘরে ঢুকল।

এই শৈলজা, নজরুল পরিচয় করিয়ে দিলে আমাকে। আর এই পবিত্র গাঙ্গুলী।

মানে, যিনি 'প্রবাসী'তে তোর কবিতা ছাপিয়ে দিয়েছিলেন? মন্তব্য করলে শৈলজা।

মানে তিনি, আমি বললাম, যিনি 'সবুজপত্র'-এর সহকারী হয়েও একটা ভাল কবিতা সেখানে ছাপাতে পারেন না।

সাহিত্যের একটা আভিজাত্য আছে দাদা, বললে, শৈলজা। সেটাকে চ্যাংড়াদের হাতে নষ্ট করতে দেওয়া যেতে পারে না।

আপনিও ত কবিতা লেখেন? শৈলজাকে প্রশ্ন করলাম। বলছিল নজরুল, তাও নাকি প্রেমের কবিতা।

তাই ত সবাই ধরে নিয়েছে কিচ্ছু হবে না তোর, বললে নজরুল। আমি ত নিশ্চিন্ত।

না-ই বা হোল রে ভাই, কি হবে আর কি হচ্ছে না-হচ্ছে, তাই নিয়ে মাথা ঘামাই না। তার চেয়ে নুরু, একটা গান গা না।

বলতে দেরি সইল না, হারমোনিয়াম টেনে নিয়ে নজরুল শুরু করে দিলে:

'দারুণ অগ্নি বাণেরে, হৃদয় তৃষায় হানে—'

ঘর কাঁপিয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে সর্বাঙ্গ দুলিয়ে গেয়ে চলল নজরুল। প্রতিটি কথা স্পষ্ট, জোর করে উচ্চারণ করছে—যেন সুরের তলায় কথা চাপা না পড়ে। কিন্তু সব শেষ যখন গাইছে: 'ভয় নাহি ভয় নাহি!' তখন স্বর উঠেছে সপ্তমে, সকল ভয় যেন অপসারিত করতে চাইছে সব দিক থেকে। শুধু খর চৈত্রের অগ্নিবাণের ভয় বিদূরণ করতে কেউ অতখানি উদাত্ত হয়ে উঠতে পারে না। তার সেই স্বর এবং উচ্চারণের মধ্যে সর্বযুগের সর্বভয়হরা আশ্বাসবাণী মূর্ত হয়ে উঠেছে, সবাইকে ডেকে বলছে, মাভৈঃ।

'কমলালয়া-এ যখন ছিলাম তখন রবিবার ছিল আমার বাইরে যাওয়ার দিন, আর এখন মেসে থেকে 'সবুজপত্র'-এর কাজে সাহেবের সঙ্গে সংযোগ রাখবার জন্য রবিবার সকালটা 'কমলালয়ে'-এই হাজিরা দিই।

একদিন সকালে গোটা দশ নাগাদ যথানিয়মে 'কমলালয়'-এ এসেছি। চৌধুরী মহাশয়ের বসবার ঘরে ঢুকেই দেখতে পেলাম একজন গৈরিকবাস ভদ্রলোক বসে গল্প করছেন। কদমফুলী মাথা, মুখে গোঁফ-দাড়ির লেশমাত্র নেই। গেরুয়া লুঙ্গির

উপর মটকার পাঞ্জাবি, পায়েও রং মিলিয়ে ব্রাউন য়্যালবার্ট জুতো। হাতে-পাকানো সিগারেট টানছেন আর গল্প করছেন।

আমি কাছে গিয়ে পৌঁছতেই চৌধুরী মহাশয় বললেন, তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই পবিত্র, আমার অনেক কাজে আসবে।

আমি সাগ্রহে তাঁর দিকে ফিরে দাড়ালাম। চৌধুরী মহাশয় বললেন, ইনি ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথ। লোকে অবশ্য এঁকে গণেন মহারাজ বলেই জানে। 'উদ্বোধন'-এর ম্যানেজার ইনি।

আমি হাত তুলে নমস্কার করলাম। মহারাজ একবার আমার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে চৌধুরী মহাশয়ের দিকে চোখ ফেরালেন, ইনি?

ইনি—পবিত্র, পবিত্র গাঙ্গুলী, আমার 'সবুজপত্র'-এর কাজ দেখাশুনা করেন, ম্যানেজারই বলতে পারেন।

ভালই হল, বললেন মহারাজ। ম্যানেজারে ম্যানেজারে স্যাঙাতির সম্পর্ক পাতানো যাবে। জানেন, আপনার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ আমি খুঁজছিলাম।

আমার সঙ্গে! বিস্ময়ের পার পেলাম না আমি।

আপনি পবিত্রকে চিনতেন নাকি? বললেন চৌধুরী মহাশয়।

কান্তি ঘোষ আমায় বলেছে ওর কথা, মহারাজ জবাব দিলেন। আপনি মশায়, কুনো কান্তির কবিতা বার করে নিয়ে এসেছিলেন, তারপর একেবারে দেশময় ছড়িয়ে দিয়েছেন। কান্তি ঘোষের কুনোত্ব ঘোচানো যে কত বড় কঠিন কাজ, তা আমি জানি। নিজে ত চেষ্টা ছেড়েই দিয়েছিলাম।

তা হলে কান্তিবাবু আমার উপর খুব অসন্তুষ্ট আছেন বলুন। আমি প্রশ্ন করলাম।

অসন্তুষ্ট আছেন বই-কি, হেসে বললেন চৌধুরী মহাশয়। তার একক মনোবিলাসের জন্য রচিত কবিতা তুমি সবার বিলাস-সামগ্রীতে পরিণত করেছ!

মানবচরিত্র আপনি ত খুব ভালই জানেন, বললেন মহারাজ। হয়ত পবিত্রবাবুর উপর কান্তির রাগের কারণ থাকতেও পারে, কিন্তু আমি যা বুঝেছি, তা ত পরিপূর্ণ অনুরাগ, নইলে কারুর প্রশংসায় অমন দরাজ হতে কান্তি ঘোষকে ত কোন দিন দেখিনি।

ও, তোমরা ত তা হলে পরস্পরকে সার্টিফিকেট দেওয়া শুরু করে দিয়েছ দেখছি, বললেন চৌধুরী মহাশয়।

আমার সার্টিফিকেট কে-ই বা নেয়, আর কে-ই বা তার দাম দেয়, আমি বললাম। তবে কান্তিবাবু যদি মহারাজের কাছে আমার সম্বন্ধে কোন সপ্রশংস উক্তি করে থাকেন, তা আসল হোক, নকল হোক, আর সত্য-মিথ্যা যা-ই হোক, আমার কাছে তার মূল্য অনেক।

আপনি তা হলে মিথ্যা স্তোকভাষণ শুনতে ভালোবাসেন দেখছি, হেসে বললেন মহারাজ।

বীরবলের সাহচর্যে কাটা কথায় অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া উচিত ছিল, এই আপনার মত না কি। সিগারেটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন সাহেব।

আপনি ওকে কাটা কাটা কথা বলেন, এ আমি বিশ্বাস করতে রাজী নই, মহারাজ বললেন।

শুধু ওকে বলব কেন, বলে চললেন চৌধুরী মহাশয়, দুনিয়া শুদ্ধ সবাইকে বলি। আর সেই বলার বাহন ও আমার মধ্যে যোগসূত্র-স্থাপনের ভার ত পবিত্রর।

জীবনে লোকের প্রশংসা পাওয়ার মত কতটুকু কি আমরা করতে পারি, তা সত্ত্বেও যেটুকু পাই, তা কি একেবারে উপরি পাওনা নয়? আমি জবাব দিলাম।

হবে হবে, আপনাকে দিয়েই হবে, বলে উঠলেন মহারাজ। এই লাভালাভৌ সমভাব না থাকলে সংসারে কেউ কিছু করতে পারে না। খালি জ্বলে মরে, আর পাঁচজনকে জ্বালায়।

লাভের যোগ্যতা যার থাকে না, আমি বললাম, তার সমভাব না হয়ে উপায় কি আছে বলুন!

দেখুন, আপনার ওই কথাটি মানতে পারলাম না। আমরা যে যত ছোটই হই না কেন, নিজের সম্বন্ধে কিছুটা অভিমান সকলেরই থাকে। আত্মাভিমানই ত সংসার। যার আত্মাভিমান নেই সে ত মুক্ত পুরুষ। আমিই কি ছাড়তে পেরেছি আত্মাভিমান, অথচ মুক্তির সন্ধান করছি—এই ভ্যানিটি-টুকুন আছে।

চৌধুরী মহাশয় বললেন, তত্ত্বজ্ঞানী যাঁরা তাঁরা বলেন এই চাকায় ঘুরেই মানুষ ইহ সংসারে 'করমবিপাকে গতায়তি পুন পুন' করছেন। মুক্তির সন্ধানে আত্মাভিমান ছাড়তে হবে, অথচ মুক্তির সন্ধান করছি—এটাও ত একটা আত্মাভিমান।

মহারাজ বললেন, সেইজন্যই আত্মাভিমান ত্যাগ করাই সাধনা, মুক্তির দেখা তারপরে মেলে—ভাল কথা। 'মুক্তি চাই'—'মুক্তি চাই' করে হৈ হৈ করলে মুক্তি কোন দিনই আসবে না, আসে না। রাজনীতিতেও ওই একই পদ্ধতি খাটে বলে আমার বিশ্বাস।

আমারও বিশ্বাস, বললেন সাহেব, এই যে রাজনৈতিক আন্দোলন, 'স্বরাজ দাও' 'স্বরাজ দাও' বলে গলা ফাটিয়ে চীৎকারের ফলে স্বরাজ কোন দিন আসে না, আসবে না। মুক্ত স্বাধীন হওয়ার মত যোগ্যতা অর্জনের সাধনা কই! যোগ্যতা যদি আসে, জাতির মুক্তি আপনা থেকেই আসবে।

মহারাজ ভাগ্য মানেন কি-না জানি না, আমি বললাম, সাধনা, আত্মাভিমান, মুক্তি—এই সব কথার অর্থও কোন দিন ভেবে দেখবার চেষ্টা করিনি—ভাববার যোগ্যতা নেই বলেই হয়ত। আমি যেটুকু যা পাচ্ছি, তা ভাগ্যের জোরে।

ভাগ্যকে একেবারে উড়িয়ে দেবো এতখানি পুরুষকার আমার নেই, বললেন মহারাজ, তবুও ভাগ্য কিছুটা চরিত্রানুসারী বলেই আমার বিশ্বাস।

আর চরিত্র? জিজ্ঞাসা করলেন চৌধুরী মহাশয়, তা কাকে অনুসরণ করে? জন্মায়ত্ত বা শিক্ষায়ত্ত ত সব সময় হয় না।

এ রহস্য আজো আমার কাছে দুর্জ্ঞেয়, বললেন মহারাজ, জ্যোতিষেরা হয়ত বলবেন, জন্ম সময়ে গ্রহনক্ষত্রের সমাবেশ, কিন্তু ভূ-ভারতে একই সময় মাত্র একজনই জন্মগ্রহণ করে না। অথচ চরিত্রের পরিপূর্ণ মিল ক'টা দেখতে পাই?

মহারাজের পত্রিকা কিন্তু আমি নিয়মিত পাচ্ছি না, অনুযোগ করলেন চৌধুরী মশায়।

সেটা হয়ত আমার চারিত্রিক ত্রুটি, মহারাজ হেসে মন্তব্য করলেন।

আপনাদের চরিত্রতত্ত্ব ভাগ্যতত্ত্ব ও আত্মতত্ত্বের ভারে আমি ত হাঁপিয়ে উঠেছি, vanity of vanities, all is vanity. তার চেয়ে cultivate your garden—এই হল আমার নীতি।

অর্থাৎ মিষ্টিকথার খই ছড়াবেন, ভাল ভাল সাহিত্য রচনা ও পরিবেশন করবেন—এই ত?

মন্দ কি! দিনগুলো মিঠে ভাবে কেটে যাবে, বললেন সাহেব।

কিন্তু ফুলের বাগান করতে ওস্তাদ মালি চাই, আমরা বড় জোর পাট ফলাতে পারি। মনে তা নেশা ধরাতে না পারলেও কাজে লাগবে প্রচুর।

তা ছাড়া, আপনি যে সহকারীটি পেয়েছেন সে খালি তাকে তাকে ঘুরছে কোথায় ভাল ফুলের বীজ যত্ন করে কে তুলে রেখেছে, কোথায় কার বাগানে দুর্লভ চারা ধরেছে—সব চুঁড়ে এনে হাজির করবে।

চৌধুরী মহাশয় বললেন, আমার ত একটি লোক, তাতেই আপনি ঈর্ষা করছেন, আর আপনার সঙ্কেতে বিরাট সংগঠনে কত লোক এগিয়ে আসে কাজ করতে।

মহারাজ জবাবে বললেন, তবু সব সময় সব কাজ সকলকে দিয়ে হয় না। উনি অবশ্য ফুল বাগানের সহকারী, আমার পাটক্ষেতের কাজে লাগবেন না। কিন্তু আলাপ যখন হল, তখন সুযোগ পেলে কি আর কাজ আদায় না করে ছেড়ে দেবো! ও বিষয়ে আমি বড় ছিনেজোঁক মশায়, যদি কাউকে ধরি, আমার কাছ থেকে ছাড়িয়ে যাওয়া তার শক্ত।

ধরাধরির দরকার নেই ত কিছু, আমি বললাম, আপনার কোন কাজে লাগতে পারি, সে ত আমার ভাগ্যের কথা। আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে যাব।

আসবেন 'উদ্বোধন'-এ, আর বিকেলের দিকে যদি হয়, পরানবাবুর ছাপাখানায় কলেজ স্কোয়ারে আসবেন। ওটাই ত আমার বিকেলের আড্ডা।

পরানবাবুর ছাপাখানা? জিজ্ঞেস করলেন চৌধুরী মহাশয়।

'শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস,' বললেন মহারাজ, আপনি জানেন না পরানবাবুকে? চমৎকার ছেলে। যেমন কাজে তাঁর নিষ্ঠা, আর তেমনি ছাপাখানার কাজের সব দিক্ বুঝে ফেলেন চকিতে। এবিষয়ে একটা আদর্শবাদ দেখতে পেয়েছি আমি তার মধ্যে।

সে ছাপাখানায় আপনার সংযোগ রয়েছে নাকি? জিজ্ঞেস করলেন চৌধুরী মহাশয়।

সংযোগ আবার কি! আমি জানি তিনি একদিন বড় হবেনই। কাজেই তাঁর মধ্যে যদি নিমিত্তমাত্র হয়ে থাকতে পারি মন্দ কি! তাই 'উদ্বোধন'-এর সব ছাপার কাজ আমি সেখানে দিয়েছি। এমন ভাল ছাপা সচরাচর পেতাম না কোথাও। আমার কাজ পাওয়ার পরেই গ্রে ষ্ট্রীটের ছোট্ট ঘরটি ছেড়ে তিনি কলেজ স্কোয়ারে উঠিয়ে এনেছেন ছাপাখানা।

আপনি কি সেখানে আপনার বই ছাপার কাজ তদারক করেন? আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

আরে না, সে সব কিছু করতে হয় না। সুরেশ মজুমদারের ছাপাখানা—

সে আবার কে? প্রশ্ন করলেন চৌধুরী মহাশয়।

পরান সুরেশবাবুরই ডাক নাম। তবে আমাদের কাছে তিনি পরানই রয়ে গেছেন। সেখানে কাজ পাঠিয়ে আমি নিশ্চিন্ত, কিছু দেখতে হয় না। তবুও সেরেফ আড্ডার মোহে গিয়ে থাকি, না গিয়ে পারি না।

আপনার উপলক্ষ্যে অত ভাল ছাপাখানার সঙ্গে এবং তার গুণী মালিকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েও যেতে পারে, আমি বললাম।

নিঃসন্দেহে, বললেন মহারাজ, অসংকোচে চলে আসবেন।

ততক্ষণ মহারাজ উঠে পড়েছেন। আমি দরজা পর্যন্ত তাঁকে এগিয়ে দিয়ে চৌধুরী মহাশয়ের কাছে ফিরে এলাম।

আকাশে মেঘ করেছিল, বেলা নটা নাগাদ ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি নেমে পড়ল। বাঁচলাম। ক'দিন যে গরম পড়েছিল, একটু হাঁপ ছেড়ে বাঁচা গেল। এই স্বস্তির মনোভাবটা আচমকা মুখ থেকে বেরিয়ে যেতেই ধম্‌কে উঠলেন প্রৌঢ় হরেন চাটুজ্যে। বাবুর ঠাণ্ডা চাই বলেই কি আমাদের সবাইকে ভিজতে হবে না কি? দুপুরে বৃষ্টি হলেই ত সব ল্যাঠা চুকে যায়।

আমি এর প্রতিবাদ করলাম না। সত্যিই ত, সবারই যে ছাতা আছে, তাই নয়। আর ছাতা থাকলেই বা কি? জোরে বৃষ্টি হলে ছাতায় কতটুকু মানে! তা ছাড়া, কলকাতার রাস্তা, একবার বৃষ্টি হয়ে গেলে ছ'ঘণ্টা জল আটকে থাকবে এ-খাদে ও-খাদে, রাস্তা শুকিয়ে গিয়েও রেহাই নেই আর এই মোটরগাড়িওআলারা—তারা দেখে শুনে ওই জলকাদা ভরা খাদের ওপর দিয়েই চালিয়ে দেবে চাকা। পায়ে হাঁটা লোকগুলোর গায়ে কাদা ছিটিয়েই যেন ওদের আনন্দ।

তবুও আপিস ত কারুর না গেলে চলে না। তাই এক এক করে সবাই চলে গেল। বাকী রইল শুধু শখের আপিস-করিয়ে পবিত্র গাঙ্গুলী।

বৃষ্টির জোর অবশ্য কমে গেছে। ছাতা না থাকা সত্ত্বেও আপিসে যে পৌঁছানো যেত না, তা নয় তবুও মেঘলা আকাশ, দম্‌কা ভিজে হাওয়া, মাঝে মাঝে বৃষ্টির ঝটকা—সব কিছু যেন আমাকে বলছিল: কেন মিছে ছুটে মরবি! তাই খাওয়া দাওয়া সেরে চাদরটা গায়ে টেনে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লাম।

বিকেলের দিকে আকাশ তখনো পরিষ্কার হয়নি। বৃষ্টির আমেজও কাটে

নি, রাস্তাও যায়নি শুকিয়ে। কিন্তু তাই বলে সারাদিন মেসের চৌকিতে শিকড় গেড়ে থাকা—তাও কি সম্ভব!

অতএব গুটি গুটি বেরিয়ে পড়লাম, যে-কোনখানে হোক, আড্ডায় জমে যাব—এই আশা নিয়ে। ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়। ফরডাইস লেনেই দেখা, বৃদ্ধ পাঁচকড়িদা চলেছেন মোটা লাঠিটা ঠক্ ঠক্ করে আপন মনে। আমিই এগিয়ে গিয়ে পায়ের ধুলো নিলাম। উঠে দাঁড়াতেই আমার হাত-খানা ধরে ফেললেন।

ভায়ার ত দেখছি ভক্তি আছে, কিন্তু গা ঢাকা দিয়ে থাক কেন? টিকিটি ত দেখবার যো নেই।

টিকি নেই, দেখবেন কোত্থেকে? আমি হেসে বললাম।

ফাজলামি করিস না, ধমক দিলেন পাঁচুদা। সেই যে একদিন 'নায়ক' থেকে পালিয়ে এলি আবার আসব বলে, ছ মাসের মধ্যে পাত্তা নেই!

বাঃ, আপনি ব্যস্ত ছিলেন সেদিন। তখনই সম্পাদকীয় লিখে প্রেসে পাঠাতে হবে, আমি তখন চলে আসব না ত কি আপনাকে বকাব!

তাই বলে তার পরে আর আসতে নেই? থাকিস কোথায়? শুনলাম, চৌধুরী বাড়ী নাকি ছেড়ে দিয়েছিস?

হ্যাঁ, এখানে একটা মেসে থাকি। অবশ্য 'সবুজপত্র'-এর কাজ ছাড়ি নি।

কথা কইতে কইতে টুক্ টুক্ করে 'বাঙ্গালী' আপিসের দরজায় এসে পৌঁছে গেছি। পাঁচুদা বললেন, চল্, ওপরে চল্।

আপনার সঙ্গে আর যাব না? দুধ-জিলিপির লোভ কি ছাড়া যায়!

সে ভায়া এখানে হবে না, সকালে 'নায়ক'-এ এসো, ওটা আমার সকালের পথ্য। তারই ভাগ দিতে পারি। আর এটা ত আমার আপিস—গৌণত।

কেন? আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

আপিসটা 'বেঙ্গলী' সে খবর ত জানিস্। 'বাঙ্গালী' ত বড়লোক আত্মীয়ের সংসারে অনাথ ছেলের মত বেচারা। 'বেঙ্গলী'র মালিক শচীন মুখুজ্যের সঙ্গে তোর আলাপ করিয়ে দি, আয়।

তিনিই মালিক বুঝি? আমি প্রশ্ন করলাম।

আরে মালিক মানে কি? সুরেন বাঁড়ুজ্যে ত আর আপিস করেন না। শচীনই কাগজ চালায় বলতে পারিস।

দোতলায় একটা বড় হল ঘরে এসে আমায় নিয়ে ঢুকলেন পাঁচুদা।

সামনের দিকে মুখ করে বিরাট এক সেক্রেটারিয়েট টেবিলে যে ভদ্রলোক বসেছিলেন তাঁর সামনে গিয়ে হাজির হলেন।

কি খবর পাঁচুদা? মুখ তুললেন ভদ্রলোক।

এক হতভাগাকে ধরে নিয়ে এসেছি তোমার কাছে, শচীন।

খুব সুখের কথা। বসুন। সহাস্য অভ্যর্থনা জানিয়ে শচীনবাবু চেয়ারের দিকে নির্দেশ করলেন। পাঁচুদা দাঁড়িয়ে থাকতে আমার বসা মানায় না, তাই দাঁড়িয়েই রইলাম আমি।

এ বড় ঢুঁদে ছেলে, প্রমথ চৌধুরীর বাড়ীতে থাকত, 'সবুজপত্র'-এর কাজ দেখাশুনা করে। হাওড়া-সাহিত্য-সম্মিলনীতে যত কলকাঠি নড়েছিল তার মধ্যে এর হাত ছিল অনেকখানি।

হো হো করে হেসে উঠলেন শচীনবাবু, বললেন, আপনি বয়সে নবীন হলেও কাজে পাকা বলেই বোধ হচ্ছে। পাঁচুদার দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন যে?

পবিত্রকে তোমার কাছে বসিয়ে দিয়ে আমি এবার আমার কাজে যাই। বসো পবিত্র, বলেই পাঁচুদা চাদরখানা ঠিক করে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। ডাক শুনতে পেলাম, ওরে গোবিন্দ, তামাক দে।

শচীনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার নাম বুঝি পবিত্রবাবু?

আজ্ঞে হ্যাঁ, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়।

আপনি ত সাহিত্য করেন, রাজনীতির ধার ধারেন না, হেসে বললেন শচীনবাবু। আর আমাদের ত রাজনীতি নিয়েই কারবার। নরম দল, গরম দল, আরো উষ্ণ শীতল—যত রকম দল আছে, তাদের বক্তৃতা, বিবৃতি, মতামত—এই সব নিয়ে নিত্য ঘাঁটাঘাঁটি করতে হয় আমাদের। আপনি সুখে আছেন। গল্প, কবিতা, মিঠে আলোচনা তত্ত্ব, পাণ্ডিত্য—এই সব নিয়েই আপনার কারবার। আর আমরা ত কাদায় খাবি খাচ্ছি। কথা শেষ করেই আবার হো হো করে হেসে উঠলেন শচীনবাবু।

আমার পেশা বর্তমানে এক সাহিত্য পত্রিকার ছাপার কাজ তদারক করা, আমি বললাম, তা বলে আজকের দিনের বাঙালী ছেলে রাজনীতির প্রভাব থেকে একেবারে মুক্ত থাকতে পারে কি?

আপনি ত প্রমথ চৌধুরীর বাড়ী থাকেন শুনলাম, সেখানে কি রাজনীতির প্রবেশ আছে?

থাকি না, থাকতাম। বর্তমানে মেসে থাকি। তবে রাজনীতি চৌধুরী বাড়ীতে নেই তা নয়; তবে সেখানকার নিজস্ব রূপ হয়ত বাইরের সাধারণ রূপ থেকে একেবারেই অন্য রকম। তা ছাড়া, আমি ত বাইরেও বেরুতাম।

ভাল কথা, বললেন শচীনবাবু, আমরা অন্য ধরনের রাজনীতির লোক বলে কি 'সবুজপত্র' পড়বার যোগ্য নই? সব কথার শেষেই তাঁর প্রাণ-খোলা হাসিটুকু লেগে আছে।

একটি বেয়ারাস্থানীয় যুবক চায়ের কাপ হাতে নিয়ে হাজির হতেই মুখুজ্যে মশায় আমার দিকে দেখিয়ে দিলেন, ওখানে দাও।

আপনি? আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

আমার আসছে ব্যস্ত হচ্ছেন কেন?

'সবুজপত্র'-এ আছেন কতদিন? শচীনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন।

বছরখানেক হল।

তারও আগের খবর জানতে চাওয়াটা খুব অন্যায় হবে কি?

আগে না করেছি এমন কাজ নেই। উকিলের মুহুরিগিরি, স্কুল মাস্টারি —সব ঘাটের জল খেতে খেতে 'সবুজপত্র'-এর ঘাটে এসে ভিড়েছি, সেখানেই বা কদিন থাকব, তাও কি আমি জানি!

আপনি ত নানা রসের রসিক দেখছি। বিক্রমপুরে বাড়ী বোধ হয়।

আপনি কেমন করে ধরে নিলেন বুঝতে পারছি না ত।

বিক্রমপুরের ছেলে সম্বন্ধে আমাদের একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেছে।

সেটা কি?

তারা বোমাও ছোড়ে, গানও গায়, যাত্রা করে, আবার ক্রিকেটও খেলে। হাসিতে ফেটে পড়লেন শচীনবাবু!

এর জবাবে আমার কিছু বলবার ছিল না, তাই চুপ করে রইলাম।

আবার বললেন শচীনবাবু, মাঝে মাঝে চৌধুরী মহাশয়ের লেখা কিছু কিছু পড়তে ইচ্ছা হয়, হাতের কাছে পাই না বলেই হয়ে ওঠে না।

আমি আপনার জন্য এনে দেবো, আর 'সবুজপত্র' নিয়মিত যাতে পান সে ব্যবস্থাও করব। এই ঠিকানায়ই পাঠাব ত? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

ও কাজটি করবেন না। খবরের কাগজের আপিস একেবারে no-man's land, যদি পাঠান বাড়ীর ঠিকানায়ই পাঠাবেন। লিখে দি। ঠিকানা লিখে কাগজখানা আমার হাতে দিলেন।

'কমলালয়'. থেকে বেরিয়ে এসে যে বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে মেলামেশার স্বপ্ন দেখেছিলাম, ক্রমে ক্রমে তা সার্থকতার পথে এগিয়ে চলেছে। এই কথাই ভাবছিলাম মাদুরে শুয়ে শুয়ে। হঠাৎ মনে পড়ল, সাক্ষাতের অনেক পূর্বেই যাঁদের আমি আমার মুরুব্বি ঠাউরেছিলাম, তাঁদের মধ্যে সুরেশ সমাজপতি অন্যতম। বস্তুত, সাহিত্যনীতির দিক দিয়ে তখনকার প্রাচীন ও নবীন দলের যতই মতবিরোধ থাক না কেন, সুরেশ সমাজপতি যাঁর মুরব্বি নন, এমন সাহিত্যিক সে যুগে বাংলায় ছিল কি না সন্দেহ। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র পর্যন্ত তাঁর শ্যামপুকুর রামধন মিত্র লেনের বাসাবাড়ীতে, যাতায়াত করেছেন। আর আমি একদিন 'সাহিত্য'-এ লিখেছিলাম, অন্তত সেই সুবাদে সমাজপতি মহাশয়ের স্নেহচ্ছায়ায় আশ্রয় সন্ধান করতে পারি। তবু কেন এতদিন নির্বিকার হয়ে বসে আছি, ভেবে পেলাম না। অথচ এত কাছে তিনি, এই ত 'বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির' আমার মেস থেকে হাঁক দিলে শোনা যায়।

তাঁর কাছে যাব স্থির করলাম, তবুও একা একা যেতে কেমন কিন্তু লাগে। কাছাকাছি এসে ঢুকে পড়লাম 'বেঙ্গলী' আপিসে। সোজা এসে হাজির হলাম পাঁচুদার ঘরে। পাঁচুদা তখন টেবিলে পা তুলে হুঁকো টানছিলেন। বললেন, বোস্।

চেয়ারে বসে পড়ে বললাম, আরজি নিয়ে এসেছি পাঁচুদা।

কি ব্যাপার রে?

সমাজপতি মশায়ের সঙ্গে আলাপ করতে চাই।

বেশ ত, ভাল কথা। চলে যা 'বসুমতী'তে—এই সময় পাবি তাঁকে।

তাঁকে চাক্ষুষ করি নি এখন পর্যন্ত। তা ছাড়া, আমার ধারণা, তিনি খুব রাশভারী লোক। তাই আপনার পরামর্শ চাই।

রাশভারী ত বটেই, বললেন পাঁচুদা। পেটে বিদ্যেও আছে বেশ কিছু। তা ছাড়া, বিদ্যাসাগরের দৌহিত্র, সে রাশভারী হবে না ত হবে কি পাঁচু?

রাশভারী বলতে আপনি কি বোঝাতে চান আমি জানি নে। আপনি রাশভরী না হতে পারেন, কিন্তু বিদ্যায় আপনি ছোট—একথা কেউই মানবে না।

যা-যা, পাকামি করতে হবে না। ও বাড়ীতে যাবি ত এখনি যা, আবার সব সাহিত্যিকদের ভিড় জমবে। ওই কাজই ত করলে সারাজীবন —নতুন লেখকদের ঘষে মেজে মানুষ করবার কাজ। যত নাম করা লেখকই হোন না কেন, কারুর লেখাই বিনা বিচারে পত্রস্থ করেন না সমাজপতি। অথচ ভাল লেখা যেখানে বের হোক, লেখক নির্বিশেষে তার প্রশংসা তিনি করবেনই।

কিন্তু পাঁচুদা, আমি ত লেখক নই, আমাকে গ্রহণ করবেন কি না সেইটেই হল আমার সংশয়।

কিছু ভয় নেই ভাই, প্রমথ চৌধুরী পেরিয়ে এসেছিস, তোকে রোখে কে, কোথায়? তা ছাড়া, সুরেশ জিজ্ঞাসু তরুণদের প্রতি সব সময়েই স্নেহশীল। তুই নিঃসঙ্কোচে চলে যা।

রাস্তার ওপারেই বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির। বর্তমানের জাঁকালো ফটক তখন ছিল না। কাঠের সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে গিয়ে সামনেই চোখে পড়ল পূবে-পশ্চিমে লম্বা বারান্দা জুড়ে বাবুরা কাজ করছেন। তাঁদেরই একজনকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিলাম, সমাজপতি মহাশয় কোথায় বসেন। দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে পড়লাম। মস্তবড় ঘর, দেয়াল জুড়ে র‍্যাকে অজস্র বাঁধানো বই ধূলিমলিন হয়ে রয়েছে। মাঝখানে একটা বড় টেবিলের উপর প্রচুর কাগজপত্র সাজানো। ঘরের মধ্যে আর কেউ নেই। চেয়ারে একাকী বসে আছেন সমাজপতি। ছবি এবং শোনা কথায় যা বর্ণনা পেয়েছিলাম তাতে বুঝতে অসুবিধা হল না। শালপ্রাংশু, দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে বিরাটকায় পুরুষ। সাদা জামার উপর সাদা উড়ানি জড়ানো। মাথায় কদমফুলী চুল গোঁফ-দাড়ি পুরোপুরি কামানো।

ঘরে ঢুকবার সময়ই আমি অনুমতি নিলাম, বললাম, আসতে পারি কি?

নিকেল ফ্রেম চশমার ফাঁক দিয়ে আমাকে একবার দেখে নিয়ে বললেন, নিশ্চয়ই।

আমি সোজা এগিয়ে গিয়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিলাম। আর একবার আমাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে নিয়ে তিনি বললেন, বসুন। আপনার পরিচয়?

কিছুই নেই, আমি বললাম। পল্লীগ্রাম থেকে এসে কলকাতায় কিছু-

দিন আছি। সাহিত্যে অনুরাগ আছে। তাই একবার আপনার পায়ের ধুলো নিতে এলাম।

খুব ভাল কথা, হেসে বললেন সমাজপতি মহাশয়। দেড় ইঞ্চি ব্যাস ও ইঞ্চি চারেক লম্বা টিনের কৌটাটা খুলতেই সুগন্ধে ঘরটা ভরে উঠল। কৌটো থেকে ভরাটিপ্ নস্য নিয়ে বললেন, সাহিত্যে অনুরাগ নিষ্ক্রিয়, না, সক্রিয়, তা জানতে পারলে বোধ হয় আপনাকে চেনা আমার পক্ষে সহজ হবে।

একবার আমার একটি রচনা পত্রস্থ করেছিলেন, তা ছাড়া, কিছুকাল আমি নিয়মিত 'সাহিত্য'-এর গ্রাহক-শ্রেণীভুক্তও ছিলাম।

তা হলে ত আমার না-চেনবার কথা নয়।

আমার নাম পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়।

বসো। এক মিনিট চোখ বুজে ভেবে নিলেন সমাজপতি। 'তোমার বাড়ী বিক্রমপুরে, নয় কি?

আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি ঘাড় নাড়লাম।

হেসে বললেন, গ্যাখো, 'সাহিত্য'-এর ব্যাপারে আমার ভুল হয় না। বিশেষ করে, আমি ত নাম দেখে রচনা প্রকাশ করি না। রচনার জোরে নাম সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু হই। কাজেই নাম ভুল হবার নয়। যা হোক, তোমার বর্তমান পরিস্থিতি বল।

আপনাদের আশীর্বাদে 'সবুজপত্র'-এ প্রুফ দেখা ইত্যাদি কাজের চাকরি পেয়েছি। কাছেই মেসে থাকি।

বাড়ীতে আর কে কে আছেন?

সবাই আছেন—বাবা, মা, ভাই, বোন, স্ত্রী, সন্তান।

ভাল কথা। সাহিত্যের আগ্রহ নিয়ে তুমি যে কলকাতায় সাহিত্য-গোষ্ঠীর মধ্যেই এসে সংযুক্ত হতে পেরেছ, এ আনন্দের সংবাদ। বিশেষ করে, প্রমথবাবুর মত একজন বরেণ্য সাহিত্যিক এবং প্রকৃত শিক্ষিত, অভিজাত ও সজ্জন ব্যক্তির সান্নিধ্যে এসেছ, জীবনে এর মূল্য অনেকখানি।

সে যে কতখানি, তা আমি বলে বোঝাতে পারব না। আপনার কাছে আমি পূর্ব-পরিচয়ের সূত্র ধরে হাজির হলেও কলকাতার সমাজে মূলত আমাকে চৌধুরী মহাশয়ের পরিচয়েই জায়গা করে নিতে হচ্ছে। আর তারই জোরে সকলেই আগ্রহে আমাকে ডেকে নিচ্ছেন।

কলকাতায় তা হলে কিছু আলাপ পরিচয় হয়েছে ইতিমধ্যে।

কিছু কিছু হয়েছে। সবুজপত্র-গোষ্ঠীর বাইরেও সাহিত্য-পরিষদ, এবং সেই সুবাদে শাস্ত্রী মহাশয়, ত্রিবেদী মহাশয়, পাঁচকড়িবাবু, শচীন বাবু এঁদের সকলেরই আশীর্বাদভাজন হয়েছি আমি। ওদিকে ঠাকুর বাড়ীতে অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, সুধীন্দ্রনাথ—এঁদের সকলের সংস্পর্শেই আসবার সৌভাগ্য হয়েছে। এমন কি, শরৎচন্দ্রের সঙ্গেও আলাপ হয়েছে।

তুমি ত ইতিমধ্যে দেখছি দিগ্বিজয় করে নিয়েছ! পূর্ববঙ্গের ছেলেদের এ বিষয়ে প্রশংসার্হ উদ্যোগ। হেসে বললেন, সমাজপতিকে বুঝি সব শেষে মনে পড়ল!

আমি একটু লজ্জিত হলাম। বললাম, ব্যাপারটা ঘটেছে অন্য রকম। অন্যান্য তীর্থদর্শন আমার পাণ্ডাদের সাহায্যেই ঘটেছে আর বদরিকাশ্রমে আসতে হয়েছে একক প্রচেষ্টায়, অনেক সাহস সঞ্চয় করে।

বাঃ, তুমি ত বেশ কথা বলতে পার দেখছি! এটা কি তোমার নিজস্ব শক্তি, না, বাক্‌বিভূষণ প্রমথবাবুর সাহচর্যের ফল! যাক্ এখন কি শুধু অন্যের কপি আর প্রুফ নিয়েই নাড়াচাড়া করছ, না, স্বকীয় রচনাও কিছু চলেছে?

ছেলেবেলায় যা রচনা করেছি তার মধ্যে দ্বিধা ছিল না, এখন পণ্ডিত সমাজের সংস্পর্শে এসে দেখছি যে সাহিত্য-সৃষ্টির প্রস্তুতি ত আমার কিছুই নেই।

বড ভাল কথা বলেছ। কথা কয়টা বলতে বলতে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন সমাজপতি। এই প্রস্তুতিই, সব কিছু, কাজেই সার্থকতার তাই হল পাকা বনিয়াদ। বিশেষ করে সাহিত্যের ক্ষেত্রে, অপঠিতপটুত্বই হয়েছে কাল। বলা নেই, কওয়া নেই, পড়াশুনা নেই, আলাপ-আলোচনা নেই, কাগজ কলম ধরে এক করলেই যদি সাহিত্য-সৃষ্টি হত তা হলে আর ভাবনা ছিল না। তুমি সাধু সংকল্প করেছ পবিত্র। ভাল করে পড়াশুনা কর আর মনীষী সমাজে আলাপ যখন জমিয়ে ফেলেছ, তাঁদের সঙ্গে আলোচনার বহু সুযোগ পাবে। শ্রদ্ধার সঙ্গে সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার কর। দেশ তোমা থেকে লাভবান হবে।

সদিচ্ছা মনে আছে, আমি সবিনয়ে বললাম। কিন্তু মন যেমন চঞ্চল আর ছুটোছুটি করবার যে রকম নেশা, তাতে সদিচ্ছা সত্যি কার্যকরী হবে

কি-না বিধাতাই জানেন। তবে একথা আমি বুঝি, পড়াশুনা করি আর না-ই করি, আপনাদের কাছে যেটুকু সময় কাটাতে পারব তাতেই জীবনের সঞ্চয় বাড়বে।

এমন সময় ঘরে ঢুকলেন এক প্রাচীন ভদ্রলোক, আকারে ছোট-খাটো হলেও শরীরে তেমন ভাঙন ধরে নি।

আসুন তিনকড়িবাবু, বললেন সমাজপতি। আমার দিকে ফিরে বললেন শচীনের সঙ্গে আলাপ হয়েছে বলছিলে না? তাঁরই পিতা।

আমি তাড়াতাড়ি উঠে বৃদ্ধের পদধূলি নিলাম এবং তাঁকে দণ্ডায়মান দেখে নিজে আর আসন গ্রহণ করতে পারলাম না।

সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় কি কি বিষয়ের আলোচনা থাকবে সেই বিষয়ে পরামর্শ করে তিনকড়িবাবু বিদায় নিলেন। আমার দিকে দেখে নিয়ে বললেন, তোমার পরিচয় ত পেলাম না!

আমি যাবার আগে নিশ্চয় আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে যাব।

তিনকড়িবাবু চলে গেলে সমাজপতি মহাশয় বললেন, এই তিনকড়ি-বাবু অতি নিষ্ঠাবান সাংবাদিক। যে কাজের ভার ওঁর উপর থাকে সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ দায়িত্ববোধ নিয়েই কাজ করেন। অথচ প্রতিদিন একবার সম্পাদকের সঙ্গে পরামর্শ করেই চলেন ইনি। কিন্তু জান পবিত্র, পরামর্শ ইনি করেন বলেই করেন, নইলে ওঁর বিচার এবং বিশ্লেষণ নির্ভুল। আমাকে কদাচিৎ নিজের মত ব্যক্ত করতে হয়।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'বসুমতী' সম্পাদনার কাজ করতে 'সাহিত্য'-এর কাজে আপনার নিশ্চয়ই ক্ষতি হয়।

হয় ত হয়, বললেন সমাজপতি, কারণ 'সাহিত্য'-এর জন্য যে সমস্ত লেখা আমার কাছে আসে, সবগুলিই মন দিয়ে পড়তে হয়। নির্বাচনও কঠিন ব্যাপার। আর যেসব রচনার মধ্যে বস্তু আছে অথচ প্রকাশের ত্রুটিতে তা দোষদুষ্ট, সে সব ক্ষেত্রে আমি চেষ্টা করি লেখককে ডেকে তার ত্রুটি বুঝিয়ে দিতে। আমার মনে হয়, এমনি করেই অনেক কাঁচা মাটি থেকে পাকা সাহিত্যিক তৈরি করা যায়। আর 'বসুমতী'র কথা বলছ? —এখানেও ত আমি নিরুপায়। দরকার হলেই আসতে হয়।

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় সম্পাদক ছিলেন না? আমি জিজ্ঞাসা করি।

ছিলেন কি, আজও আছেন, তবে 'অন লিভ', আর সমাজপতি হল অফিশিয়েটিং। একটিপ নস্যি নাকে দিয়ে হালকা সুরে বলেন সমাজপতি, হেমেন্দ্রপ্রসাদের এখন ডাক পড়ে, আজ মেসোপটেমিয়া, কাল ইউরোপ; যুদ্ধক্ষেত্র পরিদর্শনের জন্য বাংলা পত্রিকার সম্পাদককে যখন সসম্মানে আমন্ত্রণ করে নিয়ে যায় ইংরেজ সরকার, তখন তাঁর যাওয়াও বন্ধ করা যায় না, আর 'বসুমতী'কেও চালু রাখতে হয়।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হেমেন্দ্রবাবু কি এখন মেসোপটেমিয়ায়?

না, মেসোপটেমিয়া থেকে ঘুরে এসেছিলেন, ফের গিয়েছেন ফ্রান্স ও বেলজিয়াম অঞ্চলে। 'বসুমতী'র কাজ যখন জাতির কাজ তখন কারো আহ্বানের প্রত্যাশা করে বসে থাকতে পারি না আমি। হেমেন্দ্রপ্রসাদকে বলি, যাও। খোকাকে বলি, নিশ্চিন্ত থাক। আমি এসে চেয়ার দখল করে বসি।

খোকা!

খোকা, মানে সতীশ, উপেন্দ্রবাবুর একমাত্র ছেলে। ও-ই এখন কাজ-কর্ম দেখাশুনা করে। আর 'বসুমতী' ত শুধু সংবাদপত্র নয়, কাজেই দেখা শুনার দায়িত্ব অনেকখানি।

হ্যাঁ, সাহিত্য-প্রতিষ্ঠান হিসেবে 'বসুমতী'র দান অতুলনীয়।

নিশ্চয়ই। ভাবতে পার, গরীব বাঙালী জাতকে সাহিত্যপাঠে আগ্রহান্বিত করবার কাজে সবটুকু কৃতিত্বই ত 'বসুমতী' দাবি করতে পারে। নামমাত্র মূল্যে বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী—এঁরা প্রচার করেছিলেন বলেই না আজ বাংলার জনসাধারণ বঙ্কিম-সাহিত্য-রসাভিজ্ঞ। ওদিকে প্রাচীন ভারতের যা-কিছু জ্ঞানভাণ্ডার—তাও আজ জনসাধারণের সামনে তুলে ধরেছেন এঁরাই। বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ কি, জানি না; জাতির ভবিষ্যৎও আজ অনিশ্চিত। কিন্তু ভবিষ্যতে যা-ই থাক, বাংলা সাহিত্য ও জাতিগঠনে বসুমতী-সাহিত্য-মন্দিরের দান স্মরণীয় হয়েই থাকবে। তাই ত এঁদের প্রয়োজনকে দেশের প্রয়োজন মনে করে বারে বারে ছুটে চলে আসি। সমাজপতি মহাশয় থামলেন। বিস্মিত হয়ে দেখলাম, অমন গাম্ভীর্যপূর্ণ মুখমণ্ডলও আবেগে ছল ছল হয়ে উঠেছে।

বিদায় নেওয়ার জন্য আমি উঠে দাঁড়ালাম।

চললে? বললেন সমাজপতি মহাশয়।

আজ্ঞে হ্যাঁ, বলে আমি পায়ের ধুলো নেওয়ার জন্য কাছে গেলাম। বললাম, মাঝে মাঝে এসে বিরক্ত করব।

সমাজপতি মহাশয় জবাব করলেন, সদর্থে বিরক্ত করবার জন্য আরও অনেকে আমার কাছে আসুক, তা-ই আমি চাই। শুধু সাহিত্যই নয়, শিল্প রাজনীতিও সব নয়, যা-কিছু সমাজের কল্যাণকর তার মধ্যে টেনে আনতে হবে দেশের ছেলেদের। সত্যি, সমাজ-কল্যাণ ছাড়া কোন কিছুর কোন উদ্দেশ্যই থাকতে পারে না। এইটুকু স্মরণ রেখে যা-কর, তাতেই বলতে পারবে : 'যৎকরোমি জগন্মতস্তদেব তব পূজনম্।'

আমি বেরিয়ে যাচ্ছিলাম, সমাজপতি মহাশয় ডেকে বললেন, তিনকড়ি-বাবুর সঙ্গে দেখা করবে বলেছিলে, ওই পাশের ঘরেই আছেন তিনি।

পাশের ঘরে এসে ঢুকলাম। মুখ তুলে বললেন তিনকড়িবাবু, কে? আসুন।

আমি কাছে এগিয়ে গিয়ে বললাম, শচীনদার সঙ্গে পরিচয়ের সুবাদে আপনার স্নেহলাভ করতে পারব, এ আশা আমার কাছে।

তুমি শচীনের বন্ধু? তা বসো।

আমি বললাম, বন্ধুত্বের ধৃষ্টতা রাখি না, তিনি আমাকে ছোট ভাইয়ের মতই স্নেহ করেন।

সেই ত আমার কাছে যথেষ্ট পরিচয়। তবুও—

আমি যথাবিহিত আমার পরিচয় নিবেদন করলাম।

এখানে এসেছিলে—

আপনাদের পায়ের ধুলো নেওয়ার জন্য। অনেক পুঁজি সংগ্রহ করে নিয়ে গেলাম।

'তিনকড়ি মুখুজ্যের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়, স্নেহ-আশীর্বাদ যাই বল না কেন, ভাঙিয়ে খাওয়ার মত পুঁজি নেই তার মধ্যে এতটুকু। তবে হ্যাঁ, সমাজপতি, তাঁর দৃষ্টি যার দিকে পড়বে, আর পাঁচজনও ফিরে দেখবে তার দিকে। সমাজপতির অনুমোদন হল সাহিত্য-সংবাদ-জগতে এন্‌ট্রান্স সার্টিফিকেট।

আমি বললাম, সার্টিফিকেট আমি পেয়েছি, কিন্তু তা কতটুকু কি কাজে লাগাতে পারব, তা নির্ভর করে আমার নিজের যোগ্যতার উপর। তবে, হ্যাঁ, মানুষের মত মানুষ দেখে গেলাম একটা।

তিনকড়িবাবু বললেন, নইলে ভাবতে পার, আহ্বান-আমন্ত্রণের অপেক্ষা

নেই, লাভলোকসানের প্রশ্ন নেই, যেখানে দরকার—সমাজপতি নিজের থেকে এসে উপস্থিত হয়। এই যে 'বসুমতী'র জন্য খাটছেন, তাও কি কেউ ডেকে এনেছে?—না, একটা পয়সা পান তাতে? কিন্তু সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। অথচ নিজেরও সচ্ছলতা নেই কিছু। নিজের ভাবনার সময় নেই, পরের ভাবনা ভেবে মরছেন।

ভারতীয় মনীষীদের ঐতিহ্য রক্ষা করছেন, আমি বললাম।

তার চেয়েও বোধ হয় কিছু বেশী, বললেন তিনকড়িবাবু। যেসব বিত্তবানের সঙ্গে ওঁর সৌহার্দ্য তাঁদের ভাঙিয়ে নিজে অনেক কিছু করে নিতে পারতেন। অথচ ভাঙাতেও কসুর করেন না। শুধু তা নিজের জন্যে নয়—এই যা। কোন্ সাহিত্যিকের সংসার চলে না, কোন্ পণ্ডিতের কন্যাদায়, কার থাকার অসুবিধে—সবই সমাজপতির মাথাব্যথা। দীনেশবাবুর বাড়ী করে দেওয়ার জন্য উনি কম দৌড়ঝাঁপটা করলেন!

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, উনিই ব্যবস্থা করে দিয়েছেন?

তা নয় ত কি! গগনঠাকুর ও কবিবর প্রমথনাথ রায় চৌধুরীর কাছ থেকে সমাজপতিই টাকা সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন। অথচ সমাজপতি নিজে কিন্তু ভাড়া-বাড়ীতেই কাটিয়ে গেল সারাজীবন।

বেরিয়ে আসবার সময় এই কথাই মনে হল যে, বিদ্যাসাগরের রক্তের মর্যাদা রক্ষা করছেন সমাজপতি।

অনেকদিন পরিষদ-মুখো হই নি, সেদিন আপিস থেকে বেরিয়েই সোজা শ্যামবাজারের ট্রামে উঠে বসলাম। পরিষদে যখন এসে পৌঁছলাম আপিস তখন জমজমাট। চার-চারজন দরোয়ান, বিলক্লার্ক, একাউন্ট্যান্ট, লাইব্রেরি-ক্লার্ক, প্রাচীন পুঁথি বিভাগের কর্মী—যে যাঁর কাজ নিয়ে বসে আছেন। আমি সোজা বড়বাবুর সামনে এসে হাজির হলাম।

বড়বাবু, অর্থাৎ—রামকমলদা কতকগুলি কাগজ দেখছিলেন। কাগজ থেকে চোখ উঠিয়ে বললেন, কি হে, একেবারে যে গা ঢাকা দিয়েছ!

গা ঢাকা দিই নি, তবে সবার কাছে ঘুরে ফিরে আলাপ করার লোভ সামলাতে পারি না বলে ঠিক মত এসে উঠতে পারি নে।

দরকার পড়লে ধরে আনতাম, বললেন রামকমলদা। ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করলেও রামকমল সিঙ্গী ছাড়ে না কাউকে।

সম্মিলনের রিপোর্ট শেষ করে ফেলেছেন রামকমলদা? আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

তা করে ফেলেছি, রামকমলদা বললেন, তবে তোমাকে একবার সেটাকে চোখ বুলিয়ে দিতে হবে। ছাপতে দিতে হবে, আর ফেলে রাখা চলে না।

রিপোর্টের খসড়া আমার হাতে এগিয়ে দিয়ে বললেন, শান্ত হয়ে বসে এটা দেখে দিয়ে যাও। যথাসময়ে চায়ের ব্যবস্থাটাও হবে।

এক খোরাক খইনি মুখে দিয়ে আমি রিপোর্ট পডতে লাগলাম। যথা-সময়ে চাও এসে পড়ল।

যে-যার চুপচাপ কাজ করে চলেছি এমন সময় যথারীতি হন্তদন্তভাবে পণ্ডিত নলিনীরঞ্জন এসে পড়লেন।

ব্যাপার কি পণ্ডিতজী? প্রশ্ন করলেন রামকমলদা। ক'দিন একেবারে দেখা নেই!

আরে ভাই, বললেন পণ্ডিত, ট্রাম থেকে নামতে গিয়ে পায়ে চোট লেগে গিয়েছিল, পা নাড়তে পারিনি ক'দিন!

তা নইলে আর পণ্ডিত, হেসে উঠলেন রামকমলদা। ট্রাম থেকে নামবার সময় আপনার মাথায় থাকে যত রাজ্যের হাজার চিন্তা, পা খানায় পডল, কি, কোথায় পড়ল—সেদিকে হুঁস থাকে না ত! তাই মাঝে মাঝেই ঠ্যাং মচকায়। এখন সেরেছে ত?

কাজ চালাবার মত হয়েছে, বলেই নলিনীদা আমার দিকে তাকালেন, পবিত্র কতক্ষণ? পথ ভুলে না কি?

আমি অপরাধীর মনোভাব নিয়ে তাকালাম নলিনীদার দিকে। অভিমানে ফেটে পড়লেন নলিনীদা, আমি ঠ্যাং ভেঙে বাড়ীতে পড়ে, একবার খোঁজ নিতে পারলে না তুমি? আর পরিষদের কাজ চলে কি করে? ডেকে না আনলে আসব না, আরে এ কি কারুর মেয়ের বিয়ে!

আমি ত নিজে থেকেই এসেছি, আমি শান্ত স্বরে জবাব করলাম।

জানেন পণ্ডিতজী, মহেন্দ্র এসেছে, বললেন রামকমলদা।

কবে? প্রশ্ন করলেন পণ্ডিত, আমার সঙ্গে দেখা করে নি ত!

আছে এখানে দিন কয়েক, সস্ত্রীক এসেছে কি না, রামকমলবাবু বললেন।

নলিনীদা জিজ্ঞাসা করলেন, মেদিনীপুর ও সেখানকার পরিষদের খবর সব ভালো?

রামকমলদা বললেন, কাজ চলচে ধীরে ধীরে।

কোথায় উঠেছে? একবার দেখা করতে হবে।

রামকমলদা প্যাডে গোঁজা এক টুকরো কাগজ নলিনীদার হাতে তুলে দিলেন।

আরে কত বছর বাঁচবে তুমি! রামকমলদা সোল্লাসে স্বাগত জানালেন প্রবেশমান এক যুবককে। এইমাত্র পণ্ডিতজীকে তোমার ঠিকানা দিলাম।

পণ্ডিতজীও ঘাড় ফেরালেন। ব্যাপার কি মহেন্দ্র? শুনলাম সস্ত্রীক এসেছ!

পারিবারিক প্রয়োজন আছে কিছু, বললেন শীর্ণকায় তামাটে রঙের প্রফুল্লবদন মানুষটি।

একে চেনো মহেন্দ্র, আমার দিকে দেখিয়ে দিলেন নলিনীদা। মহেন্দ্রবাবু জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকিয়ে দেখলেন। এ পবিত্র, সর্বঘটে কাঁঠালি কলা, যে-কোন কাজে লাগিয়ে দেওয়া যাক, কাজ ঠিক করে আসবে।

আর ওঁকেও চিনিয়ে দিন, আমি বললাম।

ও, আমাদের মেদিনীপুরের মহেন্দ্রনাথ দাস, বললেন নলিনীদা। মেদিনীপুরে পরিষদের শাখা প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম।

আমি ও মহেন্দ্রবাবু একসঙ্গে পরিষদ থেকে বার হলাম। হেঁটেই আমহার্স্ট স্ট্রীট দিয়ে চললাম। নানা কথাবার্তায় দুজনের মধ্যে আত্মীয়তা গড়ে উঠল পথ চলতে চলতে। বৌবাজারে এসে আমি বাঁদিকে মোড় বেঁকলাম না, মহেন্দ্রবাবুকে এগিয়ে দিতে গেলাম। ভীমনাগের দোকান পার হয়ে এসে ঢুকলাম একটা সরু গলির মধ্যে। মহেন্দ্রবাবু কিন্তু দরজা থেকেই আমাকে ছেড়ে দিলেন না। ভিতরে টেনে নিয়ে গিয়ে বসালেন। চা খাওয়ার প্রস্তাব আমি বাতিল করে দেওয়ার পরও তিনি ছুটি দিলেন না আমাকে। অনেক সঙ্কোচ কাটিয়ে বললেন, আসল কথাটা—আমাকে সঙ্গে করে মেদিনীপুরে নিয়ে যেতে চান।

আমি আপত্তি করলাম, অসুবিধা ছিল অনেক। কিন্তু মহেন্দ্রবাবুর আগ্রহ কাটিয়ে উঠতে পারলাম না—রাজী হতে হল।

কথা দিয়েছিলাম, কাজেই মহেন্দ্রবাবুর ডেরায় এসে হাজির হতে হল যাত্রার জন্য নির্দিষ্ট দিনে। কিন্তু এবার তিনি যে সংশোধিত প্রস্তাব করলেন, তাতে বড়ই বিড়ম্বিত বোধ করলাম। মেদিনীপুরের পথে আগে যেতে হবে মাকড়দা—ওঁর শালীর বাড়ী। খুব খারাপ লাগল, দু-দিনের আলাপের সুবাদে একজনের শালীর বাড়ী গিয়ে ওঠার প্রস্তাব। আমার সঙ্কোচের কারণ আঁচ করে মহেন্দ্রবাবু বললেন, আরে রেখে দাও, যেতে তোমাকে হবেই, আমি যেখানে নিয়ে তোমাকে তুলতে পারি, সেখানে যেতে তোমার বাধা কি? তা ছাড়া, পূব বাংলার লোক তুমি, আমাদের দেশের পল্লী অঞ্চলটা একবার দেখো না। মেদিনীপুর যাবে, তা সেটা ছোট হলেও শহর ত।

এর পর আর কোন আপত্তিই টিকল না।

ছোট রেলের গল্প শুনেছিলাম, কিন্তু তার দর্শন এবং স্পর্শন এই আমার প্রথম। এক হাত ফারাক সরু সরু এক জোড়া লাইন দেখে গাড়ী যত ছোট হবে ভেবেছিলাম, তত ছোট কিন্তু দেখলাম না। বেশ কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে ট্রামের মত চলছে। বাংলার শ্যামল ছবি ও নীল আকাশের সঙ্গে সবুজ দিগন্তের কোলাকুলি যা চোখে পড়ল, তা আমার অপরিচিত নয়। তবুও গ্রামের ভিতর দিয়ে যখন চলেছে গাড়ী পুকুর ঘাটের পাশ দিয়ে, খড়ো ঘরের পিছন দিয়ে, তখন এ অঞ্চলের জীবনযাত্রায় কিছুটা পার্থক্য লক্ষ্য করলাম। কুল-ছাপানো ভরা দীঘি চোখে পড়ল না একটাও। বড় পুকুর যাও আছে, জল পড়ে আছে সেই তলায়। এখানে ওখানে কাদা ভরা ছোট্ট ডোবার ধারে কাজ করছে মেয়েরা। পূব বাংলায় মাটির ঘর চোখেই পড়ে না, খড়ো ঘরের সংখ্যাও বেশী নয়। সেখানে টিন বাঁশ ও দরমার দেয়াল দিয়েই ঘর তৈরী হয়। এখানে দেখলাম, দু-চারখানা কোঠা বাড়ী ছাড়া সব ঘরেই মাটির দেয়াল। ঘরের চালগুলো আটচালার মত সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে নেই, দু-পাশে উবু হয়ে এসে প্রায়- ভূমিস্পর্শ করেছে। বাড়ীর উঠোনে আশে পাশে গরু ও গরুর গাড়ী।

কিন্তু বাঙালী জাত ও তার সাংস্কৃতিক ঐক্যের সূত্রটুকু চোখে পড়ল। খাল নদী জলা নেই, তবু ছোট ছোট জাল ঝুলছে প্রায় সব বাড়ীর দেয়ালে। হুঁকো হাতে ছোট কাপড়-পরা পুরুষ ও খাটো মোটা ময়লা শাড়ীতে দেহ আবৃত-করা নারী বাংলার চাষী সমাজের এই চিত্রে কোথাও ব্যতিক্রম আছে বলে মনে হল না। মাঠে মাঠে রাখাল ছেলে তেমনি গরু চরাচ্ছে, তেমনি কালো, তেমনি

রোগা, ঠিক তেমনি নেংটি-পরা, তবু এদের দেখলাম উদরসর্বস্ব, যেমনটি পদ্মা-পাড়ে দেখি নি।

কি দেখছো? জিজ্ঞাসা করলেন মহেন্দ্রবাবু। এ অঞ্চলে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব একটু বেশী কি-না, নদী নালা নেই, বর্ষার জল জমে পচে ওঠে।

স্টেশনের আগেই লাইনের ধারে মহেন্দ্রবাবুর শালীর বাড়ী—আমাদের গন্তব্যস্থল। দূর থেকেই সস্ত্রীক মহেন্দ্রবাবু সে দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিলেন। গাড়ী কাছে আসতেই সে বাড়ীর মেয়ে-পুরুষকেও লাইনের ধারে খাড়া দেখতে পাওয়া গেল। অভিনন্দনের পালার মধ্যেও মহেন্দ্রবাবু একটা কাপড়ের বুচ্‌কি ট্রেন থেকে ফেলে দিলেন মাটিতে। আমায় বললেন, বোঝা কমিয়ে ফেললাম। আমাদের অনেক আগে ওটা বাড়ী পৌঁছে যাবে।

অজস্র গাছ-গাছড়ায় ঘেরা পাকা দোতালা বাড়ী। সেখানে অতিথি সৎকারের প্রচুর ব্যবস্থা, যথেষ্ট আদর ও আপ্যায়নের ভিতর দিয়ে রাত কাটিয়ে পরদিনই ফিরে এলাম হাওড়ায়, ধরলাম মেদিনীপুরের গাড়ী।

গৃহস্বামী নিঃসন্তান পঞ্চাশোর্ধ্ব বেণীবাবু এমনভাবে আমাকে গ্রহণ করলেন—যেন আমি তার বহু পরিচিত সমবয়সী বন্ধু। ব্যবহারের মধ্যে কোথাও ফাঁক বা ফাঁকি নেই। এই একদিনের পরিচয়ে তাঁর সঙ্গে যে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গেল, তাকে স্থায়ী মর্যাদা দিয়েছিলেন তিনি। চলতে ফিরতে কতদিন টি. ই. টম্পসনে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছি, কত আপ্যায়ন করেছেন। গল্পে রসিকতায় কোনদিন কার্পণ্য করেন নি। বেণীবাবুর শ্যালকও ওই আপিসেরই কর্মচারী তরুণ রতন, সেও মাকড়দায় ওই বাড়ীতেই ভগিনীপতির অভিভাবকত্বে থাকত। আমার সুখ সুবিধার দিকে এই অল্পক্ষণের অবস্থানে তাকে অত্যন্ত সচেতন দেখলাম।

মেদিনীপুরের গাড়ী গোটা কয়েক কাঁচা খাল পেরিয়ে এল। বড় ভাল লাগল খাল দেখতে। কিন্তু এই দামোদর! বিরাট ব্রিজের তলায় খালি ঘেসো মাঠ, মাঝখান দিয়ে শীর্ণ নদী তির্ তির্ করে বয়ে চলেছে। মহেন্দ্রবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম, এই আপনাদের সর্বভুক দামোদর? মাতৃমন্ত্রের জোরে বিদ্যাসাগর এই নদী পার হয়েই অক্ষয় কীর্তি রেখে গেছেন?

পছন্দ হল না, না? বললেন মহেন্দ্রবাবু, 'ব্রিজের পরিধি দেখে বুঝছ না, বর্ষায় কি চেহারা হয় এর! রেল কোম্পানি নিষ্প্রয়োজনে এত বড় সেতু বাঁধে না।

আরও কিছুদূর এগিয়ে এসে হঠাৎ এ কি চোখে পড়ল! পদ্মার মত বিরাট নদীর বাঁক। প্রশ্ন করে জানলাম,—রূপনারায়ণ। কাছে এসে যখন পৌঁছলাম, অন্তর ভরে গেল সে দৃশ্য দেখে। ডাইনে বাঁয়ে বিশাল বক্ষ প্রসারিত করে ধীরে বয়ে চলেছে নদ। উত্তর দিক থেকে একখানা স্টীমার আসতে দেখলাম।

মহেন্দ্রবাবু বললেন, ঘাটাল থেকে আসছে। দক্ষিণে নদীপথে তমলুক। মনে হল এই নদীরই কূলে ছিল তাম্রলিপ্ত। বন্দর হবার উপযুক্ত স্থান বটে। নদী পার হয়ে কোলাঘাটে যতক্ষণ গাড়ী থেমে রইল, আমি দুচোখ ভরে নদী-শোভা আহরণ করলাম।

মেদিনীপুরে এসে দেখলাম, মাটির চেহারা অন্য রকম, গৈরিক মাটির পথ, চাকায় কেটে ছুটে চলল আমাদের ঘোড়ার গাড়ী। ফাঁকা জায়গা, কিছু বাদে বাদে পাকা দোতলা বাড়ী। বাড়ীঘর সবই প্রাচীন।

মহেন্দ্রদার বাড়ী এসে নামলাম। রাঢ় অঞ্চলের খড়ো ঘর, কিন্তু পরিপাটি করে গোছানো। মহেন্দ্রদা কালেক্টরির কর্মচারী, কিন্তু সাহিত্যে তাঁর উৎসাহ অপরিসীম। ঘরে বইয়ের সংখ্যা যা দেখলাম তা উপেক্ষার নয়। হাতে এগিয়ে দিলেন স্বরচিত কুরুক্ষেত্র-রৈবতক-প্রভাস-এর (নবীন সেন-রচিত) সমালোচনা গ্রন্থ, মনীষী হীরেন্দ্রনাথ দত্তের ভূমিকা সম্বলিত।

সাহিত্য-পরিষদ এবং তার কর্মপন্থা নিয়ে অনেক আলোচনা করলেন। আমি পূব বাংলার কাহিনী সংগ্রহ করেছিলাম সেকথা শুনে আনন্দ প্রকাশ করলেন। বললেন, এ অঞ্চলেও কাহিনীর অভাব নেই। মেদিনীপুর শাখা-পরিষদ যদি সেই সব সংগ্রহ করতে পারে তা হলে তার জন্ম সার্থক হবে।

ঘোরা ফেরা বেশী করলাম না, মেলামেশার পাটও তুলে রাখলাম। মহেন্দ্রদার গৃহ ও সঙ্গ—এরই মধ্যে দিয়ে কেটে গেল দুদিন। শুধু ক্ষিতীশদার (চক্রবর্তী) সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন মহেন্দ্রদা। বললেন, এই ক্ষিতীশ চক্রবর্তী, মেদিনীপুরের প্রাণ, যদিও আসলে ও পাবনার লোক। কিন্তু মেদিনীপুরের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেছে ও নিজেকে। ওঁর বাবা ঈশ্বর চক্রবর্তী ছিলেন এখানকার হেড মাস্টার। সেই সুবাদে অবশ্য ও মেদিনীপুরেরই ছেলে, এখন ওকালতি করে। এই যে সাহিত্য-পরিষদের শাখা এখানে পত্তন হয়েছে, তাও ক্ষিতীশের চেষ্টায় ও আগ্রহে।

কিছুটা রেগে উঠে ক্ষিতীশবাবু বললেন, দেখ্ মহেন্দ্র, তোর চরিতামৃত কথা বন্ধ কর্। যাকে মেদিনীপুরে ডেকে এনেছিস্ তাকে আদর যত্ন কর্,

আর তার কাছ থেকে মেদিনীপুরের কি সুবিধা করে নিতে পারিস্ সে ব্যবস্থা কর্। উনি সাহিত্য-পরিষদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ, তা ছাড়া, কলকাতায় প্রতিষ্ঠাবান সমাজে ঘোরাফেরা আছে।

পরদিন চলে এলাম মেদিনীপুর ছেড়ে। একটি মাত্র জায়গা দেখবার ইচ্ছা ছিল, তা বীরসিংহ গ্রাম। শুনলাম অনেক দূরে, ঘাটাল অঞ্চলে।

অনেক দিন আগে মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রথম পরিচয়েই তিনি আমাকে 'ভারতী'র আড্ডায় আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে অনেক খোঁয়াড়েই মাথা গলিয়েছি, কিন্তু সেখানে আর যাওয়া হয়ে ওঠে নি। অথচ 'ভারতী'র পাতা উলটিয়ে আর এখানে সেখানে 'ভারতী'র দলের সম্বন্ধে দু-চার কথা শুনে লোভ বেড়ে উঠছিল—রসের ভিয়ান আছে সেখানে। আকাঙ্ক্ষা প্রবল হতেই সঙ্কোচ গেল কেটে। একদিন সত্যি সত্যি বিকেল বেলা এসে হাজির হলাম বাইশ নম্বর সুকিয়া স্ট্রীটে (বর্তমানে কৈলাস বোস স্ট্রীট) কান্তিক প্রেসে।

দরজা পার হয়ে ডান দিকে আপিস ঘরে আমারই বয়সী একটি ছেলেকে উপবিষ্ট দেখতে পেলাম। জিজ্ঞাসা করলাম মণিলালবাবু আছেন কি-না। সে জানালে, মণিবাবু এসেছেন এবং সিঁড়ি ধরে সোজা তিন তলায় উঠে যাওয়ার নির্দেশ দিলে আমাকে।

সন্তর্পণেই উঠে এলাম অপরিচিত বাড়ীতে, ছাপাখানা পার হয়ে, প্রায় অন্দরমহলে চলেছি কি-না। উপরে উঠেই সামনে ঘর, দরজা খোলা। ঘরের অর্ধেকের উপর তক্তপোশের উপর ঢালা ফরাশ পাতা আর একপাশে চেয়ার, ডেক চেয়ার, ইজিচেয়ারের ভিড়। একটা ইজিচেয়ারের উপর মণিলাল বসে ছিলেন, আর ফরাশের উপর উবু হয়ে পড়ে প্রুফ দেখছিলেন আর এক ভদ্রলোক, বয়সে আমার চেয়ে কিছু বড়। ঘরে ঢুকতেই মণিবাবুর চোখ পড়ল, আরে পবিত্রবাবু যে! কি মনে করে?

আসবার ইচ্ছে ত অনেক দিন থেকেই পোষণ করছি, তবু আসা হয়ে ওঠে নি।

খুব সুখের কথা যে শেষ পর্যন্ত সময় করে এসেছেন, বললেন মণিলাল।

বসুন। আলাপ করিয়ে দি। ওহে হেমেন্দ্র,—তক্তপোশের উপরকার ভদ্রলোক চোখ তুলে তাকালেন, ইনি পবিত্র গাঙ্গুলী, 'সবুজপত্র'-এ চৌধুরী মহাশয়ের সহকারী।

ও, তা বেশ, বলে সে ভদ্রলোক আবার নিজের কাজে মন দিলেন।

আমি ততক্ষণে মণিবাবুর কাছে একটা চেয়ারে বসে পড়েছি। জিজ্ঞাসা করলাম, উনি ?—

উনি হেমেন্দ্রকুমার রায় আমাদের বন্ধু, একাধারে কবি ও কথাসাহিত্যিক।

আর একবার চোখ তুলে তাকিয়ে নিলেন হেমেন্দ্রকুমার।

আপনি ত আজকাল আর 'কমলালয়'-এ থাকেন না শুনেছি, বললেন মণিলাল।

না, শেয়ালদায় মেসে থাকি, আমি জবাব করলাম, বালিগঞ্জে এককোণে পড়ে থাকায় কিছু অসুবিধা হচ্ছিল আমার। এই ধরুন, আপনাদের এখানে, কি সাহিত্য পরিষদে, কি প্রভাতদার আড্ডায়—যে-কোন খানে আসতে হলে অনেক তোড়জোড় হাঙ্গামহুজ্জৎ করতে হত। শেয়ালদা থেকে পায়চারি করতে করতে চলে আসি।

আপনার সুবিধে আপনিই সব চাইতে ভাল বুঝবেন, বললেন মণিলাল। তবে আমি হলে বাসা বদল করতাম না। বীরবলের ছত্রছায়ায় ও সাহচর্যে দৈনন্দিন জীবন যাপনের দাম অনেকখানি। আর একবার চোখ তুলে তাকালেন হেমেন্দ্রকুমার।

সে কথা আর আমি অস্বীকার করি কি করে, আমি বললাম, আমার যা-কিছু পরিচয়, তাও ত 'কমলালয়'-এ বাসের দৌলতে। না হলে আপনার এখানেই এত সহজ ভাবে এসে উঠতে পারতাম কি ?

একটা সুবাদ ধরে আমরা প্রথম পরিচয় করি, বললেন মণিলাল, তারপর সে পরিচয় দানা বাঁধে নিজের জোরে। সে জোর আপনার আছে, কাজেই এ দরজা আপনার জন্য বরাবরই খোলা থাকবে। তা ছাড়া, এ আড্ডায় আর যাঁরা আছেন তাঁদের সঙ্গে পরিচয়ে আপনি সুখীই হবেন।

পরিচয়ের সুখ একতরফা হলে চলে না, আমি বললাম, তাঁদের খুসি করবার মত আমার যদি কিছু থাকে তা হলেই সে পরিচয় স্থায়ী হতে পারে।

কিন্তু আপনি, বললেন মণিলাল, যে ভাবে আমার শ্বশুর মশায়কে হাত করেছেন—

হাত করেছি ! আমি বিস্মিত হলাম।

হাত করেছেন, মানে, তিনি আপনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কি করে করলেন বলুন ত ?

হেমেন্দ্রকুমার এতক্ষণ উবু হয়ে প্রুফ দেখছিলেন, এবার সোজা হয়ে উঠে বসলেন। একটা তাকিয়া সামনে টেনে নিয়ে তার উপর তুলে নিলেন প্রুফগুলো।

আমি বললাম, শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ আমার প্রশংসা করেছেন, এর চেয়ে আনন্দের ও গৌরবের আমার পক্ষে আর কিছুই হতে পারে না। তবে কি করেছি আমি, যার জন্যে তাঁর প্রশংসা দাবি করতে পারি সে আমি এখনো বুঝে উঠতে পারছি নে।

এমন সময় ঘরে এসে ঢুকলেন এক ভদ্রলোক, পরিপাটি বেশবাস, ছোটখাটো মানুষটি, গায়ে সাদা চাদর জড়ানো, মাথায় চুল ছোট করে ছাঁটা, গোঁফ-দাড়ি কামানো, চোখে চশমা। ধীর পদক্ষেপে ঢুকলেন ঘরে। এসো চারু, বললেন মণিলাল। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ইনি চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু।

'প্রবাসী' চালাচ্ছেন ত এখন ? আমি প্রশ্ন করলাম।

'প্রবাসী' চালান রামানন্দবাবু স্বয়ং, হেসে চারুবাবু বললেন, আমি তাঁর হুকুমে খাটি। আপনি ?

ইনি 'সবুজপত্র' চালান, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, বললেন মণিবাবু।

'সবুজপত্র' একদিন চালাবার যোগ্যতাও আমার নেই, আমি জবাব করলাম। সম্পাদকের সেক্রেটারিগিরি করি ঠিকই, ডাক খুলি, তাঁর সামনে ধরি, তাগিদ দিয়ে লেখা নিয়ে আসি আর প্রুফ দেখি। এ ছাড়া আমার একমাত্র যোগ্যতা লোকের সঙ্গে আলাপ জমানোর লোভটুকু। তারই জোরে না আপনাদের এখানে এসে জমলাম।

জমে গেছেন তা হলে, বললেন চারুবাবু। মনে সঙ্কোচ না রেখে জমে গেছেন যে মুহূর্তে একথা মনে করবেন, দেখবেন আমাদের মধ্যে কোন আড়াল নেই। রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী—এঁদের কথা আলাদা। নইলে আর সকলের যোগ্যতা উনিশ আর বিশ, বন্ধুত্বের ব্যাপারে তা ধর্তব্যের মধ্যেই নয়।

একটি হিন্দুস্থানী চাকর এসে চা দিয়ে গেল, চারুবাবুকে দিলে না। আমি মনে করলাম এইমাত্র ইনি এসেছেন বলে হয় ত ওর চা তৈরী হয় নি। আমার

কাপটা এগিয়ে দিলাম ওঁর দিকে। মণিলাল বলে উঠলেন, আরে ক্ষেপেছেন? চারু খাবে চা? এসব বিষয় ওর অদ্ভুত সংযম। এখন ওর ভাত খাবার সময়, সন্ধে হয়ে গেছে কি-না। বংশীর সে খবর জানা আছে বলেই ওকে চা দেয় নি।

প্রুফ নামিয়ে রেখে চায়ের কাপ হাতে নিয়ে এগিয়ে বসলেন হেমেন্দ্রকুমার।

আচ্ছা চারুবাবু, সন্ধ্যার সময় ভাত খেয়ে রাখেন, সারারাতের মধ্যে খিদে পেয়ে যায় না আপনার? আমার হলে ত ঘুম ভেঙে যেত খিদের চোটে, হেসে বললেন হেমেন্দ্রকুমার।

তুমি ত জান হেমেন্দ্র, বললেন মণিলাল, চারু রাত আটটায় ঘুমিয়ে পড়ে, তারপর একটা থেকে উঠে লেখা পড়া করে।

যাক ওসব কথা, কাগজ কবে বেরুচ্ছে? প্রশ্ন করলেন চারুবাবু।

সেটা হেমেন্দ্রের উপর নির্ভর করছে, বললেন মণিলাল।

কি নির্ভর করছে হেমেন্দ্রের ওপর, ঘরে পা দিতে দিতেই প্রশ্ন করলেন আগন্তুক।

কেন বুড়োর হিংসে হচ্ছে নাকি, বললেন মণিলাল। কাগজ কবে বেরুবে তা কিছুটা হেমেন্দ্রের হাতে নয় কি!

শালুক চিনেছেন গোপালঠাকুর, বলে চটি ছট্‌ছট্‌ করে এগিয়ে এসে বসলেন বুড়ো, অর্থাৎ নবাগত। ছিপ্‌ছিপে চোখা চেহারা।

আমার দিকে ভদ্রলোক একবার তাকালেন, সূচিতীক্ষ্ণ সে দৃষ্টি। তার পর চারুবাবুর দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, একে ত আগে কখনো দেখেছি বলে মনে হয় না।

মণিলাল আমার পরিচয় দিলেন, আগে কখনো এখানে আসেন নি।

আজ যে বড় এলেন! বললেন বুড়ো অর্থাৎ প্রেমাঙ্কুর আতর্থী। মণিলাল না হয় অবন ঠাকুরের জামাই, কিন্তু আর যারা আমরা এখানে মিলি তারা ত সবাই লোফার, অন্তত বালিগঞ্জ ও জোড়াসাঁকোর মতে।

তা যদি সত্য হত, হেসে বললেন মণিলাল, তা হলে রামানন্দবাবুর ডানহাত চারু আর কবির প্রিয়তম শিষ্য সত্যেন দত্ত এখানে আসতেন না। তুমি ভাই বুড়ো, গায়ে পড়ে ঝগড়া কর।

দুর্জনরা করেই থাকে এরকম। টিপ্পনি কাটলেন আতর্থী, সেই জন্যই ত দুর্জন সংসর্গ ত্যাগ করার শাস্ত্রের নির্দেশ আছে। ভদ্রলোক এ দলে

নেই এমন কথা বলছি নে। কিন্তু ইংরিজি প্রবাদ জান ত, একটা দুষ্টু ভেড়া সারা পালটাকে নষ্ট করে।

সেই দুষ্টু ভেড়া বুঝি আপনি? জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

এরই মধ্যে ধরে ফেলেছেন তা হলে আপনি! গুণী লোক, বুঝলেন ত চারুবাবু!

অন্য কিছুও ত হতে পারে, আমি বললাম। যদি বলি রতনে রতন চেনে?

তোবা তোবা! অট্টহাস্য করে উঠলেন আতর্থী। হেমেন্দ্র চুপচাপ বসে দেখছ কি? এসেছে, কষ্টিপাথরে যাচাই করে নাও।

আসল কষ্টিপাথর এখানে কে? সেইটেই ত প্রশ্ন, বললেন মণিলাল। এক জহুরীর যাচাইয়ের রিপোর্ট আমার কাছে আছে।

সেই জহুরী ত তোমার শ্বশুর, মন্তব্য করলেন হেমেন্দ্রকুমার।

চারুবাবু দাঁড়িয়ে উঠলেন, তোমাদের বৈরভাবের আরাধনা চলুক ভাই, আমি এখন চললাম। আমার দিকে ফিরে বললেন, এঁদের ভালবাসার নমুনাই এই, পবিত্রবাবু, ছোটছেলের মত কামড়াকামড়ি করেই ভাব জমায়। যাই হোক, এখানে আপনাকে মাঝে মাঝে ত পাবই, তা ছাড়া, 'প্রবাসী'তে আসবেন যখন খুশি, আমি দুপুরের দিকেই থাকি।

চলি মণিলাল। চারুবাবু বেরিয়ে গেলেন।

আখোজই ত হল, বললেন প্রেমাঙ্কুর, তারপর রতন, এখানে কি মনে করে?

দেশবিখ্যাত 'ভারতী'র আড্ডা, আমি বললাম, এখানে এসে মেলামেশা না করতে পারলে কলকাতা শহরে কুনো ব্যাং হয়ে যাব যে!

তাই কমলবন ছেড়ে লবণ সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছেন বুঝি?

আচ্ছা বুড়ো, হেসে বললেন মণিলাল, অজ্ঞাতবাসের গল্পটা কি কোন দিনই শোনাবে না?

শোনাবে আর কি করে, বললেন হেমেন্দ্রকুমার, বৃহন্নলা বেশে কত অন্তঃপুরে ঢুকে নেচে-কুঁদে এসেছে সে কথা কি আর সবার সামনে বলা যায়!

বাইরের লোক বলতে ত আমি—

আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে প্রায় ধমকে উঠলেন প্রেমাঙ্কুর, এখনো

যদি বাইরের লোকই হয়ে থাকতে চাও ত বেরিয়ে যাও। আমরা প্রাণ খুলে দুটো গল্প করি।

আমাকে তা হলে আপনারা গ্রহণ করলেন না, এ বুঝেই কি আমাকে যেতে হবে? সবিষাদে প্রশ্ন করলাম আমি।

ছি, বুড়ো, বললেন মণিলাল।

দোষ ত ওর, তর্জন করে ওঠলেন আতর্থী, ও কেন বলে নিজে থেকে বাইরের লোক বলতে ত আমি।

শেষের ক'টা কথা ব্যঙ্গের সুরে আমাকে নকল করে বলা হল। তার পরই পিঠে একটা চাপড় মেরে বলে ওঠলেন, বোস্, নে একটা সিগারেট খা। তারপর বল দেখি নি, এ দুর্মুখটাকে সহ্য করতে পারবি কি-না। মণিলাল পেরেছে, চারুবাবু পেরেছেন, নইলে এ হাঁসের মেলায় আমি ত ব্যাটা বক। শুধু বক্ বক্ করেই চলেছি।

সিগারেটের প্যাকেটটা বার করে আমাকে ও হেমেন্দ্রকুমারকে সিগারেট দিয়ে নিজে একটা ধরালেন। মণিলালকে দিলেন না, বললেন, তোমার ত আবার কুটীরশিল্প, নেবে, না, পাকাবে? মণিলাল হাত বাড়িয়ে প্রেমাঙ্কুরের হাত থেকে সিগারেট নিলেন।

অজ্ঞাতবাসের গল্পটা তাহলে চাপাই থাকবে, না কি বল? বললেন হেমেন্দ্রকুমার। ভয় নেই, পবিত্রবাবুকে ত ঘরের লোক করেই নিয়েছ। উনি আর গিয়ে ঘরের কেলেঙ্কারি 'সবুজপত্র'-এর আড্ডায় বাখান করবেন না নিশ্চয়ই।

'সবুজপত্র'-এর আড্ডায় আমার জায়গা কোথায় বলুন? আমি বললাম। চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ীতে যতদিন ছিলাম, ততদিন আড্ডায় কখনো সখনো ঢুকে পড়েছি, অবাঞ্ছিত না হলেও অবান্তর হিসেবে। এখন ত মেস আর হেস্টিংস স্ট্রীট, সেখানে ত আর আড্ডা বসে না।

যাক, তুমি এখন কিছু বলবে কি-না, বললেন মণিলাল।

বলব ত নিশ্চয়ই, বললেন বুড়োদা, কিন্তু নিজেরা চা খেয়ে বসে আছ, বংশীটা গেল কোথায়?

মুখের কথা না ফুরোতেই চায়ের কাপ হস্তে বংশীর প্রবেশ।

তুই গোনা জানিস বংশী? বললেন আতর্থী।

গোনা জানে না, বললেন হেমেন্দ্রকুমার, কিন্তু তোমাকে ত জানে। তুমি এসেছ সন্ধ্যার সময়, এর পরেও ওকে চা করতে বলতে হবে?

আমাদেরও আর একটু দিও বংশী, বললেন মণিলাল।

আপনি বুঝি মেসে থাকেন? প্রশ্ন করলেন হেমেন্দ্রকুমার।

হ্যাঁ, এক নম্বর চুনাপুকুরে।

মেসে? বিয়ে-থা করিস নি? জিজ্ঞাসা করলেন বুড়োদা।

তা করেছি।

আমার আমতা-আমতা জবাব শুনে তর্জন করে উঠলেন আতর্থী, আ মলো যা! একেবারে ক'নে বউ, লজ্জায় মরে গেলো!

বয়োজ্যেষ্ঠদের কাছে যদি বিবাহের কথা বলতে একটু লজ্জাবোধ করে তাতে এমন কি অপরাধ হয়েছে বুড়ো? মণিলাল বললেন।

হেমেন্দ্রকুমার বললেন, চুনো পুকুরের গলি ত খুব দূর নয়। মাঝে মাঝে আসবেন, ধরে নিতে পারি।

আসতে ত হবেই আমাকে, আমি বললাম, আড্ডা দেওয়া ছাড়া আমার কাজ কোথায়? বিশেষ আপনাদের সঙ্গের আকর্ষণ আছে ত!

কি বিপদ! বললেন বুড়োদা, বিদগ্ধ সমাজে বাস করে ছোকরা বড় ইনিয়ে বিনিয়ে কথা বলতে শিখেছে। সোজা কথা সোজাভাবে বলতে পারিস্ না?

ভাল কথা বুড়ো, বললেন মণিলাল, গজেনদা তোমার খোঁজ করছিলেন।

করবেনই ত, বললেন প্রেমাঙ্কুর। ক'দিন যাই নি কি-না। সন্ধে হয়ে গেছে, এখনই যাওয়া যাক। যাবি পবিত্র, আমার সঙ্গে? আড্ডা দেওয়া ছাড়া ত তোর অন্য কাজ নেই।

মণিবাবু ও হেমেন্দ্রকুমারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বুড়োদার সঙ্গে গজেনদার আড্ডার দিকে রওনা হলাম।

সুকিয়া স্ট্রীট থেকে কর্নওআলিশ স্ট্রীট ধরে উত্তরে রওনা হলাম।

মাত্র ক'পা পথ, বললেন বুড়োদা, ওই ত অক্সফোর্ড মিশনের পাশে।

এইটুকু আসতে আসতেই গজেনদার পরিচয় দিলেন বুড়োদা, বনেদি ঘর, মহাদেব চরিত্রের মানুষ! নিজে রেলির ক্যাশিয়ার, বাতের জন্যে চলাফেরা করতে পারেন না, তাই ঘর জাঁকিয়ে দুনিয়াকে ডেকে নিয়ে আসেন। সাহিত্যিক নন, সাহিত্য-রসিকও তাঁকে বলা চলে না, কিন্তু এমন সাহিত্যিক-প্রিয় লোক কদাচ দেখা যায়। রস গ্রহণ ও রস পরিবেশনে অকৃপণ।

বর্তমানে যেখানে বিবেকানন্দ রোড কর্নওআলিশ স্ট্রীটকে কেটে গিয়েছে তারই উত্তর-পূর্ব অংশে আটত্রিশ নম্বর কর্নওআলিশ স্ট্রীটে গজেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের আলয়ে এসে ঢুকলাম। দরজা পার হয়েই বাঁ দিকে বৈঠকখানা। ছোট্ট ঘরে তক্তপোশের উপর ফরাস বিছানো। সেখানে মহাদেবাকৃতি গজেনদা সমাসীন। গড়গড়া টানছেন।

এসো বুড়ো, ক'দিন দেখা নেই। গজেনদা স্বাগত জানালেন। সঙ্গের একে ত চিনি না।

সঙ্গের এটি আমাদের নতুন শিকার, এক টোপে গেঁথে তুলেছি। সাহেবী পাড়ার সাহেব-সাহিত্যিকের চেলা। ঢুকে পড়েছিল এসে আমাদের খালে। আর যায় কোথায়! এবার আপনার আড়তে এনে জমা করলাম।

বেশ, বেশ, বলে উঠলেন গজেনদা। সাহেব-সাহিত্যিককে আমাদের মধ্যে না পেলেও তার চেলাকে যখন পেয়ে গেছি, বসো। বসো ভাই, বসো, আমার দিকে ইঙ্গিত করে বললেন। চা চলবে ত?

আমি ঘাড় নাড়লাম।

হালকা, না, কড়া? চিনি ক'চামচ?

আমি উত্তর দিতে একটু বিব্রত বোধ করলাম। নিজেই জানি না, কেমন চা খাই বা ভালবাসি।

প্রত্যেকের সূক্ষ্ম রুচিবোধ এবং পছন্দ-অপছন্দ এখানে মর্যাদা পায়, বললেন বুড়োদা। এর নাম গজেনদার আপ্যায়ন, বুঝলে পবিত্র?

চাকরকে একটা হাঁক দিলেন, তারপর শ্রীমান এসে হাজির হতেই তাকে ভাল করে বুঝিয়ে দিলেন, ঠিক কেমনতর চা চাই। হালকাও নয় কড়াও নয়—মিষ্টি মাঝামাঝি, আর প্রেমাঙ্কুরের চা কেমন হবে তা নাকি চা-করিয়ের জানা আছে।

তামাক খাও? মিঠে, না, কড়া? আর তামাকও দিবি, চাকরের দিকে ফিরে বললেন।

দাদা না কি কড়া তাগিদ দিয়েছেন, বললেন প্রেমাঙ্কুর, ব্যাপার কি?

ব্যাপার আবার কি? পথ ভুলে গেছ, তাই মণিলালকে বললাম। জানি আমি ধরে আনতে বললে বেঁধে আনবে।

আমি কিন্তু গেঁথে এনেছি!

ল্যাটা, পুঁটি, না, কুচো চিংড়ি? আমি মন্তব্য করলাম।

কারবারীর কাছে কিছুই ফেল্‌না নয়, বললেন গজেনদা।

চা এল, গুড়গুড়ির উপরকার কল্‌কে বদল হল। বুড়োদার টানার পরে আবার হাঁকলেন গজেনদা। আবার ভৃত্য এসে কলকে বদল করে দিলে, নলটা আতর্থী এগিয়ে দিলেন আমার হাতে।

পান—পান কই? গজেনদার মুখের কথা শেষ হতে না হতেই চাকর উপরে চলে গেল এবং একটু পরেই ডিবে করে পান নিয়ে এসে হাজির, সঙ্গে দোক্তা ও জর্দা।

মণিলাল ও হেমেন্দ্র কোথায়? জিজ্ঞাসা করলেন গজেনদা।

একটু পরেই আসবে বোধ হয়, জবাব দিলেন প্রেমাঙ্কুর।

আর চারুবাবু ত বোধ করি এতক্ষণে শুয়ে পড়েছেন, বললেন গজেনদা।

সুখী সজ্জন লোক, সুশৃঙ্খল জীবনযাপন করেন, বললেন বুড়োদা, আমাদের মতন বেয়াড়া বাউণ্ডুলে লোক ত নন।

বুড়োর বিয়ে নিয়ে একটা কানাঘুসো শুনছিলাম যেন, সেটা কতদূর কি এগোলো? প্রশ্ন করলেন গজেনবাবু।

তাহলে আমাদের কপালে একটা নেমন্তন্ন নাচছে, বললাম আমি।

মোটেই নয়, বললেন গজেনদা, একি তোমার আমার বিয়ে পেয়েছ যে, একেবারে যজ্ঞিবাড়ী। বুড়ো 'তোমার হৃদয় আমার হোক'-করে সেরে দেবে।

আমি বললাম, ভুরি ভোজন ছাড়া বিয়ে আমরা ভাবতেই পারি না।

দুর, সে আবার বিয়ে! বললেন গজেনদা, যাক, সে ভাবনা করো না, বুড়ো যদি শেষ পর্যন্ত বিয়েই করে, আর ভোজটা বাদ দেয়, না হয় আমিই—

কি যেন ভোজের আয়োজনের কথা শুনছিলাম, বলতে বলতে যিনি ঘরে ঢুকলেন তিনি আমার পূর্ব পরিচিত।

কি ব্যাপার, পবিত্র এখানে এসে জুটলে কবে? ভোজের খবর পেয়েছ বুঝি? হাজার হোক, বামুন ত, হাসতে হাসতে ফরাসে উঠে বসলেন করুণানিধান।

বুড়োদার বিয়ের কথা হচ্ছিলো, আমি বললাম।

তা বুড়োরই বা এমন কি গোঁ আছে, বললেন করুণাদা, তোমরা পাঁচজন উৎসাহ করে বলছ, বিয়ে করে ফেলবে ও। আমরা ইতর-জন মিষ্টান্ন পাব।

সে গুড়ে বালি, বললেন গজেনদা, বুড়োর হাবভাব দেখে মনে হয়, বিয়ের মত একটা বেয়াক্কেল কাজ ও কিছুতেই করবে না। আর করলেই যে ইতর জনকে মিষ্টান্ন বিলাবে সে ভরসা আমাদের আদৌ নেই।

কিন্তু দাদা নিজেই ত ভরসা দিয়েছেন, আমি জবাব দিলাম।

আচ্ছা সব পেটুকের পাল্লায় পড়েছি ত? চেঁচিয়ে উঠলেন প্রেমাঙ্কুর, এরা ভুরিভোজন করবে, তার জন্যে আমাকে বিয়ে করতে হবে! বলি, ভোজন যতই গুরু হোক, আজ নয় তা কাল হজম হয়ে যাবেই, বড়জোর একটু জোলাপ! কিন্তু বিয়ে যদি আমার বদহজম হয় তখন কর্তাদের কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে কি? যত সব আদেখলা কাণ্ড।

কিন্তু বিয়েতে কি শুধু বদহজমের ভয় বুড়োদা? মৃদু স্বরে প্রশ্ন করলাম আমি।

এখন জবাব দাও, বলে উঠলেন গজেনদা।

জবাব আর কি? বললেন প্রেমাঙ্কুর আতর্থী। মানলাম, বদহজম কিছুই নেই, সবই মুখরোচক। আর পরিপুষ্টি। বলি বাপু, তাতে তোমাদের কি? সাধে কি বলে পাড়া-পড়শীর ঘুম নেই।

আমরা তাহলে নেহাৎ পাড়া-পড়শীর পর্যায়ে! হেসে বললেন করুণানিধান।

'আর কা তব কান্তা, সংসারই ত মায়া' বলে গুড়গুড়ির নলে একটি টান দিলেন গজেনদা।

এরি জন্যে কি কড়া তাগিদ দিয়ে দাদা আনিয়েছিলেন আমাকে? প্রশ্ন করলেন প্রেমাঙ্কুর। কন্যাদায়গ্রস্ত কেউ এসে আপনাকে ধরেছে না কি?

আমার নিজের দায়ের অন্ত নেই, বললেন গজেনদা। অন্যের দায় নিয়ে মাথা ঘামাব! দায় বরং তুমি। নিজেই বলেছিলে না বেয়াড়া বাউণ্ডুলে! সেই কথার মধ্যে হতাশার সুর একেবারে ছিল না, এমন কি হলফ করে বলতে পার?

দুর্ দুর্! বললেন আতর্থী, বাউণ্ডুলেগিরির মূর্তিমান জয়-জয়কার আমরা। ওরই মধ্যে আমাদের জীবনের পরিপূর্ণতা। তোমাদের গতানুগতিক ভদ্রলোক হতে আমার ত দম আটকে আসে। বিয়েটা হল বদ্ধজীবনের অক্সিজেন সিলিণ্ডার!

ভাল কথা, গজেনদা বললেন, প্রভাতের অসুখের খবর শুনেছিলাম, কেমন আছে জান বুড়ো?

আমি একবার যাই, দেখে আসি, জবাবে বললেন প্রেমাঙ্কুর।

খবরটা তোমার কাছে তাহলে পাব, বললেন গজেনদা।

প্রেমাঙ্কুর বেরিয়ে গেলেন। গজেনদা বলে উঠলেন, কাণ্ডটা দেখলে মণিবাবুর আর হেমেন্দ্রর? এলই না একবার।

করুণাদা বললেন, তাঁরা সময়মত ঠিকই আসবেন। এখন তাঁদের কথা মনে হচ্ছে, তাঁরা এলে তখন আবার আর যারা আসেনি তাদের কথা ভাববেন। সুর করে করুণাদা বললেন, আপনার অবস্থা হয়েছে—

ফাল্গুন-রাতে দক্ষিণা বায়ে
কোথা দিশা খুঁজে পাই না,
যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই,
যাহা পাই তাহা চাই না।

রবিবার সকালের দিকেই বেরিয়ে পড়েছি। শ্যামবাজারের দিকে এসে পড়েছিলাম, মনে হল, কান্তি ঘোষের সঙ্গে খানিকটা গল্প করে যাই। তাঁকে বাড়ী না পেয়ে আবার দক্ষিণগামী ট্রামে উঠে পড়লাম—একেবারে উদ্দেশ্যবিহীন।

ঠনঠনে কালীতলার সামনে দেখি আমাদের দাদা পণ্ডিত নলিনীরঞ্জন যথারীতি বই-কাগজ-পত্র-পত্রিকার বাণ্ডিল বগলদাবা করে চলেছেন। আমি ট্রাম থেকে নেমে পড়লাম। যাহোক, কাজ পাওয়া গেল কিছু সকাল বেলায়।

নলিনীদার কাছে এসে পৌঁছুতেই তিনি হেসে প্রশ্ন করলেন, কোথায় চলেছ ভায়া?

কোথাও না। বেকার হয়ে ঘুরছিলাম।

তাহলে চল না আমার সঙ্গে, ওই ত নরেন দেবের বাড়ী।

মানে, ভারতবর্ষ-এর নরেন দেব? নিশ্চয়ই যাব।

কালী-মন্দির ডান দিকে রেখে দু কদম পশ্চিমে এগোতেই বাঁ পাশে নরেন দেবের বাড়ী। সামনে প্রাচীর, দুপাশে গেট। গেট পেরিয়ে ক'পা এগিয়ে গেলেই সদর দরজা। ভিতরে ঢুকতেই দুপাশে দুসারি ফালি রোয়াক,

সেখানে তখনও চায়ের আসর জমে আছে। অনেকেরই হাতে কলাইয়ের কাপ, বিরাট কলাইয়ের কেৎলী থেকে চা পরিবেশন করা হচ্ছে। শুধু চা-ই নয়, আনুষঙ্গিক খোসগল্পও চলছে জমাট ভাবে। নলিনীদা সেই জনতা পেরিয়ে ভিতরে ঢুকছেন, আমি আছি পিছনে পিছনে। এঁদের মধ্যে এক-জন কুশল প্রশ্ন করলেন, বললেন, যান, নরেন ঘরেই আছে।

দু ধাপ সিঁড়ি ভেঙে ডান দিকের ঘরে ঢুকলাম। লম্বা ঘর, আসবাবের বাহুল্য নেই। দেয়ালের ছবি এক দিকে ঝুলে পড়েছে, এখানে ওখানে ঝুল জমে আছে, একপাশে কতকগুলি সিমেণ্টের বস্তা। ঘরের পরিবেশে পুরনো বনেদিয়ানা আছে, কিন্তু তার সংরক্ষণে নিপুণ পারিপাট্য নেই। একপাশে ছোট তক্তপোশের উপর ফরাশ বিছানো। সেই ফরাশে বসে পাশের টেবিলে রেখে কি যেন লিখছিলেন নরেনদা।

আমরা ঘরে ঢুকতেই হাতের কলম রেখে সোজা হয়ে বসে বললেন, এসো পণ্ডিত।

তাঁর গুরু গোঁফ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল লঘু হাস্যে। বগলে বই-কাগজ ত এক গাদা নিয়েছ, বইয়ের বোঝা বইতে ভাল লাগে নিশ্চয় তোমার। যাহোক, সঙ্গে করে একজন নতুন লোকও নিয়ে এসেছ দেখছি।

আমারি মত ভ্যাগাবণ্ড, বললেন নলিনীদা। হপ্তায় চার পাঁচ দিন সবুজপত্র এর কাছারিতে খানিকটা কাজ করতে হয় ওকে, আর বাকী সময় আড্ডার সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়।

বটে! হেসে উঠলেন নরেনদা। আড্ডায় কি আমিই ভয় পাই?

তুমি আর সে কথা বলো না ভাই, বললেন নলিনীদা, কোন দিন আপিস যেতে পাঁচ মিনিট দেরি করেছ? জ্বর নিয়েও আপিস যাও, বাইরের কোন প্রয়োজনে আপিসের কাজ এতটুকু অবহেলা করতে পেরেছ কোন দিন? চাকরি আমরাও করি।

আমি অত বুঝি না পণ্ডিত, গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দেন নরেনদা, যারা আমার কাজের জন্যে দাম দেয়, তাদের কেনা-সময়টুকু তাদের জন্যেই পুরোপুরি রেখে দিতে চাই। কিন্তু তার বাইরে আমি আমার অধীশ্বর।

বেশ ত, বললেন নলিনীদা, অধীশ্বরের ছত্রছায়ায় আপাতত আমরা কিছুক্ষণ বিশ্রাম করি, পবিত্র ভায়াও নতুন আড্ডার সন্ধান নিয়ে যাক।

আমার ত মনে হচ্ছে, নরেনদা হেসে বললেন, তুমি স্নেহাধিক্য বশত

পবিত্রবাবুর উপর একটু অবিচার করছ—যেন কাছারিতে চিনির বলদগিরি করা আর আড্ডায় অকারণ গুলতানি করা ছাড়া সাহিত্যের সঙ্গে কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই ওর।

এবার আমি মুখ খুললাম, প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে কি-না সে বিষয়ে আমার নিজের সন্দেহই সব চেয়ে বেশী। বিশেষ করে, কবি এবং সাহিত্যিকদের প্রতি এমন একটা ব্যক্তিগত আকর্ষণ বোধ করি যে, সাহিত্যের কথা মনেই থাকে না। তাঁদের সঙ্গে আড্ডার লোভই হয়ে ওঠে বড়।

এখন ত্যাখো নরেন, নলিনীদা বললেন, আমার অভিযোগ ও নিজেই স্বীকার করে নিচ্ছে।

চালাক লোক, বললেন নরেনদা, গিল্টি প্লীড্ করায় অনেক মামলায় আসামীর সুবিধা হয়। নইলে বলুন ত পবিত্রবাবু, আপনি কলম ধরেন কি না।

নিশ্চয় ধরি, আমি বললাম, প্রুফ দেখতে, চিঠি-পত্রের জবাব দিতে কলম ধরতেই হয়। সাহিত্য-রচনার প্রয়াস যেটুকু করেছি তা এত নগণ্য ও ব্যর্থ যে, তাকে জীবন থেকে বাদ দিয়ে দিতে পারি অনায়াসেই।

একটু ভুল হয়ে গেল পবিত্র, নলিনীদা কথা কইলেন, বাদ কিছুই যায় না। তুমি যে মুনশীগিরি করছ আর আড্ডা দিচ্ছ এতে তোমার জীবনের মশলা সংগ্রহ হচ্ছে, একদিন যদি তা সাহিত্য হয়ে ফুটে বেরুবার অবকাশ পায় তা হলে বস্তু অন্তত থাকবে কিছু তার মধ্যে।

সাহিত্য-সৃষ্টির আগ্রহ আমি তেমন অনুভব করি না, আমি বললাম, বোধ হয় যোগ্যতা নেই বলেই। জীবনকে অনুভব করবার, মানুষকে বুঝবার এবং ভালবাসবার এমন তীব্র আগ্রহ বোধ করি যে তার কাছে আর সব কিছু চাপা পড়ে যায়। সাহিত্যের মারফতে নিজেকে তুলে ধরার মত কিছুই খুঁজে পাই নে নিজের মধ্যে।

আরে ভায়া, নরেনদা বললেন, এই কথাগুলোই ত ছন্দে ফেললে কবিতা হয়ে ওঠে। কবিরা কি আর অবাস্তব আকাশ-কুসুম রচনা করেন? যে-কোন গভীর অনুভূতির ছন্দে প্রকাশই কাব্য।

অনুভব করতে পারি ঠিকই, বললাম আমি, হয় ত আড্ডায় বসে সেই অনুভূতি প্রকাশ করবার যে চেষ্টা করি তাও সব সময় ব্যর্থ হয় না, কিন্তু গুছিয়ে লেখা—তাও ছন্দে—তাতে যে ধৈর্যের প্রয়োজন, তা আমার ধাতে সয়

না। বসন্তের হাওয়া যখন বইতে থাকে তখন সেই অনুভূতিকে কবিতায় গাঁথবার জন্য আমি ঘরে বসে মাথা ব্যথা করব না কোন দিন, আমি বেরিয়ে পড়ব সেই হাওয়ায়, অনুভূতির হিল্লোল মনের ভিতরই তোলপাড় করবে; অন্তত সেই মুহূর্ত কয়টা সার্থক হবে জীবনে।

এটা তোমার নেহাৎ স্বার্থপরের মত কথা হল পবিত্র, বললেন নলিনীদা, অনুভূতির আনন্দ তোমার একার, সাহিত্যে সে অনুভূতি প্রকাশিত হলে তার রস পাবে সকলে।

কিন্তু পণ্ডিত, নরেনদা আমাকে সমর্থন করে বললেন, হৃদয় যখন উদ্বেল তখন বোধ হয় সে অনুভূতি ভাষায় গাঁথা যায় না। তারপরে যখন মনে আসে স্থিরতা, তখনই মাপাজোখা সম্ভব এবং তাকে কবিতায় ও সাহিত্যে রূপ দেওয়া যায়। বিশেষ করে, উদ্বেল হৃদয়ের আবোল-তাবোল ভাবধারাকে সাহিত্যে প্রকাশের সময়ে যে ভাবে ঘষে মেজে নিতে হয় তাতেও স্থিরবুদ্ধি প্রয়োগ করা দরকার।

সাহিত্য-রচনার ব্যাকরণে এটাই শেষ কথা নয়, নরেন, বললেন নলিনীদা, মনের মধ্যে যখন ভাবের বন্যা আসে, তা থিতিয়ে যাওয়ার জন্যে অপেক্ষা করতে করতে সে ভাবের আর কোন খোঁজ নাও পাওয়া যেতে পারে।

তা ত যাবেই না, বললেন নরেনদা, তাই সংসারে কবি অনেক, কাব্য অনেক কম।

আমি বললাম, কাব্য রচনা না করেও শুধু অনুভূতির জোরেই কবি হওয়ার আনন্দ আমার। না-ই বা হল দেশজোড়া খ্যাতি, না-ই বা সে অনুভূতি চিরন্তন হয়ে রইল ছন্দে গাঁথা হয়ে। অনুভূতি যে মনে এসেছিল, সমগ্র সত্তাকে চঞ্চল করেছিল, সে-ই ত সত্য, সেই আনন্দ ক্ষণস্থায়ী হলেও নিবিড়।

গল্পে গল্পে ভিতরে খবর দিতে ভুলে গেছি, বললেন নরেনদা, সকাল বেলা শুকনো ঠোঁটে বাগাড়ম্বর চলেছে। একটু চায়ের দরকার নিশ্চয়ই।

ওরে, বলে একটা চীৎকার করতেই একজন আধা-বয়সী চাকর ঘরে ঢুকে চায়ের নির্দেশ নিয়ে গেল।

নলিনীদা বললেন, জলধরদার সঙ্গে অনেক দিন দেখা করতে পারি নি। কেমন আছেন?

তিনি ভালই আছেন, নরেনদা বললেন, চুরুটটুকরো যতক্ষণ তাঁর হাতে

আছে—তা জলাই হোক আর নেভাই হোক—তাঁর মৌতাত কেউ নষ্ট করতে পারে না। তা ছাড়া, জান ত পণ্ডিত, যে-ই যত বকর বকর করুক, আর যত কোলাহলই চলুক চার পাশে, দাদার আমাদের সমাধি ভঙ্গ হয় না তাতে, কানে তোলেনই না কিছু।

শুনেছি এডিসন বলেছেন যে, তিনি কানে খাটো বলেই একাগ্রচিত্তে কাজ করতে পেরেছেন, বাইরের কোলাহল তাঁকে বিব্রত করতে পারে নি।

জলধরবাবু বুঝি কানে একটু খাটো? জিজ্ঞাসা করে বসলাম।

আরে দুর্, হেসে উঠলেন নরেনদা, ওসব দুর্জনের কথায় কান দিও না। দাদার ওটা আত্মস্থ হওয়ার একটা সহজ আবেষ্টনীমাত্র।

চায়ে ঠোঁট ভিজল, কিন্তু জমাটি আড্ডা গেল পাতলা হয়ে। নলিনীদা উঠি-উঠি করতে লাগলেন, বইপত্রের বাণ্ডিল বগলদাবা করতেই ধম্‌কে উঠলেন নরেনদা, এরি মধ্যে পালাচ্ছ কি।

কাজ আছে ভাই, একবার শাস্ত্রী মহাশয়ের কাছে যাব। দশটা বাজলো।

যত দোষ হল নরেনের, না? সে ঘড়ি ধরে আপিস করে। আর তুমি যে আড্ডা দিতেও ঘড়ি ছাখো পণ্ডিত!

পণ্ডিতকে আর ঠেকানো গেল না। তিনি উঠে পড়েছেন ত উঠেই পড়েছেন। নরেনদা টিপ্পনী কাটলেন, আজকের পত্রিকাখানাও বগলে আছে দেখছি, রোজকার মতন আজও ওখানা অপঠিতই থেকে যাবে?

কি করব বল ভাই, নলিনীদার মুখে কেমন অসহায়ের ভাব, পড়ব বলেই ত নিয়ে বের হই রোজ, কিন্তু কিছুতেই পড়া আর হয়ে ওঠে না।

অতি আগ্রহের গলায় দড়ি, হো হো করে হেসে উঠলেন নরেনদা। পবিত্রবাবুকেও কি নিয়ে যাচ্ছ নাকি সঙ্গে করে? উনিও যে উঠছেন দেখছি।

আমি ওর গার্জেন নই, নলিনীদা মন্তব্য করলেন।

তবুও দাদার পিছন-পিছন থাকাই ভাল, বলে আমিও উঠলাম।

হ্যাঁ, তা হলে একলা বিদেশে যেতেও ভয় হয় না! নরেনদার গোঁফ জোড়াটা পর্যন্ত হেসে উঠল।

বেরিয়ে আসবার সময় গেটের ধারে আবার সেই সহাস্য কুশল প্রশ্ন: দেখা হল।

প্রথম দর্শনেই এই একটুখানি হাসি ও কথার মধ্যে কি যেন আকর্ষণ বোধ

করলাম ওই ভদ্র লোকের প্রতি, তাঁর শ্মশ্রুবিশিষ্ট মুখমণ্ডলের সৌম্যভাব আমার মনে আগ্রহের সৃষ্টি করল। নলিনীদাকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করলাম, বললেন, নরেনের জ্যাঠতুত দাদা, রাজেন দেব। নিষ্ঠাবান্ স্বদেশী, সংসার করেন নি। কংগ্রেস নিয়েই আছেন।

পণ্ডিত মহাশয়ের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হওয়ার আগেই জিজ্ঞাসা করলাম, জলধরদার বাড়ী যাবেন বলছিলেন ? আমি সঙ্গে যাব।

বেশ ত, নলিনীদা জবাব দিলেন, বিকেলের দিকে পরিষদে এসো, সেখান থেকেই সন্ধ্যার পর যাওয়া যাবে। কাছেই ত।

বিকেলের দিকে পরিষদে এসে হাজির হলাম। রবিবারের আসর তখন জমজমাট। ওঘরে শাস্ত্রী মহাশয়, ত্রিবেদী মহাশয়, টাকির যতীন্দ্রনাথ—এঁরা ত আছেনই, এ ঘরেও কেউ অনুপস্থিত নেই। রামকমলদা, পণ্ডিত মহাশয়, হেম ঘোষ, বাণীনাথ নন্দী, সূর্য পাল—যে যার কাজে নিরত, কিন্তু তার মধ্যেই অকাজের কথা বিনিময় চলছে। একই সঙ্গে কাজ ও আড্ডার অনবদ্য নিদর্শন।

বাণীবাবু বয়সে প্রবীণ কিন্তু কর্মনিষ্ঠায় নবীনদের হার মানান। আমাকে ঢুকতে দেখে সেই যে একবার বললেন, কতদিন বাদে এলেন পবিত্রবাবু, ওর পরে জবাবের প্রত্যাশা পর্যন্ত না করেই চিঠিপত্রের উত্তর লিখতে শুরু করলেন।

বিপদ হল দেখছি, একে ত আজ কম এনেছি, তায় লুঠেরা এসে ঢুকল! কোনায় বসে খাতায় কলমে বিচ্ছেদ না ঘটিয়েই বলে উঠলেন সূর্যবাবু।

লুঠেরা আবার কাকে দেখলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম। আর কে আসচে যাচ্ছে সে দিকে অত মন দিলে হিসেব ভুল হয়ে যাবে যে!

ওইটি ঠিক হল না ভায়া, য়্যাকউন্টেন্টের শুধু হিসেব রাখলেই চলে না, সম্পত্তি কি করে নিরাপদ থাকে, সেদিকেও হুঁশিয়ার থাকতে হয়।

আমি কাছে গিয়ে পড়তেই টেবিলের দেরাজ থেকে পানের ডিবেটা বার করে খুলে ধরলেন, বললেন, না নিয়ে ত ছাড়বেন না, যত নিরুপদ্রবে দেওয়া যায়, ততই মঙ্গল।

আমি হাত বাড়িয়ে কৌটাটা বন্ধ করে দিয়ে বললাম, চায়ের পরে পান খাব। আপাতত খইনি দিয়ে মৌতাত জমাচ্ছি।

চা, পান, সিগারেট, খইনি—ভায়ার আর কি কি চলে? জিজ্ঞাসা করলেন হেমদা।

বিড়ি চুরুট ত চলেই, আর মানুষের গ্রাহ্য যা-কিছু নেশার বস্তু, তার কিছুর প্রতিই আমার বৈরাগ্য নেই, যদি বামুনের ছেলে হাত পেতে পাই।

তা হলে এক টিপ ভট্টাচার্যের কড়া নস্যি নাও ভায়া, পকেট থেকে ডিবেটি বার করে এগিয়ে দিলেন হেমদা।

ওরে বাব্বাঃ! আমি প্রায় আঁতকে উঠলাম। এই নস্যি নাকে দিয়ে আমি যদি হাঁচতে শুরু করি এখনই ওঘর থেকে সকলে ছুটে আসবেন।

রসিকতা ত অনেক হচ্ছে, বললেন রামকমলদা, কিন্তু পবিত্রর কদিন বাদে আসা হল? মাঝে মাঝে যে একেবারে ডুব দাও?

কি জানি রামকমলদা, কি এক নেশার ভরে চলি আমি। যেখানে আড্ডা জুটে যায়, সেখানেই জমে যাই। আর আড্ডার জায়গা বাড়িয়েও আমার সাধ মেটে না।

তা বলে জলধরদার সঙ্গে আড্ডা খুব জমবে না, সাবধান করে দিচ্ছি, বললেন নলিনীদা।

ও, জলধরবাবুর কাছে যাবে তুমি? রামকমলদা প্রশ্ন করলেন। ঘাটে ঘাটে ঘুরে তোমার আর শখ মেটে না। ওখানে সুবিধে হবে না। জলধরদার দরজা তাঁর বুকের মতই দরাজ—খোলা, কিন্তু তিনি স্বল্পভাষী লোক। কথা বলার কার্পণ্য তাঁর স্বভাবসিদ্ধ, কিন্তু শুনতেও কার্পণ্য, সেটা অবশ্য নিরুপায় হয়ে।

নলিনীদার সঙ্গে বেরিয়ে বীডন স্ট্রীট ধরে পশ্চিম মুখো রওনা হলাম। হেদো পার হয়ে বাঁ দিকে মোড় ফিরতেই জিজ্ঞাসা করলাম, এই আপনার 'কাছেই' নলিনীদা?

আরে এ আর ক' পা? আর ত এসে পড়েছি।

গজেনদার বাড়ীর গা দিয়ে গলিতে ঢুকলাম। দেখলাম রামকমলদার কথাই ঠিক—দরজা খোলা। জোড়া তক্তপোশের উপর বসে খালি গায়ে আধপোড়া চুরুট টানছেন জলধরদা একা বসে। কৃষ্ণকায় নধর খর্ব দেহ, কেশবিরল মস্তকে বয়স শুভ্রতা নিয়ে ফুটে উঠেছে। মুখের চেহারা করুণ, ডান দিকে কাঁচা পাকা ভুরুর উপরে একটি ছোট আব, তাতে করুণ ভাব আরো বেশী মনে হয়। করুণ চিত্র অঙ্কনে তাঁর দক্ষতা ও প্রবণতার সঙ্গে

পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য চোখে পড়ল। স্বল্পভাষী, শ্রবণেও কার্পণ্য, তারই জন্যে তাঁকে ঘিরে জটলা বসে না কি-না জানি না, তবুও একজন বর্ষীয়ান ও সজ্জন সাহিত্যিককে একা একা বসে থাকতে দেখে আমার বেদনা বোধ হল। একা একা বসেই উনি নীরবে মানুষের বেদনাকে অনুভব করতে চান কি-না তাও বুঝতে পারলাম না।

চোখ তুলে একবার আগন্তুকের দিকে তাকালেন। বললেন, নলিনী, অনেকদিন পরে যে! কি মনে করে?

কাছাকাছি এগিয়ে গিয়ে নলিনীদা জবাব দিলেন, এমনিই দেখা করতে এলাম, কেমন আছেন জেনে যাব বলে।

আমি আর ভাল থাকব না কেন বল, ধীরে ও মৃদুস্বরে জবাব দিলেন জলধরদা। তোমরা পাঁচজন ভাল থাকলেই আমার ভাল থাকা।

সঙ্গে করে যাকে নিয়ে এসেছি, তাকে চেনেন নিশ্চয়ই, নলিনীদা বললেন।

না ত, জলধরদার মুখে কেমন বিহ্বল ভাব।

নলিনীদা আমার পরিচয় দিতেই বলে উঠলেন ওহ্, এর কথা শুনেছি আমি চারুর কাছে।

চারু বাড়ুজ্যে? আমি প্রশ্ন করলাম।

না হে না, বললেন নলিনীদা বাড়ুজ্যের এখানে যাতায়াত নেই। জলধরদার মুখে চারু নামের অর্থ চারু মিত্তির।

তাঁকে ত আমি চিনি না, আমি জবাব করলাম।

না-ই বা চিনলে, বলেই জলধরদাকে প্রশ্ন করলেন নলিনীদা, চারু একে চিনলো কেমন করে?

প্রভাতের কাছে শুনেছে এর কথা, জলধরদা বললেন! তা আপনার নিবাস কোথায়?

আমি স্বগ্রামের উল্লেখ করার পরে জলধরদা এক এক করে আমার বংশ ও পিতৃপরিচয় এবং পারিবারিক খবর ইত্যাদি সব জেনে নিলেন। মানুষের পূর্ণ পরিচয় গ্রহণে স্বল্পভাষী দাদারও কোন বাক্‌কার্পণ্য দেখলাম না।

মাসিকপত্রের কাজকর্ম ভাল লাগে? দাদা জিজ্ঞাসা করলেন।

ভালো লাগালেই ভালো, আমি জবাব করলাম। কাজের মধ্যে আমি ভালটুকুই খুঁজি, যেমন একটা মাসিকপত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছি বলেই ঘুরে

ঘুরে আপনাদের মত সাহিত্যিকদের বাড়ী এসে এসে ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলি। এইটাই ত মস্ত বড় লাভ।

লাভ আর কি বলুন, বলেই তিনি চুপচাপ চুরুট টানতে লাগলেন।

আমি নলিনীদাকে চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করলাম, ওঁর হিমালয়ের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে আমি কিছু জানতে চাইলে কিছু অন্যায় হবে কি?

কেন বকাবে বুড়ো মানুষকে, বিশেষ করে কথা না বলতেই যখন উনি ভালবাসেন।

ওইতেই আমার আনন্দ নলিনীদা। আমি সাগ্রহে বললাম, ভালবাসিয়ে ওকে যদি কথা বলাতে পারি, কিছুটা জয়ের আনন্দ পাব না কি?

এমন সময় তালতলায় চটি পায়ে এক ভদ্রলোক এসে ঘরে ঢুকলেন, মুখ থেকে চুরুটটা নামিয়ে বলে উঠলেন, দাদার ঘরে যে অনেক লোকসমাগম দেখছি।

অনেক দেখলেন কোথায়? বললেন নলিনীদা, আপনি যখন থাকেন তখন দুজন, এখন না হয় তিনজন। তাকেই আপনি জনতার পর্যায়ভুক্ত করে ফেললেন? অবশ্য আপনাকে নিয়ে চারজন হল।

একটা কথা ভুলে যাচ্ছেন পণ্ডিত মহাশয়, হেসে বললেন নবাগত, নলিনী পণ্ডিত একাই যে একশ!

পণ্ডিত একাই একশ হবে এমন কি ক্ষমতা আছে তার? বললেন নলিনীদা। বরং আপনি রক্তবীজের মত বাক্যবীজ। অন্তত, সাহিত্যিকদের বাজার-চাউড় করতে আপনি সিদ্ধহস্ত।

সেটা কি বাক্যের জোরে? ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন।

তা নয়, নলিনীদা বললেন, সেটা আপনার সম্পাদনার জোরে।

আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে নলিনীদার মুখের দিকে তাকালাম।

আরে, তুমি চেনো না ওকে? ফণী পাল, 'যমুনা'র সম্পাদক। এক নিঃশ্বাসে নলিনীদা ভদ্রলোকের পরিচয় দিলেন।

প্রথম যুগে শরৎচন্দ্রের রচনা আপনিই ত পত্রস্থ করেছিলেন, আমি বললাম।

পণ্ডিতমশায়দের কাছে সেইটেই ত আমার একটা মস্ত বড় অপরাধ, বললেন ফণীবাবু। এখন ত শরৎচন্দ্র দাদার পকেটে, আর কারুরই কাছ ঘেঁষবার জো নেই।

বড় ঔপন্যাসিক বড় কাগজে লিখবেন—এ ত স্বাভাবিক, আমি বললাম, কিন্তু একদিনেই কেউ বড় হয় না, বড়র সম্ভাবনা বুঝতে পেরে গোড়ায় তাঁকে স্বীকৃতি দেওয়ার যে কৃতিত্ব, সেটা আপনারই। শরৎচন্দ্রের বেলায় সেই দাবিটুকুর মূল্য অনেকখানি। আর কোন সম্পাদক তাঁকে চিনবার আগেই আপনি চিনেছিলেন।

চিনেছিলেন হয় ত আরো অনেকেই, গর্বের সঙ্গে বললেন ফণীবাবু। কিন্তু তাঁকে স্বীকৃতি দেওয়ার সাহস হয় নি কারুর। স্বয়ং সমাজপতি, সত্যনিষ্ঠায় যিনি কখনো কাউকে গ্রাহ্য করেন নি, 'চরিত্রহীন'-এর পাণ্ডু-লিপি পড়ে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু 'সাহিত্য'-এ তা প্রকাশ করবার সাহস পান নি।

বলেন কি ফণীবাবু, নলিনীদা বিস্ময় প্রকাশ করলেন।

শুধু কি তাই, 'নারীর মূল্য' প্রকাশের জন্য শরৎবাবু ওরফে অনিলা দেবীকে কম বেগ পেতে হয় নি। কোন নারীর নাম দিয়ে অতখানি দম্ভ ও ধৃষ্টতাপূর্ণ আত্মাধিকার প্রচার সহ্য করার জন্যে তৈরী ছিল না কেউ। সম্পাদক হিসেবে নামী ও বেনামী অনেক গালাগাল আমার কাছে পৌঁছেছে। আমি ভয় খাই নি।

বাঙলার কথাসাহিত্যের ইতিহাসে নিশ্চয়ই আপনার ভূমিকা অমর হয়ে থাকবে। আমি বললাম।

অমর কিছুই নয়। সবই নলিনীদলবৎ; নইলে হেমেন্দ্রকুমারও আজ 'ভারতী'র দলে ভিড়ে আমাকে একেবারে ত্যাগ করে যান। তাঁর রচনাও শরৎচন্দ্রের পাশাপাশি আমি ছাপিয়েছি।

ফণীবাবুর যেন আপসোস হচ্ছে? নলিনীদা মন্তব্য করলেন।

কিছু না, উদাসভাবে বললেন ফণীবাবু, আমি আমার কাজ করে যাই, আর মাঝে মাঝে দাদার কাছে এসে জোড়ে চুরুট টানি। কোন সাতে-পাঁচে নেই আমি।

জলধরদা কিন্তু এর মধ্যে একটা কথাও বললেন না। নির্বিকার ভাবে চুরুট ফুঁকে চললেন।

একদিন 'ভারতী'র আড্ডায় নরেনদার সঙ্গে দেখা। কথায় কথায় বললেন, শরৎদার সঙ্গে অনেক দিন দেখা করি নি বলে তিনি নাকি অনুযোগ

করেছেন। কাজেই রবিবার দুপুরের দিকে বাজে-শিবপুর এসে হাজির হলাম।

ইজিচেয়ারে বসে একা একা শরৎদা গড়গড়া টানছিলেন। কড়া নাড়তেই ভোলা এসে দরজা খুলে দিল। এই ভোলা একাধারে দাদার ভৃত্য, সচিব ও খাজাঞ্চি।

আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখেই দাদা বলে উঠলেন, কিহে বালিগঞ্জের লোক, বাজে পাড়া মাড়াবারই সুযোগ হয় না!

আমি জবাব করলাম, আমি যে চুনাপুকুরের চুনোপুঁটি, সে ত আপনি জানেন। বালিগঞ্জের ব্র্যাণ্ড দিয়ে আমার আভিজাত্য বাড়াতে চাইলেই কি তা বাড়বে!

সে বাড়ীর আভিজাত্য সম্পর্কে কোন প্রশ্ন বা সংশয় থাকতেই পারে না, বললেন শরৎদা, সে আভিজাত্য শুধু বইয়ের চমক নয়, সে আভিজাত্য মগজের, রুচির এবং সংস্কৃতির। আমি 'গাটার' থেকে উঠেছি বলেই তাকে চ্যালেঞ্জ করব—এতখানি স্পর্ধা আমার নেই। তবু আশ্চর্য লাগে পবিত্র, প্রমথ চৌধুরীকে গালাগাল দেওয়ার লোক বাঙলার বিদ্বৎসমাজে আজো আছে!

সংস্কৃত-ঘেঁষা ভাষাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে দক্ষিণবঙ্গের চলতি কথাকে সাহিত্যের মর্যাদা দিয়েছেন তিনি—এইটেই পণ্ডিতদের কাছে যথেষ্ট অপরাধ।

আমার মুশকিল কি হয় জান? বললেন শরৎদা, বাইরের লোকে যখন তাঁকে গালিগালাজ করে তখন আমার বড় লাগে, কারণ ওঁর লেখার আমি একজন ভক্ত। বোধ হয় একটু বেশী রকমই পক্ষপাতী। তাই দু পক্ষের লেখাই আমি মনোযোগ দিয়ে পড়ি। কিন্তু বিপদ হয় এই যে, না পারি ঠাওরাতে তাঁদের রাগের কারণ, না পারি বুঝতে চৌধুরী মশায় কি বুঝিয়ে বলেন। এ সব তর্কাতর্কি যে খুব উচ্চাঙ্গের হয়, তাতে আমার এতটুকু সংশয় নেই। ছাপার হরফে ওঁদের বাদানুবাদের একটা অক্ষরও আমার মাথায় ঢোকে না। মোটা বুদ্ধিতে কোন জিনিস সূক্ষ্ম করে বুঝতে না পারলে বোঝাই হয় না।

আমি বললাম, এক দিন দেখা করলেই পারেন, ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যায়।

দেখা যে করি নি, তা নয়, বললেন শরৎদা, সে কথা ত তুমি জান! কিন্তু আসল ব্যাপারটা হল, আমি লেখাপড়া শিখি নি। ইংরিজি ভাল পড়া-শুনা না থাকলে সমালোচনার ধারা ঠিক বুঝে ওঠা যায় না। এ অভ্যাসটাও শিক্ষাসাপেক্ষ।

এ কথা আমি মানতে পারলাম না দাদা। দাদার কথায় বাধা দিলাম আমি। জীবনের অভিজ্ঞতা ও গভীর জীবন-বোধ থেকে সব কিছু নিজের মত করে বোঝা যায়। সে বোঝার মূল্য অনেক বেশী। কারণ তা ফর্মায় ফেলা চর্বিতচর্বণ হয়ে ওঠে না।

কিন্তু পবিত্র, সব কিছুই জীবনের অভিজ্ঞতার আওতায় পড়ে না। অভিজ্ঞতার বাইরে যা-কিছু, তার ভিতর এক পাও ঢুকতে পারে না তারা, যাদের দৃষ্টি বড় বড় সমালোচনা পড়ে স্বচ্ছ হয় নি। কপাট যে বন্ধ, সে যে বাইরে দাঁড়িয়ে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে শুধু কপাটের পানে চেয়ে আছে, এও ঠাওর পায় না। মনে করে, কথার মানেগুলি যখন বুঝতে পারছি, তখন সমস্তই বুঝেছি। এ কথা ত অস্বীকার করে লাভ নেই যে, বাঙলা ভাষায় সমালোচনার বইও নেই, আর তা শেখবার বালাইও নেই।

আপনি যে অত অজ্ঞতার ভান করছেন, আমি হেসে বললাম, কতখানি বিদ্যা থাকলে এত বিশ্লেষণ করে ব্যাপারটাকে প্রকাশ করা যায়—তাই ভাবছি অবাক হয়ে।

তুমি আমায় আরও অবাক করলে পবিত্র, শরৎদার মুখের হাসিতে মনের অসংকোচ স্বীকৃতি প্রকাশ পেল। আমি যে জ্ঞানী ব্যক্তি, এ কথা আমার অতিবড় বন্ধু বা ভক্তও বলবে না। তবে বিদ্বান লোকেদের সঙ্গে মেলামেশা যেটুকু করেছি, তার সুফল কিছু ফলেছে বই-কি। অনেক কিছু শুনেছি এবং শিখেছি তাঁদের মুখ থেকে। তুমিই কি অস্বীকার করতে পারবে ভাই, যে, বালিগঞ্জের বিদ্বৎসংসর্গে তোমারও জ্ঞান অনেক বেড়েছে?

এমন সময় গিরিজাদা এসে ঘরে ঢুকলেন।

ভাখো গিরিজা, শরৎদা বললেন, এই বালিগঞ্জের ছেলে আমার উপর আভিজাত্যের প্রলেপ চড়াতে চাইছে। তুমি ব্রাত্য গঙ্গাপারের প্রতিবেশী, আমার জাতের খবর তোমার ঢের বেশী জানা আছে।

আমি গিরিজাদাকে কৈফিয়ৎ দিতে চেষ্টা করলাম। এক নম্বর, আমি বালিগঞ্জের ছেলে নই; দু নম্বর, আভিজাত্যের পর্যায়ে তুলবার চেষ্টা

করলেই শরৎদার জাত মারা যায় না—এ আমি জানি। বললাম, দাদা দুঃখী মানুষের জাত-বন্ধু, বোবা জীবেরও ব্যথার ব্যথী। তাঁর জন্যে এর চেয়ে বড় আভিজাত্য কল্পনা করব এমন বাতুল আমি নই। তবে আজকাল যেরকম মন দিয়ে দাদা চৌধুরী মশায়ের লেখা পড়ছেন তাতে বুদ্ধিপ্রধান রচনার দিকে ওঁর মন টানছে—এমন সন্দেহ জাগছে আমার মনে।

ছাখো, বললেন দাদা, বুদ্ধি মানুষের মধ্যে জোর করে ঢোকানো যায় না, তা থাকে অল্প কয়েক জনের; কিন্তু মন বলে পদার্থটা প্রত্যেকেরই আছে—তা উদারই হোক, আর সঙ্কীর্ণই হোক। তার সুখ দুঃখকে কোন মতেই অবজ্ঞা বা উপেক্ষা করা চলে না। বিচার করতে বসলে কেউ ফুল মার্ক পায় না দুনিয়ায়, কিন্তু ভালবাসার চোখে অতি সাধারণও অসাধারণ হয়ে ওঠে। বোধ হয় ওইখানেই বুদ্ধির চেয়ে হৃদয়ের প্রতি আমার পক্ষপাতিত্ব।

কিন্তু বুদ্ধি দিয়ে ভালবাসা যায় না, এমন কথাই বা আমি মানি কেমন করে? আমি বললাম।

বুদ্ধি প্রয়োগ করলেই বিচার এসে পড়তে বাধ্য, গিরিজাদা মন্তব্য করলেন। বিচার যদি চুলচেরা নাও হয়, তবুও মোটামুটি দোষগুণ তফাৎ করা ত হবেই এবং দোষের নিন্দা স্বভাবতই এসে পড়বে।

এই ধর, চৌধুরী মশায়ের 'বড়বাবুর বড়দিন' পড়েছ? জিজ্ঞাসা করলেন দাদা। উত্তরের প্রত্যাশা না করেই বলে চললেন, আমার কিন্তু ভালো লাগেনি। পাঁচকড়িবাবু যাকে মুনশীআনা বলেন, তাতে লেখাটি আগাগোড়া ভরা। একটা চরিত্রকে বাঁদর বানিয়ে তোলার অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশ পেয়েছে এর মধ্যে। বিদ্রূপ-ব্যঙ্গের খোঁচায় মানুষের বিশেষ কোন একটা বাঁদরামি প্রবৃত্তিকে পাঠকের কাছে 'রিডিক্লাস' করে তুলতে চৌধুরী মশায়ের অসাধারণ দক্ষতা। কিন্তু মানুষকে মানুষ করে দেখাবার ক্ষমতা ওঁর আরো অনেক বেশী। তবুও মনে হয়, বুদ্ধির প্রখরতায় হৃদয়াবেগকে চাপা দেওয়ার চেষ্টায় মাঝে মাঝে এই তাচ্ছিল্যই বড় হয়ে ওঠে ওঁর রচনায়। নইলে 'চার ইয়ারি কথা' যিনি লিখতে পারেন, জীবনের ট্রেজেডিকে তাঁর চেয়ে বেশী করে প্রকাশ করবার ক্ষমতা ক'জনের আছে জানি নে। সেখানেও তাচ্ছিল্যের সুর। কিন্তু নিজের দুঃখটাকে বলবার সময় বক্তা তাতে যে তাচ্ছিল্যের সুর দেন, মনে হয়, যেন আর কারুর দুঃখটাকে গল্প করে বলা হচ্ছে, এর সঙ্গে তাঁর নিজের কোন সম্পর্কই নেই।

ইনিয়ে বিনিয়ে কাতরোক্তি নেই কোথাও, অথচ কত বড না ট্রেজেডি পাঠকের বুকে গিয়ে শেলের মত বাজে। চৌধুরী মশায়ের লেখায় এই সহজ শান্ত 'রিফাইন্‌ড্' বলার ভঙ্গীটিই আমাকে সবচেয়ে বেশী মুগ্ধ করে। কিন্তু বানর বানাবার সময় ওই চাপা তাচ্ছিল্যের সুরটা থাকা কোনমতেই সম্ভবপর নয়।

কিন্তু 'চার ইয়ারি কথা'র রস সকলে গ্রহণ করতে পারে না, বললেন গিরিজাদা, সে রস বুঝতে হলে পাঠকের শিক্ষা ও সংস্কৃতি একটা বিশেষ পর্যায়ে পৌঁছান দরকার।

মুশকিল কি জান ভাই, দাদা বললেন, সাধারণ পাঠক যদি তাঁর লেখা না-ই বোঝে তাতে কোন লেখার মর্যাদাহানি হয় এ কথা আমি বিশ্বাস করি নে। রবীন্দ্রনাথের সব কবিতার মানে সবাইকে বুঝতে হবে, এমন মাথার দিব্যি দেওয়া নেই। 'শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা' পড়ে স্যর গুরুদাস কি বলেছিলেন জান?—এমন অশ্লীল বস্তু ইতিপূর্বে নাকি তিনি দেখেন নি।

'শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা' অশ্লীল! আমি বিস্ময়ে হাঁ করলাম।

হ্যাঁ, বলে চললেন শরৎদা, স্যর গুরুদাসের মুখ থেকে কথাটা বার হয়েছে অতএব সেটা মেনে নিতেই হবে, না নিলে তা হবে মারাত্মক অপরাধ—এই না আমাদের সমাজের মতিগতি!

কিন্তু অশ্লীলতাটা কোথায়? গিরিজাদা জানতে চাইলেন।

অশ্লীলতা নেই বলতে চাও? একজন যুবতী-নারী একমাত্র বাস নিল গাত্র হ'তে, বাহুটি বাড়ায়ে ফেলি দিল পথে ভূতলে—এও যদি অশ্লীল না হয়—কথা শেষ না করেই হো হো করে হেসে উঠলেন দাদা। আমরাও সে হাসির ছোঁয়াচ এড়াতে পারলাম না।

হঠাৎ এত হাসির রোল কেন, বলতে বলতে ঘরে ঢুকলেন অধ্যাপক ধ্রুব পাল।

জানেন রবীন্দ্রনাথের 'শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা' কবিতাটি অশ্লীল! বলেই আর একবার হেসে উঠে গিরিজাদা হাঁপাতে লাগলেন।

অধ্যাপক, ছাত্রদের চরিত্র সাবধান? বলে শরৎদাও আর একবার হেসে উঠলেন।

বলি আবিষ্কারটি কার? অধ্যাপক প্রশ্ন করলেন।

যারই হোক না কেন, বললেন শরৎদা, মনে করো আমার, কিন্তু

স্বীকার কর কি না। পথের মধ্যে নারীকে নগ্ন করা হল, তাও যদি অশ্লীল না হয়, তাহলে অশ্লীল বলে কিছু নেই।

এ আপনার আবিষ্কার নয়, আমি জানি দাদা, বললেন অধ্যাপক, তবে সাহিত্যবোধ ও কাব্যবোধ নিয়ে অনেক তর্কের অবতারণা হতে পারে। পাণ্ডিত্যই সব সময় সাহিত্যরস গ্রহণের পক্ষে যথেষ্ট নয়।

সেই কথাই হচ্ছিল 'চার ইয়ারি কথা'-প্রসঙ্গে, আমি বললাম।

চৌধুরী মহাশয়ের রচনা, বললেন অধ্যাপক, পাঠকদের ইন্‌টেলিজেন্স ও কালচার একটা বিশেষ সীমায় না পৌঁছানো পর্যন্ত তারা এ লেখার সমঝ্‌দার হতে পারে না।

নাই বা হল, শরৎদা বললেন, সে লেখার মধ্যে যে কত জোর, কত সূক্ষ্ম কারুকার্য, কোথায় এর সৌন্দর্য, কোথায় এর মধুর কাব্যরস—সব চেয়ে এ লেখা লিখতে পারা যে কত শক্ত—এ কথা বুঝবে বোধ করি তারাই যাদের নিজেদের হাতে কলমে লেখবার বাতিক আছে। আমার আসল কথাটা কি জান? এক রবিবাবুর লেখা পড়ে মনে হয়েছে চেষ্টা করলেও আমি এমনটা পারিনে। আর চৌধুরী মহাশয়ের 'চার ইয়ারি কথা' পড়তে পড়তেও বার বার মনে হয়েছে, চেষ্টা করলেও আমি এমন করে কিছুতেই লিখতে পারি না। এর নির্মল লিখনভঙ্গী, সোজা—সবল কথাবার্তা, অথচ এমনি রসে ভরা, মনের ভাবটা বলবার এই অনাবিল মুক্ত পথ; লেখকদের পক্ষে অপরিসীম শিক্ষার বস্তু আছে এর মধ্যে।

আমি বললাম, যারা বোঝে না, বোঝে না বলেই তাদের ধিক্কার দিতে হবে এ আমি মানি না। তবে, হ্যাঁ, বিভিন্ন রকমের সাহিত্য বিভিন্ন পর্যায়ে আদর পাবে, কিন্তু সবার অন্তর স্পর্শ করতে পারে যে সাহিত্য, সে সাহিত্যই হবে চিরন্তন।

চিরন্তন হতেই হবে সাহিত্যকে এমন নাও হতে পারে, বললেন শরৎদা। জীবনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যেরও রূপান্তর ঘটবে ত। তবে মানুষকে ভালবাসতে হবে, সংসারের সত্য উপলব্ধি করতে হবে। নিজের প্রাণ দিয়ে যারা স্নেহ-প্রেমের স্বরূপ অনুভব করেছে, সাহিত্য রচনায় একমাত্র তাদেরই অধিকার। দুঃখের আগুনে পুড়ে যাদের অনুভূতি শুদ্ধ ও সৎ হয়ে ওঠেনি, তাদেরই উপর সাহিত্য সৃষ্টির ভার পড়েছে বলেই বাঙলা সাহিত্য আজকাল এত নিচের দিকে নেমে চলেছে।

গিরিজাদা জিজ্ঞাসা করলেন, ভাল কথা, হাতের ঘা কেমন আছে?

প্রায় শুকিয়ে এসেছে, শরৎদা জবাব দিলেন।

হাতের ঘা কিসের? আমি উৎকণ্ঠায় প্রশ্ন করলাম।

আরে ভাই, বল কেন। কুকুরের ঝগড়া থামাতে গিয়ে কোথাকার একটা ঘেয়ো কুকুর আমার হাতের তেলোয় আচ্ছা করে দাঁত ফুটিয়ে দিয়ে পালিয়েছিল। হতভাগা কুকুরটা কি অকৃতজ্ঞ! তাকেই আমি ভেলুর কবল থেকে বাঁচাতে গিয়েছিলাম। ভয়ে আমি কথাটা কাউকে বলিনি।

দাদার যত কাণ্ড, বলেন অধ্যাপক। Trained pedigree কুকুর নয়, ঘেয়ো নেড়ী কুত্তা নিয়ে মাখামাখি করেছেন—

দ্যাখো, কুকুর—কুকুরই, তাকে train করে ভদ্রলোক বানাবার চেষ্টা করলে তার আভিজাত্য বাড়ে এ কথা আমি বিশ্বাস করি না। বরং কুকুর-চরিত্র একটুও বর্জন না করেও তারা কুকুর সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আসে; আমাদের সমাজে তথাকথিত উচ্চশিক্ষিতা মহিলাদের মত।

শিক্ষিতা মহিলাদের উপর দাদা এত ক্ষেপে গেলেন কেন? প্রশ্ন করলেন অধ্যাপক।

ক্ষেপে আমি যাইনি, বললেন দাদা, মহিলা, উচ্চশিক্ষিতা—ও দূরে থেকে শুনতেই ভাল। এঁদের মত সংকীর্ণ চিত্তের স্ত্রীলোক বাঙলা দেশে আর নেই। তাঁদের ন্যাকামি, বিত্তের জাঁক, আর কুসংস্কারবর্জিত আলোর দম্ভ এবং যা সত্যি নয় তার ভান—এ দেখেই আমার এত অরুচি। সাড়ে পনেরো আনাই কুরূপা, কেবল সাবান পাউডার আর জামা কাপড় দিয়ে, আর নাকি-খোনা গলায় কথা কয়ে যত দূর চলে! তারপর হেসে বললেন, আমাকে তাঁরা মনে মনে ভারী ভয় করেন, তাঁদের কেবলই ভয়, আমি তাঁদের ভিতরটা বুঝি খুঁটিয়ে দেখে নিচ্ছি। আমার সামনে তাঁরা কিছুতেই স্বস্তি পান না। অন্তরটা তাঁদের এমনি কৃত্রিম সংকীর্ণতায় ভরা!

দাদা নারীর বন্ধু বলে সমাজে স্বীকৃত, আমি বললাম, আপনার মুখে শিক্ষিত নারীদের সম্বন্ধে এমন কথা শুনব—কখনই আশা করিনি।

তা বলে ভাল মেয়ে নেই তা নয়। দাদা বললেন, চার-পাঁচটি শিক্ষিতা মেয়েকে আমি দেখেছি, তাঁরা সত্যি শ্রদ্ধার পাত্রী। বি. এ. পাশ করা সত্ত্বেও

আমাদের বোনদের সঙ্গে তাঁদের প্রভেদ করা যায় না। এতই ভাল, মনে হয় যেন তাঁরা হিন্দুর মেয়ে হয়েই আজো আছেন।

তা বলে আমাদের সমাজে মেয়েদের যা করে রাখা হয়েছে, বললেন, গিরিজাদা, তাদের মুক্তির পথও ত বাত্‌লে দিতে হবে।

এই সমাজের কাঠামো, শরৎদা বলে চললেন, একে ভাঙবার দুঃসাহস আমার নেই। সমাজকে অস্বীকার করে মানুষের চলে না। তবুও প্রশ্ন করবার অধিকার সকলেরই আছে। হাজার হাজার কণ্ঠে যদি প্রশ্ন জেগে ওঠে—কেন এমন হবে? মানুষ মেয়েমানুষ বলে ধিক্কৃত ও বিড়ম্বিত হবে কেন? মানুষের পরিপূর্ণ মর্যাদা স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই কেন পাবে না—তাহলে এর জবাব একদিন কাউকে দিতেই হবে।

শুধু প্রশ্নে কাজ হবে, আমি তা মানতে পারি না, আমি বললাম। আঘাত দিতেই হবে সমাজকে, না ভাঙলে নতুন সমাজ গড়া যাবে না।

সে ভাঙার ভার তোমাদের হাতেই রইল ভাই, আমি শুধু প্রশ্নটাই জানিয়ে দিয়ে গেলাম।

শরৎদা একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন।

আমার বাস তখন চুনাপুকুরের মেসে, বর্তমান ডাক্তার জগবন্ধু লেন ও বৌবাজারের মোড়ে। তখন সেটাই ছিল এক নম্বর চুনাপুকুর লেন। পশ্চিম-মুখো বাড়ীর সদর দিয়ে ঢুকেই ডান পাশের কোণের ঘরে আমার বাস। সে ঘরে আমি একচ্ছত্র অধিপতি।

তখন আমার মেস-ম্যানেজারির পালা। সন্ধের সময় চায়ের কাপ এগিয়ে দিতে গিয়ে ভৃত্য শিবু জানালে, তার দেশ থেকে একটি ছেলে এসেছে, তাকে কোথাও একটি কাজ যোগাড় করে দিতে হবে।

তা না হয় দেওয়া যাবে, আমি বললাম। কিন্তু সে যে এসে গেছে বললি, আছে কোথায়?

আজই এসেছে বাবু, শিবু বললে, আপনারা অনুমতি দিলে অন্য কোথাও কাজ না পাওয়া পর্যন্ত এখানেই থাকতে পারে।

বেশ ত, তাই থাক, আমি অভয় দিলাম। এখানকার ফুটফরমাশ কিছু খাটলে তার থাকা-খাওয়া নিয়ে বাবুরা কেউ আপত্তি করবে না। আমি সবাইকে বলব।

শিবু চলে গেল। একটু পরেই লণ্ঠন জ্বেলে নিয়ে যে ছেলেটি ঘরে ঢুকল, সে আমার অপরিচিত। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তুমিই কি কাজের খোঁজে এসেছ ?

অতি বিনয়-নম্রভাবে মাথা নিচু করে জোড়হাতে সে জানালে, আজ্ঞে হ্যাঁ।

জিজ্ঞাসা করে জানলাম, মেদিনীপুর জেলায় জমিজমা যেটুকু ওদের আছে, তা চাষবাস করে বারো মাসের ভাত জুটলেও আর কিছু জোটে না তা থেকে। ওদিকে চাষের সময় ছাড়া কাজও পাওয়া যায় না অন্য সময়। পরিবার নেহাৎ ছোট নয়, মা, ঠাকুরমা, দাদা, ছোট ভাই-বোন, বিধবা পিসি—এদের সকলের সংস্থান করতে হয়। কিছুদিন আগে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় কিছুটা দায়িত্ব পড়েছে ওর উপর। তাই শিবুকে ভরসা করেই চলে এসেছে কলকাতায়।

আমি বললাম, এতগুলি লোক চেষ্টাচরিত্র করলে কাজ একটা জুটে যাবেই। আপাতত এখানেই থেকে যা, থাকা খাওয়ার ভাবনা নেই। বাবুদের কিছু কিছু কাজ করে দিলে তাঁরাই চাকরি করে দেবেন।

খগেনের এখানে থাকার জন্যে মেসের মাতব্বরদের মত করিয়ে নিতে অসুবিধা হল না। তখনকার দিনে একটা লোকের খোরাকি—ক'পয়সাই বা দাম। তা ছাড়া, ভাত নিত্য ফেলা যায়। নীলুবাবু বললেন, উত্তম প্রস্তাব। একা বেচারা শিবু সব দিক সামাল দিলেও সকাল সন্ধ্যায় হৈ হৈ পড়ে যায়। সে বাজারে যাবে, না আমাদের চা-সিগারেট আনবে, ফাইফরমাশ খাটবে!

আমি বললাম, এ নিয়ে আমাদের মধ্যেই মন কষাকষি হয়, ঠাকুর-চাকর কার দিকে একটু টেনে কাজ করল। দেখা যাক না, ও কেমন কাজ করে. ভাল হয়, পাকাপাকি রেখে দেওয়া যাবে।

ক'দিনের মধ্যেই দেখলাম, খগেন প্রায় আমার গার্জিয়ান হয়ে উঠেছে। সে-ই খোঁজ করে আমার জামা-কাপড় ডাইং-ক্লিনিঙে দেয়; সময় মত না বলতে জুতো বুরুশ করে রাখে। বিছানাপত্তর ঘরদোর—সবই সাজিয়ে গুছিয়ে রাখে পরিপাটি করে। এমন কি, সিগারেট খরচ আমার বেড়ে যাচ্ছে—এ কথাও পাকে প্রকারে জানিয়ে দিতে ভয় পায় না। ঘরে অতিথি এলে আমার অনুমতির অপেক্ষা না রেখে কাকে চা-সিগারেট দিতে হবে, কয়েক দিনের মধ্যেই খগেনের তা রপ্ত হয়ে যায়। বলা বাহুল্য, কিছু দিনের মধ্যেই মেস-কমিটি খগেনকে দু নম্বর চাকর হিসাবে নিয়োগ করে ফেললে।

একটা জিনিস সব চেয়ে লক্ষ্য করেছিলাম, বালিসের তলে, দেওয়ালের ব্রাকেটস্থ জামার পকেটে, টেবিলের উপর যখন তখন খুচরো পয়সা, টাকা —সবই অগোছাল ভাবে ফেলে রাখতাম। গোছগাছ করার সময় সেগুলির মধ্যে কোনটিরই কোনদিন স্থানচ্যুতি ঘটেনি। এ অবস্থায় আমি খগেনকে বলেছিলাম দু-চার পয়সা দরকার মত চেয়ে নিতে।

একদিন সত্যি সত্যি যখন খগেন সসঙ্কোচে চারটে পয়সা চেয়ে নিল, একবারও আমার মনে প্রশ্ন জাগে নি কিসের জন্য এ পয়সা। কিন্তু হঠাৎ সেদিন অসময়ে আপিস থেকে ফিরে ভেজানো দরজা আলগোছে খুলে ঢুকতেই দেখি মেঝেতে উবু হয়ে পিছন ফিরে বসা শ্রীমান খগেন অত্যন্ত অপ্রস্তুত হয়ে কি যেন একটা ঢাকতে চেষ্টা করছে। আমার চোখে পড়ল গোলাপী মলাটের পাতলা একখানা বই।

কি ব্যাপার খগেন? লুকোবার দরকার নেই।

অপ্রস্তুত ভাবটা একটু কাটিয়ে খগেন আমার হাতে তুলে দিল একখানা বর্ণপরিচয়। আপনি পয়সা দিয়েছিলেন বাবু।

পড়াশুনা করতে ইচ্ছে করে? আমি প্রশ্ন করলাম।

খগেন নিরুত্তরে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

আমি বললাম, এতে লজ্জা করতে হবে না তোর। আমার ঘরে তুই সময় পেলেই এসে পড়াশুনা করবি। বই-খাতার জন্য দরকার হলে পয়সা চেয়ে নিস। আর পড়তে চাস আমার কাছে, তাও পড়িয়ে দেবো।

হঠাৎ খগেন আমার পায়ে হাত দিল, পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে বললে, আপনার আশীর্বাদ।—বলেই সে ঘর থেকে দ্রুতপদে বেরিয়ে গেল।

*

তিনদিন যদি গজেনদার আড্ডায় হাজির না হতে পারি, গজেনদা থেকে শুরু করে সবার অনুযোগই যে শুধু আমাকে শুনতে হয় তাই নয়, আমার নিজেরই অস্বস্তি লাগে। এঁদের সঙ্গে আড্ডায় জমায়েৎ হয়ে নিজে আনন্দ পাই বলেই নয়, আমি না গেলে গজেনদা সত্যি ব্যথিত হন, চিন্তিত

হন। আর উপস্থিত হয়ে তাঁর কাছ থেকে যে স্নেহ ও আত্মীয়তার স্পর্শটুকু পাই, সেটুকু আমার কাছে সত্যই মহার্ঘ বলে মনে হয়।

সেদিন আড্ডা থেকে করুণাদা আর আমি একসঙ্গে বেরিয়ে পড়েছিলাম। করুণাদা বললেন, পবিত্র ভায়া, তাড়া না থাকে ত আমার সঙ্গে এক জায়গায় যেতে পার। খুশীই হবে।

আমি সাগ্রহেই করুণাদার সঙ্গ নিলাম। এঁকে বেঁকে আমহার্স্ট স্ট্রীটে এসে পৌঁছলাম। আমহার্স্ট রো-র মোড় পার হয়ে করুণাদা ঢুকলেন এক কবিরাজখানায়, আমি পশ্চাদানুসরণ করলাম।

ধবধবে ফরাস পাতা কবিরাজখানা, সাজে গোজে কবিরাজখানা ও কবিরাজ দুজনেই পরিপাটি। জুতো খুলে করুণাদা ফরাশে উঠে বসতেই কবিরাজ মশায় সসম্ভ্রমে সিধে হয়ে বসলেন। দেখলাম চেহারা ফুট ছয়েক দীর্ঘ, দাড়ি গোঁফ মসৃণভাবে কামানো। আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন করুণাদা, ইনি জীবনকালী রায় বৈদ্যরত্ন। কবিরাজ শুধু যোগরূঢ়ার্থে নন, ইনি একেবারে কবিরঞ্জন, কাব্য কবিতা সাহিত্য সব কিছুতেই পরম অনুরাগী। গুণীজনের প্রতি এঁর অপরিসীম শ্রদ্ধা ও সৌহার্দ্য, আর ওঁর বন্ধুবাৎসল্য এমন যে তার আকর্ষণ আমরা এড়াতে পারি না।

মুখে চোখে বিনয় প্রকাশ করে কবিরাজ মশায় বললেন, বন্ধুবাৎসল্য যে কার, তা করুণাবাবুর কথাতেই প্রমাণ হয়ে গেল। নইলে এতখানি প্রশংসার যোগ্য মানুষ রক্ত মাংসে আর ক'জন খুঁজে পাওয়া যায়। প্রীতির দৃষ্টিতে সবাই অসাধারণ হয়। যাই হোক ওঁর পরিচয় দিলেন না ত আপনি।

করুণাদা কিছু বলবার আগেই আমি বললাম, আমার পরিচয়ঃ কবি, সাহিত্যিক ও শিল্পী জনের সঙ্গ ও তল্পি বহনেই যার পরমানন্দ আমি সেই পবিত্র গাঙ্গুলী।

কথাটা কেমন বুঝতে পারলাম না, বললেন কবিরাজ মশায়, সঙ্গে সঙ্গেই সামনের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, বেশ ভাল সময়ে এসে গেছেন মোহিতবাবু।

করুণাদা ও আমি দুজনেই ফিরে তাকালাম। মোহিতবাবু বলে উঠলেন, মধুর গন্ধ পেলেই মৌমাছি আসে, গন্ধ না পেলেও আসে, আমি ইনটুইশনে বুঝতে পারি। করুণাদা যে এখানে আছেন তা আমি অনুমান না করলেও এখানে এলে আমাকে যে নিরাশ হয়ে ফিরতে হয় না, এ আমি জানি।

মোহিতের ষষ্ঠেন্দ্রিয় বেশ তীব্র বলেই মনে হচ্ছে, বলেই হেসে উঠলেন করুণাদা।

মাঝখান থেকে আমিই লাভবান হই, বললেন কবিরাজ মশায়, বিশেষ করে মোহিতবাবুর কবিতা এবং আবৃত্তি আমাকে নিত্য রসায়ন যোগায়।

করুণাদা বললেন, মোহিত ত গজেনদার আড্ডায় অনেক দিন যাও নি, তোমার কবিতাও অনেকদিন শুনি নি। আজ ত্রুটি পুরিয়ে দাও।

কবিরাজ মশায়ও করুণাদাকে সমর্থন করলেন। বললেন, দেবেন সেনের সেই কবিতাটি আর একবার শুনব আজ।

কোন্‌টি ?

সেই যে ডায়মণ্ডকাটা মল—

ইতিমধ্যে ভেতর থেকে চা এসে গেল। সিগারেট ধরাতে ধরাতে মোহিতবাবু বললেন, আগে মৌতাত করে নিই।

আমি পিছনে বসে সকলের কথাবার্তা শুনে যাচ্ছিলাম। চা খেতে খেতে মন্তব্য করলাম, ওঁর স্বরচিত কবিতাও শুনতে চাই।

পিছন দিকে ফিরে তাকালেন মোহিতবাবু, বললেন, আপনার সঙ্গে ত পরিচয় হয় নি, আপনি কে বটেন ?

কবিরাজ মশায় পরিচয় দিলেন, উনি করুণাবাবুর বন্ধু।

করুণাদার বন্ধুত্বে বয়সের সীমা মানে না, সে আমি জানি, মোহিতবাবু বললেন, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ বন্ধুত্ব সম্বন্ধে লিখেছিলেন :

'Though I was of only ten
and Mathew seventy-two...'

যাই হোক, আপনি যখন করুণাদার বন্ধু, তখন রসিক নিশ্চয়।

এবার মোহিতবাবুর কবিতা আবৃত্তি শুরু হল।

... ...

'রুণু রুণু ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ রুণু রুণু ঝুম্
মল বলে, 'বল্, ওরে সরে যেতে বল্ ;'
কবি বলে, আসে ওই আমার আনন্দময়ী,
শরমে শিথিল তনু ভরমে বিকল ;
যামিনীতে দেখা হলে, শুধাব সোহাগ ছলে,
তরল-জ্যোৎস্না-জলে ধুয়ে ধরাতল,

শারদীয়া শর্ব্বরী সখি তোর গলা ধরি,
এমনি কি গান গায় ? বল্ সখি বল্ ?
রুণু্ রুণু্ ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ রুণু্ রুণু্ ঝুম্
ওই বাজে মল।'

চোখে মুখে ভাবের ব্যঞ্জনা, কণ্ঠে ভাষার ঝঙ্কার—সব কিছু মিলে আবৃত্তি আমাদের মুগ্ধ করে দিল। মাঝে মাঝে চোখ দুটি বন্ধ করে দুলে দুলে সুরের তালে ভেসে চলতে লাগল তাঁর আবৃত্তি। কবিতাটি বলা শেষ করেই মোহিতলাল বলতে শুরু করলেন, এই দেবেন সেনের কবিতা, একদিকে যেমন অনবদ্য গাম্ভীর্যে সমুদ্র-কল্লোলের মত গম্ভীর ধ্বনিতে ভরা, তেমনি শব্দচয়নের গুণে ছবিগুলি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। অথচ ছন্দের গতি কী সহজ সাবলীল! মজা কি জানেন? উত্তেজিত হয়ে বলে ওঠেন মোহিতবাবু, আজকের কবিতার পাঠক হাল্কা ঠুনকো চটুল কবিতা খোঁজে, সত্যিকার ভাল কবিতার রসগ্রহণের ক্ষমতা নেই তাদের। নইলে দেবেন সেনের কবি-খ্যাতি আজ অনেককে ছাপিয়ে যেত।

অরসিক পাঠক-সাধারণের উপর বিরক্ত হয়ে আমাদের বঞ্চনা করে লাভ কি, হেসে বললেন করুণাদা। এবার তোমার কবিতা শুনব। চটুল কবিতার প্রতি পক্ষপাতিত্বের নালিশ অন্তত আমাদের বিরুদ্ধে তোমার নেই। অতএব—ঘাড় নেড়ে কবিতা পাঠ শুরু করার ইঙ্গিত দিলেন।

পাঞ্জাবির পকেট থেকে অনেকগুলো ভাঁজ করা কাগজ বার করলেন মোহিতবাবু। তার পর একটি খুলে নিয়ে পড়তে শুরু করলেন :

'দিনশেষে রাত্রি এল, শারদ-শর্ব্বরী
কেটে গেল বহুক্ষণ ভুবন-ভবনে!
গৌরী-গোধূলির ভালে রৌপ্য-দীপাধার
কখন উঠেছে জ্বলি' !—সন্ধ্যা জ্যোৎস্নামুখী
রচিল কনকবেণী কানন-কুন্তলে।...'

পর পর তিনটি কবিতা পড়ে গেলেন তিনি, আমরা তিন জনেই মোহিত হয়ে শুনলাম।

কবিরাজ মশায়ের ওখান থেকে বেরিয়েই উত্তর দিকের পথিক করুণাদা আমাদের সঙ্গ ছেড়ে দিলেন। আমি মোহিতবাবুর সঙ্গে আমহার্স্ট স্ট্রীট ধরে দক্ষিণে চলতে লাগলাম, পায়ে হেঁটে চুনাপুকুর যাব। চলতে চলতে আরো

দু-একটি কবিতা শোনালেন মোহিতবাবু। রাজা হৃষীকেশ লাহার বাড়ির উত্তর গায়েই মোহিতবাবুর ডেরা, সেখানে বিদায়ের পালা বেশ খানিকটা বিলম্বিত হল। ল্যাম্প পোস্টের আলোয় দাঁড়িয়ে আরো দুটি কবিতা পড়লেন তিনি। বাড়ীতে ঢোকবার আগে বললেন, আসবেন মাঝে মাঝে। বাসা থেকে বেরিয়ে কবিরাজ মশায়ের ওখানেই জমে যাই, ইচ্ছে থাকলেও গজেনদার ওখানে যাওয়া হয়ে ওঠে না।

'ভারতী'তে আমি আপনার কবিতা পড়েছি, আমি বললাম, কিন্তু তাঁদের দলেও আপনার সাক্ষাৎ পাই নি।

কি করব বলুন ভাই, বললেন মোহিতবাবু, মাস্টারী করে খেতে হয় মোহিত মজুমদারকে, কবিতার মূল্য দেয় না কেউ। সকাল বেলা ছাত্র পড়ানোর পরে সময় মত স্কুলে হাজিরা দিতে হয়। মণিবাবুর আড্ডা তো সকাল বেলায়, আর সে আড্ডা দিতে যাওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না।

মেসে যখন ফিরলাম তখন রাত ন'টা বেজে গেছে। তার জন্য অবশ্য মেসের আবহাওয়া ঝিমিয়ে পড়বার কথা নয়, কিন্তু আজ ভিতরে ঢুকতেই কানে এল উপরতলা থেকে অনবদ্য কীর্তনের সুর ভেসে আসছে।

'অমিয় সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল—'

ঘরে ঢুকেই খগেনকে জিজ্ঞাসা করলাম, গান কে গায় রে খগা?

খগেন জবাব দিল, দোতলায় অমূল্যবাবুদের ঘরে গেস্ট এসেছেন একজন। তাঁকে নিয়ে আসর জমেছে ঘরে।

জুতো জামা খুললাম, কিন্তু যতই সুর ভেসে আসছিল ততই টানছিল আমাকে উপরের দিকে। বিনা ভূমিকায় ঘরে এসে ঢুকলাম। গান চলছিল, অমূল্যবাবু ইঙ্গিতে আমাকে স্বাগত জানিয়ে বসবার নির্দেশ দিলেন।

মাথা নেড়ে নেড়ে চোখে মুখে ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে গান গেয়ে চললেন ভদ্রলোক। ঘরের সমগ্র পরিবেশ মহাজন পদাবলীর সুরে রণিত হয়ে উঠল। ফিরে ফিরে গাইলেন প্রতিটি লাইন। গান যখন শেষ হল, কিছুকালের মত কথা ফুটল না কারো মুখে। মৌন ভেঙে আমিই বললাম, দাদা সত্যিকার গুণী। আজই এসেছেন?

আমার কথার জবাব দিলেন অমূল্যবাবু, আজই এসেছেন, হয় ত কালই চলে যাবেন। এমনি ওর উড়ো স্বভাব। কখন কোথায় আসবেন, থাকবেন

বা চলে যাবেন তা কিছুই ঠিক নেই। নোটিশ দিয়ে আসা-যাওয়া ওর ধাতে নেই।

অভ্যেসে অভ্যেসে স্বভাবই খারাপ হয়ে গেছে, হেসে বললেন গায়ক, জীবনটাই এমন ছন্নছাড়া যে ধীরে সুস্থে ছক কেটে ঘোরা ফেরা করা সম্ভব হয় না।

দাদার পরিচয় ত পেলাম না, আমি বললাম।

পাওয়ার মত পরিচয় কিছু নেই, হেসে বললেন গায়ক। নাম আমার শ্রীনলিনীকান্ত সরকার, নিবাস যত্রতত্র, হাল সাকিম এক নম্বর চুনাপুকুর গলি। পেশা বাউণ্ডুলেগিরি।

এই কি একটা পরিচয় হল দাদা? আমি প্রশ্ন করলাম।

এর চেয়ে বেশী পরিচয় লোকের লাগে? বললেন নলিনীবাবু, কোথায় থাকি, কি করি—সব বলেছি আপনাকে, এর চেয়ে বেশী দেবার মত পরিচয় আমার নেই।

আর একটি পরিচয় ত আপনি নিজেই পেলেন, বললেন অমূল্যবাবু।

আমি জবাব করলাম, হ্যাঁ, পেলাম, কুঞ্চিত চিকণ কেশদাম, কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা, আর বৈষ্ণবের নিদর্শন কণ্ঠে তুলসীর মালা—

আমি বৈষ্ণব, আপনিও ত পদাবলীকার বলে মনে হচ্ছে, হো হো করে হেসে উঠলেন নলিনীকান্ত।

পরদিন আর তাঁকে দেখতে পাই নি।

আবার কবে হুট করে এসে হাজির হবে, বললেন অমূল্যবাবু।

সেদিন আপিসে বসে 'সবুজপত্র'-এর প্রুফ দেখছি, উর্দিপরা এক চাপরাসি এসে আমার হাতে একখানা লেফাপা দিলে, তার উপর আমারই নাম লেখা। লেফাপাখানা খুলে দেখি গিরিজাদার কাণ্ড, একেবারে ওঠ্ ছুঁড়ী তোর বিয়ে!

গিরিজাদা গবর্নমেণ্টের অডিটার। মনে পড়ছে, একদিন কথায় কথায় নিজের ঘর-সংসার, অর্থনৈতিক অবস্থার কথা জানিয়েছিলাম। আরো কিছু উপার্জনের পথ জানতে চেয়েছিলাম তাঁর কাছে। চৌধুরী মহাশয়ের আপত্তি হবে না, এই ভরসা তাঁকে জানানোয় তিনি আমার জন্য কোন চাকরির চেষ্টা

করবেন এমন কথা দিয়েছিলেন। সেই অনুসারে একেবারে অ্যাপ্লিকেশন তৈরী করে পাঠিয়ে দিয়েছেন তিনি—আমাকে এখুনি সই করে ফেরত পাঠাতে হবে।

ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের হিসেব বিভাগে তিন মাসের অস্থায়ী কেরানীর পদ। এ পদে আমার কি যোগ্যতা আছে জানিনে, এমন কি, দরখাস্তের মধ্যে কোথাও আবেদনকারীর যোগ্যতার উল্লেখ করা হয় নি। গিরিজাদা লিখেছেন, কাল সকাল দশটায় ট্রাস্ট আপিসে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। পয়সার প্রয়োজন খুবই এবং যেভাবে চাকরি যোগাড় করে তা গ্রহণ করবার জন্যে গিরিজাদা ডেকে পাঠিয়েছেন, তাঁর এতখানি স্নেহের নিদর্শনই বা আমি উপেক্ষা করি কেমন করে? তবু মনে বড় সঙ্কোচ। 'সবুজপত্র'-এর কাজের এত চাপ নেই, সেদিকে কোন ক্ষতি হবে না, আর চৌধুরী মহাশয়ও বাধা দেবেন না—এও আমি জানি। কিন্তু দশটা-পাঁচটা নিয়মিত খাতায় মুখ বুজে পড়ে থাকা—কেরানীগিরির যে চিত্র আমার মনে আঁকা হয়ে আছে সেই ঘানিতে নিজেকে জুড়তে হবে—একথা ভেবেই আমার সমগ্র মন বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। তা ছাড়া, সকাল-বিকাল যদি এর উপর 'সবুজপত্র'-এর কাজ করি, চৌধুরী মহাশয়ের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করি, তাহলে কলকাতার সুধী সমাজে এই যে পাতা কুড়িয়ে বেড়াচ্ছি, আমার সে ব্যাপক মহোৎসবে ছেদ পড়ে যাবে।

সে সব ভাবনা তুলে রেখে দিলাম, দরখাস্ত এখনি গিরিজাদাকে ফেরত পাঠাতে হবে। এবং তা প্রত্যাখ্যান করে পাঠানো সম্ভব নয়। তবু চৌধুরী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা না করে সই করা সঙ্গত হবে না মনে করে চাপরাসীকে বলে দিলাম, তুমি চলে যাও, ঘণ্টাখানেক বাদে আমি নিজে নিয়ে আসছি।

ছ' নম্বর ওল্ড পোস্টাপিস স্ট্রীটে চৌধুরী মহাশয়ের চেম্বারে চলে এলাম। ভাগ্য ভাল, সেদিন তাঁর চেম্বারে আসার তারিখ। তাঁকে জানালাম, তিনি যদি অনুমতি করেন এবং 'সবুজপত্র'-এর কাজে কোন অসুবিধা হবে না এমন বোঝেন, তা হলে দিনের বেলায় কোন আপিসে চাকরি করতে পারি। আপাতত এমনি একটি চাকরির সন্ধান পেয়েছি।

নিজস্ব ভঙ্গিতে বললেন চৌধুরী মহাশয়, 'সবুজপত্র' সম্পর্কে তোমার দায়িত্বজ্ঞান কম নয় পবিত্র, কাজ তুমি করবে, যদি বোঝ, তাতে কোন অসুবিধা হবে না, তা হলে কি ভাবে কখন তা করবে, আর অন্য সময় অন্য

কাজ করবে কি না সে সিদ্ধান্ত তুমিই করবে। আমার এর মধ্যে কিছু বলারই থাকতে পারে না।

আমি চৌধুরী মহাশয়কে দরখাস্তখানা দেখালাম। একবার চোখ বুলিয়ে তিনি বললেন, দিয়ে দাও, চাকরি পাওয়া কি এত সহজ কথা। তোমার এ চাকরি হলে আমি সত্যি খুশী হব।

তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে বেরিয়ে এলাম।

একশ পাঁচ নম্বর ক্লাইভ স্ট্রীটে ডান পাশের সরু গলি-পথ দিয়ে সোজা লিফ্‌টে চড়ে তেতলায় গিয়ে গিরিজাদার কাছে হাজির হলাম। হিসেব বিভাগের সংলগ্ন একটা ঘরে সরকারী অডিটাররা কাজ করছিলেন।

আমি ঢুকতেই গিরিজাদা বললেন, কি ব্যাপার? আপত্তি আছে নাকি কিছু?

আপত্তি থাকবে কেন, আমি জবাব করলাম। এ বাজারে আপনার মত মুরুব্বি না থাকলে চাকরি জোটে নাকি কারো? তা ছাড়া আমি পাড়াগেঁয়ে ছেলে, চাকরির বাজারের এতটুকু হদিস জানিনে।

না, বললেন গিরিজাদা, আমি ভাবছিলাম, চাপরাসীর হাতে দরখাস্ত ফেরত পাঠালি না কেন?

দরখাস্ত দেবার আগেই চৌধুরী মহাশয়কে জানানো উচিত মনে করে আগে তাঁর কাছে গিয়েছিলাম।

তিনি কি বললেন?

তিনি আপত্তি করবেন না, এ আমি জানতাম। বললেন, তোমার কাজ, সুবিধা-অসুবিধা তুমিই ভাল বুঝবে। তবে তোমার কিছু আর্থিক সুবিধা হলে আমি খুশীই হব।

দরখাস্তখানা গিরিজাদা রেখে দিলেন। বেয়ারাকে চা আনবার হুকুম করলেন। আর বললেন, কাল এগারটায় চেয়ারম্যান মিস্টার বম্‌পাসের কামরায় ইণ্টারভিউ হবে।

চা খেতে খেতে তাঁর চ্যাপ্টা সিগারেটের টিন খুলে আধখানা করে ছিঁড়ে রাখা টুকরো দুটো বার করে আমাকে বললেন, তোর ত আবার আধখানায় মন উঠবে না, কিন্তু আমার কাছে ত পুরো থাকে না, সে ত জানিস।

আমি বললাম, ঠিক আছে অর্ধেকটাই দিন, তা ছাড়া আমার ত খইনি আছেই।

পরদিন ইণ্টারভিউয়ে বম্‌পাস্‌ সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কোন্‌ সালে বি. এ. পাশ করেছ?

প্রশ্ন শুনে আমি বিস্মিত হলাম, অসঙ্কোচেই বললাম, বি. এ. আমি কোন-দিনই পাশ করিনি। এমন কি, ম্যাট্রিকের চৌকাঠটাই কোন রকমে পার হয়েছি।

সাহেব আদ্যোপান্ত আমাকে একবার নিরীক্ষণ করে নিলেন। তারপর বললেন, বটে, তা হলে গভর্ণমেণ্ট অডিটার তোমাকে সুপারিশ করেন কি বলে? তারপর মিনিট খানেক চুপ করে থেকে বললেন, Any way, he knows his job.

ঘণ্টা বাজিয়ে চাপরাসীকে দিয়ে কেষ্টবাবুকে তলব করলেন। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। অবিলম্বে কেষ্টবাবু এসে আভূমি কুর্নিস করে বেঁকে দাঁড়ালেন সাহেবের সামনে। সমগ্র দেহভঙ্গীতে ও মুখভঙ্গিমায় প্রশ্ন ফেটে পড়ল: সাহেব ডেকেছেন কেন?

সাহেব বললেন, Kesto, here is your man, an undergraduate but recommended by the Government Auditor. I think, that is good enough, take him and give him his work.

All right, sir, বলে আর একটি লম্বা কুর্নিস করে কেষ্টবাবু আমার দিকে বললেন, আসুন।

আমি বম্‌পাস্‌ সাহেবকে 'থ্যাঙ্ক ইউ সার্‌' বলে কেষ্টবাবুর অনুগমন করলাম।

কেষ্টবাবুর পিছন পিছন য্যাকাউণ্টস ডিপার্টমেণ্টে এসে উপস্থিত হলাম। ডান দিকে কাঠের পার্টিশন পেরিয়ে বড় হল-ঘর। আলাদা আলাদা টেবিলে জন দশেক বসবার ব্যবস্থা। কিন্তু চেয়ার অধিকাংশই খালি। প্রতি টেবিলেই ফাইল জমা আছে, কিছু বাণ্ডিল-বাঁধা, কিছু বা খোলা।

আমাকে একটি টেবিলের কাছে নিয়ে গিয়ে কেষ্টবাবু বুঝিয়ে দিলেন, সেইটেই আমার সেরেস্তা। তারপর বাঁ পাশে উপবিষ্ট যুবককে বললেন, রমেশবাবু, পবিত্রবাবুকে চৌরঙ্গি এক্সটেনশানের হিসেবের কাজটা বুঝিয়ে দিন।

একগাদা ফাইল হাতে নিয়ে রমেশবাবু নিজের চেয়ারটা কাছে টেনে আনলেন, বললেন, 'এসপ্লানেডের মোড় থেকে পার্ক স্ট্রীট পর্যন্ত চৌরঙ্গির

রাস্তাটা যে চওড়া হচ্ছে তার জন্য মিলিটারীর কাছ থেকে গড়ের মাঠের কিছুটা অংশ নিতে হয়েছে আমাদের। তার হিসেব আর রাস্তা বানানোর ঠিকাদারের হিসেব—মূলত এই আপনাকে রাখতে হবে। তা ছাড়া, চৌরঙ্গির বাড়ীওয়ালারাও 'বেটারমেণ্ট ফী' দেবে। সেইগুলিই হবে ওই খাতে জমা।

বেশ অভিনিবেশসহকারে আমি রমেশবাবুর কথাগুলি শুনলাম। কিন্তু আসলে খাতায় জমাখরচ লেখার ইংরেজী কেতা যে কি তা আমি কিছুই জানি নে। অথচ অজ্ঞতা ঢাকতে হবে আমাকে। তাই অন্য ভাবে কথাটা পাড়লাম, কোন্ কোন্ খাতায় কোন্ কলমে কোন্ হিসেব কি ভাবে জমা-খরচ হয় আপনাদের, একটু হাতে কলমে বুঝিয়ে দিলে ভুল হওয়ার আশঙ্কা কম থাকে।

নিশ্চয়ই, বললেন রমেশবাবু, আমাদের য়্যাকাউণ্ট্সে নানারকম ফর্ম্ এবং আমাদের হিসেব রাখার পদ্ধতিও অডিট-বুককিপিং-এর বিদ্যেয় কুলোয় না। তা চলে মার্চেণ্ট অফিসের হিসেবে। কাজেই বুককিপিং বা য়্যাডভান্স্ড্ য়্যাকাউণ্টেন্সি আপনার যতই জানা থাক না, কিচ্ছু সুবিধা হবে না তাতে—যদি এ আপিসের ফর্মে কাজ শিখে না নেন, আর সেটুকু এখানে আসবার আগে কেউ শিখে আসে না।

কোন্ রেজিস্টার কি ভাবে রাখতে হবে, ট্রিপলিকেট ও ডুপলিকেট চালানের কোথায় কি এন্‌ট্রি হবে—এসব বেশ বিজ্ঞের মত আমায় বুঝিয়ে দিলেন রমেশবাবু।

দুদিনেই বেশ বুঝতে পারলাম, আমার আগমনে ওঁরা খুব খুশী নন। অনেকেই আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, গিরিজাবাবু কে হন। বন্ধু—আমার এই জবাব শুনে তাঁদের মনের প্রতিক্রিয়া, চাপবার চেষ্টা সত্ত্বেও, আমার চোখে তা ধরা পড়ে গেল। বিশেষ করে অডিটারের লোক আমি, সেই সুবাদে একটু সংশয়ও টের পেলাম আমার উপর। তাঁদের ধারণা হল, ডিপার্টমেণ্টের কাজের ফাঁক এবং ফাঁকি যতটুকু যা ঘটে, যে ইর্‌রেগুলারিটি কাজের প্রয়োজনে অনিবার্যভাবে এসে পড়ে, আমি হয়ত তা বন্ধু অডিটারের কাছে ফাঁস করে দেবো।

একটু প্রচ্ছন্ন ঈর্ষাও যে ছিল তাও টের পেলাম রমেশবাবুর কথায়। একটা নতুন আইটেম্ কোন্ কলমে বসাতে হবে তা নিয়ে খটকা লাগল, রমেশবাবুকে জিজ্ঞাসা করার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তা দেখিয়ে দিলেন, বললেন,

এসব উদ্ভট আইটেম বসাবার সময় একটু ডিস্‌ক্রেশন খাটিয়েই করবেন। আপনাকে আর কি বলব? যোগ্যতর বলেই ত আপনাকে বেশী মাইনে দেওয়া হয়েছে।

রমেশবাবু গ্র্যাজুয়েট, আর আমি কলেজের দরজা মাড়াই নি, তবু তাঁর চেয়ে বেশী মাইনে পাই। সে অবস্থায় তাঁর স্বাভাবিক ঈর্ষাটুকুতে আমি রাগ করতে পারলাম না। বললাম, আপনারা পারমানেণ্ট স্টাফ, যাবৎ জীবন তাবৎ চাকরি, আর আমি এসেছি তিন মাসের ঠিকে কাজে। কাজ ফুরোলে দরজা দেখিয়ে দেবে, তখন আবার চাকরির ধান্দায় টো-টো করতে হবে।

আপনি ক্ষেপেছেন? বললেন রমেশবাবু। আপনি এসেছেন তিন মাসের টেম্পরারি একটা স্কীমে। স্কীমের পর স্কীম ত লেগেই আছে, কাজেই এক ঠিকে কাজ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার জুটে যাবে। এমনি করতে করতে পারমানেণ্ট ভেকেন্সি হলে ঠিকাওয়ালাদেরই ক্লেম আগে। আসলে প্রথমে ঢুকতেই যা গোলমাল। তারপর নিজে না ছাড়লে বা চুরি-জোচ্চুরি না করলে চাকরি কারুর যায় না।

আপনার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক, আমি বললাম। আর যেন চাকরি-চাকরি করে ঘুরতে না হয়। তা ছাড়া, আপনাদের মত বন্ধুসঙ্গ—

বন্ধুসঙ্গ সত্যি লোভনীয়। কার কাজ বেশি-কম, কে সাহেবের একটু পেট্—তা নিয়ে ঈর্ষা রেষারেষি যতই থাক না কেন, স্বাভাবিক ব্যবহারের আন্তরিকতায় এতটুকু ফাঁক নেই। কে কি দিয়ে খেল, কে আজ বাজার থেকে কি মাছ কত দামে এনেছে, কার কয়লাওয়ালা তাগাদা করতে এসে ত্নটো কড়া কথা শুনিয়েছে—কিছুই বাদ পড়ে না আলোচনায়।

মণিবাবু কৌটো ভরে পান নিয়ে আসেন, সে পানে যেন অধিকার সকলের সমান। জিজ্ঞাসার প্রয়োজন নেই, টেবিলে মণিবাবু থাকুন কি না-থাকুন, যে খুশি কৌটো খুলে পান নিয়ে মুখে পুরে দিচ্ছে। এর মধ্যে সবাই পান-খোর নয়, কিন্তু কৌটোটা হাতের কাছে পেলে খাবে না কেন? কথাবার্তায় ভাবখানা যা বোঝা যায়, তাতে অধিকার এবং আকর্ষণ পানের উপর যতটা, তার চেয়ে বেশী পান-সাজিয়ের উপর। সুবোধবাবু ত প্রায়ই

বলে থাকেন—তোর গিন্নীর হাতের সাজা পান না খেলে সে দিন খাবারই হজম হয় না রে মণি।

মণিবাবু হাসেন, বলেন, তোর গিন্নী কি তা শুনলে খুশী হবে ?

তার কথা আর বলিস নি, জবাব দেন সুবোধবাবু, সে ঘর-সংসার নিয়েই ব্যস্ত, আমার কথা ভাববার সময় নেই তার। দরকারও নেই। টাকা রোজগারের কল, তা থেকে টাকা বেরুচ্ছে কি না, এইটুকুনই তার খেয়াল।

তা যদি বললে সুবোধ, বললেন ভবানীদা, বয়সে অনেকের চেয়ে বড়, সংসারে কেউ কাউকে গ্রাহ্য করে না রে ভাই, যার যেটুকু দরকার, নিঃশেষে আদায় করে নেয় শুধু।

পয়সা ছাড়া এমন আদায়ও জীবনে আছে, আমি বললাম, সেখানে যে দেয় সেও সমান আনন্দ পায়।

তোমার বুঝি টাটকা বিয়ে হয়েছে, না হে ছোকরা! ভবানীদা মুখ ভ্রূকুটি করে আমার দিকে তাকালেন। বিয়ের পর দু-চার দিন ওকথা ভাবতে বেশ লাগে। কর বিশ বছর ঘর, তখন বুঝবে। সব স্ত্রীই রক্ত-চোষা ডাইনি, যতটা সরে থাকা যায় ততটাই বাঁচোয়া!

ওই দুঃখেই ত বিয়ে করি নি, বিড়ি ধরাতে ধরাতে প্রাণকেষ্টবাবু বললেন। সুখের চাইতে সোয়াস্তি ভাল ভাই।

ও দুটো একদম আলাদা জিনিস, বললেন মণিবাবু, সুখ চাও ত সোয়াস্তি পাবে না, আর সোয়াস্তি চাও ত সুখ পাবে না। কাক-বকের সোয়াস্তি আছে, কিন্তু সুখ আছে কি ভাই ?

কাক-বক এসে তোমার কাছে দুঃখ জানিয়ে গেছে, না? চশমার ফাঁক দিয়ে রূঢ় চোখে তাকিয়ে বললেন ভবানীদা, যত সব আদিখ্যেতা! তোর আপিসে আসবার দরকার কি মণি? বউয়ের আঁচলে মুখ গুঁজে পড়ে থাকলেই পারিস!

মণিবাবু জবাব করেন, তাহলে আপনাদের রোজ এমন মিঠে পান খাওয়াব কেমন করে ?

সুবোধবাবু বলে উঠলেন, একখানা পানের দোকান দিলে পারিস, হু হু করে বিক্রী হবে।

মণিবাবু হেসে বললেন. তোরা ত তখন পান ছেড়ে পানওয়ালিকে নিয়ে পড়বি।

বড় যে দেমাক দেখছি, বললেন ভবানীদা, ক'ছেলের মা, সেটা খেয়াল আছে ?

আমি একটু মৃদু টিপ্পনি কেটে বসলাম, 'পানওয়ালিদের দিকে যাদের দৃষ্টি পড়ে, তারা কি বয়েস আর বিয়েন দেখে নাকি !

এতক্ষণে কনফারেন্সে কেষ্টবাবু এসে হাজির হয়ে গেছেন। পান ছেড়ে পানওয়ালিকে নিয়ে পড়ল কে ?

ভবানীদা বললেন, আর কে, পবিত্রবাবু। হাজার হোক, কবি মানুষ !

পবিত্রবাবু, গাম্ভীর্যের ভান করে বললেন কেষ্টবাবু, আপনার নামে গুরুতর অভিযোগ। বিচারে যদি খালাস চান, তাহলে এখুনি সিগারেট বার করুন। অবশ্য সবাইকে দিতে হবে না, আমাকে দিলেই হবে।

সিগারেটটা এগিয়ে দিতে গিয়ে আমি বললাম, ভবানীদাই আমাদের তর্কে নামিয়েছেন। বলেন, বউয়ের চেয়ে পানওয়ালি অনেক ভাল।

এঁ্যা ! আঁতকে উঠলেন ভবানীবাবু, সে কথা আমি বললাম কখন ? ছোকরা দেখছি জ্যান্ত মাছে পোকা পড়াতে পারে।

মণিবাবু বললেন, আপনি এইমাত্র প্রকাশ্যে এই মত ব্যক্ত করেছেন, সে কথা ত বলেন নি পবিত্রবাবু। উনি বলেছেন, ওই আপনার মত। এ কানাঘুষো কিন্তু আমিও শুনেছি।

কানাঘুষা কি রে ? উত্তেজনার সঙ্গে ভবানীবাবু জবাব করেন, ভবানী চাটুজ্যে কাউকে তোয়াক্কা করে ? যা করে, বুক চিতিয়েই করে। ও সব ন্যাকামি আর লুকোচুরি করবে প্রাণকেষ্টর মত বুড়ো ব্যাচেলারের দল। শখটি আছে কিন্তু চরিত্তিরের ভয়ে প্রাণ তুক্‌তুক্।

শেষ কালে আমাকে নিয়ে পডলেন কেন ? হতাশার স্বরে বলেন প্রাণকেষ্ট।

প্রাণকেষ্টর কাঁধে হাত রেখে মণিবাবু বলেন, শোন ব্রাদার, এখনো সময় আছে, আমরা পাঁচজন চেষ্টা করলে একটা হিল্লে হয়ে যাবে। শেষ কালে বুড়ো বয়সে বিয়ে-পাগলা হয়ে বসলে ছেলেরা পিছু নেবে, কাউকে মেয়ে সাজিয়ে মজা দেখবে !

যান, যান ! প্রাণকেষ্ট শর্মা এমন ছেঁদো লোক কি-না !

পান-সিগারেট ত হল, এবার একটু কাজ করতে দেবেন কি ? নিজের চেয়ার থেকেই রমেশবাবু বলে ওঠেন।

আপনাকে কে ঠেকিয়ে রেখেছে? বলেন সুবোধবাবু।

খুব হয়েছে, বলেন কেষ্টবাবু, আর ঝগড়াঝাঁটি না করে এ[illegible] একটু কাজ কর।

কাজের জন্য রমেশবাবুর মাথা ব্যথা। কিন্তু অনেকেরই কাজ করার চেয়ে কাজ দেখাবার ঝোঁক বেশী। সাড়ে দশটায় আপিস শুরু, দু-চার মিনিট যার-যা আসতে দেরি হয়, সেটা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। কিন্তু আপিসে পৌঁছেও কাজ শুরু করতে কম্‌সে-কম আধঘণ্টা কেটে যায়। ট্রাম থেকে এটুকু পথ হেঁটে আসতে যা পরিশ্রম, গতিক দেখে মনে হয়, আধঘণ্টা বিশ্রামও তার পক্ষে পর্যাপ্ত নয়।

ওহ্, যা গরম! একথা সবার মুখেই লেগে আছে। আজ যা গরম পড়েছে, মরে যাবে সবাই! এমন গরম আর কখনো পড়ে নি।

পড়েছিল আঠার শো তিরানব্বই সালে। তাই ত লিখেছে কাগজে, মন্তব্য করলেন আর একজন।

বেয়ারা হেমচন্দ্রের ফুরসৎ নেই, আগের দিন বিকেলে কুঁজোগুলো ভরে রেখে গেছে, এসে থেকে সবার 'জল-জল' হাঁক মেটাতে হচ্ছে তাকে। পাখা থেকে দূরে যার আসন, তার কাজে বসতে আরো দেরি। পাখার তলায় চেয়ার টেনে নিয়ে বসে থাকে, বলে, রসো বাবু, জানটা একটু ঠাণ্ডা করে নিই।

ভবানীদা সারা টেবিলে ফাইল ছড়িয়ে বসে আছেন। তিনি মন্তব্য করেন, হাওয়া খেয়ে নি! আছ মজায় বেশ! পড় নি ত দুঁদে সায়েবের পাল্লায়, বলেই তিনি শুরু করেন সাহেবদের গল্প। কোন্ সাহেব কবে তাঁর পিঠ চাপড়েছিল, কোন্ কেরানীর কাজের ফাঁকি টের পেয়ে সাহেব কড়কেছিল তাকে। তিনি সাহেবকে ঠাণ্ডা করে ছোক্‌রার চাকরিটা বাঁচিয়ে দেন—এই সব কাহিনী। আর ছাখোনি ত হৃষীকেশ সরকারকে। কি সাংঘাতিক বড়বাবু! একমিনিট কা[illegible] দেরি হলে চশমার ফাঁক দিয়ে উপর দিকে চোখ তুলে বলতেন, আপিসে ছুটি হওয়ার আর কত দেরি? খাতা সাহেবের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি, সেখানে গিয়ে সই করে এসো।

এর পরই শুরু হয় মণিবাবুর টেবিলে পান নেওয়ার পালা। ফাইলগুলি কিন্তু ভবানীদার টেবিলে ঠিক খোলাই আছে। গোটাকয়েক বাণ্ডিল এখানে

ওখানে ছড়ানো। যে-কেউ এসে হঠাৎ দেখলে ভাববে, কি খাটুনিই খাটছে লোকটা। *না-ই বা থাকল চেয়ারে বসে, এক মিনিট উঠে যাওয়ার অধিকার সকলেরই আছে।

টিফিনের আধঘণ্টা আগে থেকেই হেমচন্দর অর্ডার নিতে শুরু করে দেয়।

আপনার ত চারখান লুচি? আপনার ত শুধু চা-বিস্কুট? আর সুবোধ-বাবু ত ফল খাবেন।

মণিবাবু হেঁকে ওঠেন, কি রে সুবোধ, ওই রাস্তার কাটা ফল না খেলেই নয়?

তোর কি মণি, জবাব করেন সুবোধবাবু। গিন্নী পানের মধ্যে সোহাগ পুরে দেয়, তাতেই তোর পেট ভরে থাকে।

বলা বাহুল্য, মণিবাবু টিফিনে কিছুই খান না।

কার কার টিফিন আনতে হয় না, তাও মুখস্থ আছে হেমের। রমেশ-বাবুর টিফিন কৌটো থেকে বেরোয়—চারখানা লুচি, একটি পটল ভাজা, কয়েক টুকরা আলুভাজা, একটি মিষ্টি। আমাকে ঠাট্টা করে বলে সবাই, আপনার ত নেমন্তন্ন, নিত্যি জামাইষষ্ঠী। গিরিজাদার বাড়ী-থেকে-আসা জলখাবারের মধ্যে আমার বরাদ্দ অংশও থাকে।

টিফিন খেতে দশ মিনিট লাগে, কিন্তু বরাদ্দ সময় আধঘণ্টা পেরিয়ে এক ঘণ্টায় গড়িয়ে যায়, লাঞ্চ-গসিপ আর শেষ হতে চায় না।

আশ্চর্যময়ীর গান—

আশ্চর্যময়ী কি দেখাচ্ছ, বলেন ভবানীদা, নরীসুন্দরী শোন নি, সুশীলাও শোন নি। তাই আশ্চর্যময়ী আশ্চর্যময়ী করে চলাচ্ছ। যত সব আদিখ্যেতা!

কেষ্টবাবু বলেন, শান্তি কি শান্তি দিয়েছিল হে সেদিন। আঃ, কবুলে বটে দানী ঘোষ। যখন মুর্চ্ছা যাই নি, মরণ নেই, বুক আমার পাষাণ বলে আর্তনাদ করে ওঠে, তখন কোন দর্শকই স্থির থাকতে পারে না। আর ঘেঁচি দেখেছ?

তুমি ছাখো গিয়ে, আমি তার চেয়ে কালকে 'আলিবাবা' দেখতে যাচ্ছি, কুসির মর্জিনা যত দেখি তত লোভ বেড়ে যায়।

আচ্ছা, বায়োস্কোপ দেখেছেন আপনারা কেউ? প্রশ্ন করে ছোকরা হরিশ। ঠিক যেন জ্যান্ত মানুষ। সে কি আপনাদের কেলে কুসি না মুটকি আশ্চর্যময়ী! খুবসুরত মেমসাহেব।

শ্যাখো হে ছোকরা, বলেন সুবোধবাবু, ওই ছবি নিয়ে মাতামাতি করা তোমাদেরই মানায়। এক সাহেব বলেছিল কি, জান? বাঙালীর প্রেমের দৌড় মনে মনেই। কুসি আর আশ্চর্যময়ী কেলেই হোক আর মোটাই হোক, সশরীরে এসে সামনে হাজির হয়।

আপনার এ কথা কিন্তু মানতে পারলাম না সুবোধদা, বলে হরিশ, কুৎসিত মেয়েমানুষের চেয়ে খুবসুরত মেয়ের ছবিও অনেক ভাল। দেখবেন, ওরি জোরে বায়োস্কোপই মন মজাবে শেষ পর্যন্ত।

এ ছাড়া মোহনবাগানের খেলা আছে। হেরে গেলে কি হয়, ভাল খেলেই হারে তারা রোজ। আর রেফারি ব্যাটারা ত সাহেবদের জেতাবার জন্যেই বাঁশী নিয়ে মাঠে নামে। রাজত্বের জোরে সাহেবদের জিৎ; কিন্তু কুমার, রবি গাঙ্গুলী যখন ওদের ভেল্‌কি নাচন নাচায়, তখন সাহেবদের দুরবস্থা দেখে কোন্ বাঙালী কেরানী না আনন্দ পায়! আর গোষ্ঠ পালের কাছে এগোতে সাহস পায় কটা সাহেব? শুধু বৃষ্টি হলেই যা গোলমাল —একেবারে পাঁচ গোল! শুধু পায়ে কি আর জলকাদা মাঠে দাঁড়ানো য়ায়?

হরিশের বাতিক সব চেয়ে বেশী। সকাল দশটায়ও যদি আকাশের কোন এক কোণে একফালি মেঘ দেখতে পায় সে, মন খারাপ হয়ে যায় তার।

কি হবে দাদা?

হবে আর কি? পাঁচ গোল খাবে মোহনবাগান। উদাসীন ভাবে জবাব দেয় প্রাণকেষ্ট।

খাবে বললেই খাবে? হরিশ উত্তেজিত হয়ে ওঠে। পয়লা ম্যাচে শরৎ সিঙ্গী কি রকম দু-দুটো গোল দিয়ে হারিয়ে দিয়েছিল ডি. সি. এল্. আই-কে? মাঠ শুকনো থাকলে আজো বুঝিয়ে দেবে বাছাধনদের।

ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেণ্টের নলিনী আসে হরিশের কাছে, কটায় বেরুচ্ছ? এবার তাহলে রেকর্ড হচ্ছে? লীগটা পাওয়া যাবে কি? কি খেলাই খেলছে!

লীগ হতে-হতেও হল না। দু-চার দিন হরিশ-নলিনীর দল বিমর্ষ হয়ে রইল, কিন্তু আবার আশা জাগে তাদের মনেঃ শীল্ডের সেমিফাইনালে উঠেছে মোহনবাগান। খেলবে ত কুমোরটুলির সঙ্গে। ছোঃ, ফাইনালে যাওয়া ত নিশ্চিত। তারপর শুকনো মাঠ পেলে দেখে নেওয়া যাবে এক হাত ক্যালকাটাকে।

ক্যালকাটাকে আর দেখতে হল না, কুমোরটুলির কাছেই মাথা কাটা গেল। নিরাশ হয়ে হরিশ বললে, না, আমাদের জীবনে আর হবে না। এক জোড়া বুট নিয়ে কুমোরটুলিকে জিতিয়ে দিল ব্যাটা হুইটলে!

নলিনী বলে, আর রেফারি ব্যাটাকেও বলিহারি, কুমারের শট্‌টা পর্যন্ত তর সইল না, বাঁশী বাজিয়ে দিলে!

তর সইয়ে আর লাভ কি হত, আছাড় খেয়ে পড়ত, বলেন সুবোধ-বাবু। বাবুরা আসবেন যুদ্ধ করতে! বলবেন, বারুদ আমার ভিজে!

ভবানীদা জিজ্ঞাসা করেন, হরিশ, কাল রাত্তিরে খেয়েছিলি? আমাদের পাড়ার শশী ঘোষের বউ ত স্বামীকে খাবার অনুরোধ জানাতে গিয়ে বকুনি খেলে—মাগী, তুইও কোমোরটুলির দলে!

আপিসে কাজ করি, সকলের আড্ডা আলোচনায় বাগিন্দ্রিয় কদাচিৎ ব্যবহার করলেও শ্রবণেন্দ্রিয়কে সব সময় সজাগ রাখি। টিফিনের সময়টা কাটে গিরিজাদার ঘরে। সাহেব-সুবোদের বড় একটা ধার ধারি না।

সেদিন আপিসে পৌছবার মিনিট দশেকের মধ্যেই কেষ্টবাবু এসে আমার পাশে দাঁড়িয়ে বললেন, করেছেন কি মশায়, সায়েব যে আপনার ওপর চটিতং। আপনাকে পাঠিয়ে দিতে বলেছে তার কাছে। যান, চাকরি বাঁচান এবার।

চাকরি বাঁচার কথা উঠছে কেন? আপনার সাহেবকে আমি চোখেই দেখলাম না, যদিও দেখে থাকি, চিনি না তাকে। তার আমার উপর চটবার কি থাকতে পারে?

আরে, সে জবাব কি আমি দেবো মশায়, বলেন কেষ্টবাবু, নিজেই গিয়ে শুনে আসুন।

অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট অ্যাট্‌ল-হোয়াইট এর কামরার দরজায় আসতেই চাপরাসী জানালে, ঘরে অন্য লোক আছে।

একটু অপেক্ষা করলাম। সেই অন্যলোকটি বেরিয়ে যেতেই ঢুকে পড়লাম ভিতরে।

Have you sent for me, sir?

সাহেবের সঙ্গে কথাবার্তা ইংরেজীতেই হয়েছিল, কিন্তু তা বাঙলায় প্রকাশ করাই সমীচীন মনে করছি।

সাহেব বললেন, তুমি কতদিন এ আপিসে কাজ করছ?

দু সপ্তাহ, আমি জবাব করলাম।

তুমি কি জান না যে, আপিসের নিয়ম আছে, কোন সিনিয়র অফিসার এসে পড়লে বাবুরা লিফ্‌ট থেকে নেমে তাকে আগে যেতে দেবে?

না, সে নিয়মের খবর আমি জানি না। আর সে নিয়ম থাকলেও আমি সে নিয়মকে অন্যায় বলে মনে করি।

কথা শুনে সাহেব আমার দিকে এমন ভাবে তাকালে যে, রাগ নয়, বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েছে সে। টাকে আর পাকে তার মাথা বৃদ্ধত্বের ঘোষণা করছে, সেই বৃদ্ধের বিস্ময়ে আমার ভয় হল না এতটুকু, কৌতূহলই বোধ করলাম।

আবার বললে সাহেব, কি বলতে চাও তুমি? আপিসের এ নিয়ম অন্যায়?

কেরানীকে সময় মত হাজিরা দিতে হবে। যে নিয়ম যথাসময়ে উপস্থিত কেরানীকে লেট্‌ করিয়ে দেয়, সেই নিয়মকে কেরানী হয়ে আমি ন্যায় বলতে পারি না।

তার মানে?

আমি লিফ্‌ট ছেড়ে নেমে দাঁড়ালে আমার আপিসে লেট হত। অথচ আমিই এসেছি আগে। পরে আসা লোককে আগে যাওয়ার সুযোগ দিতে হবে, এ নিয়ম কখনই ন্যায় হতে পারে না।

তা বলে বড়র সম্মান দেবে না তুমি? সাহেবের টাক এবং মুখ লাল টকটকে হয়ে গেছে।

আমি বললাম, মান অপমানের প্রশ্নই ওঠে না এখানে। যে আগে এসে আগে যাবে তার মান বাড়ল, আর যে পরে এসেও আগে যেতে

পারল না তার হল অসম্মান, এর মধ্যে যুক্তি আমি কোন মতেই খুঁজে পাচ্ছি না।

ছাখো যুবক, তোমার মনোভাবের মধ্যে আমি ঔদ্ধত্যেরই পরিচয় পাচ্ছি। যাক, কাজ কর গিয়ে।

আমি এসে কাজে বসতেই দেখলাম সাহেবের চাপরাসী এসে কেষ্টবাবুকে আবার ডেকে নিয়ে গেল।

মিনিট পনর পর ফিরলেন কেষ্টবাবু। এসে আমাকে বললেন, আপনি ত বড় তেড়িয়া লোক মশায়! সায়েবকে আসতে দেখেও লিফ্‌ট ছেড়ে নেমে দাঁড়ান নি, তার উপর তর্ক করে এসেছেন—এ নিয়ম নাকি অন্যায়!

আলবৎ অন্যায়, আমি বললাম।

সায়েবের রাজত্ব, বললেন কেষ্টবাবু, সায়েবের আপিস, তাদের খুশিমত চন্দ্রসূর্য ওঠে আকাশে। আপনি কি-না তাদের ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্ন তুলছেন! চাকরি করতে হলে ও সব ন্যায়-অন্যায় ভুলে যান মশায়। সায়েব ফাদার, সায়েব মাদার, সায়েব চৌদ্দ পুরুষ।

আমি বললাম, টাটকা চাকরি করতে এসেছি কি না, কাজেই এখনো ভোলা সম্ভব হয়নি। সাহেবকে সেলাম দিতে দিতে শিরদাঁড়া যখন বেঁকে যাবে, তখন দৃষ্টি থাকবে একমাত্র তাদের পা-ঢাকা জুতোর উপর। ইহকাল পরকালের মোক্ষ বলে তাকেই মনে করব। কিন্তু এখনও তার অনেক দেরি।

ঘরের আর সব কেরানী আমাকে ঘিরে ফেলেছে, সুবোধবাবু বললেন, বলেন কি মশায়! আপনি সায়েবের মুখের উপর বললেন, আপিসের নিয়ম অন্যায়?

ঠ্যালা সামলাও এখন, স্বাভাবিক বক্রদৃষ্টি হেনে বললেন ভবানীদা, কবি এনেছ আপিসে, সে এখন তার ন্যায়-অন্যায়ের ফিরিস্তি বোঝাবে! গেল, আপিস শুদ্ধ সকলের চাকরি গেল এবার!

হেসে বললেন মণিবাবু, সবার চাকরি যাবে কেন ভবানীদা?

যাবে না? আমাদের ন্যায়-অন্যায় ওদের ঘাড়ে চাপাতে গেলে কাল যদি বলে আপিস তুলে দেবো? হাজার হোক ওদেরই ত আপিস!

ওদের বাবার আপিস, মন্তব্য করলে ছোকরা হরিশ। ও-ও চাকর, আপনি-আমিও চাকর।

যাও না, ওই কথা সায়েবের মুখের সামনে বলে এসো, বুঝবো মুরদ, ভ্রূকুটি করে ভবানীদা বললেন। কি হে মণি, এবার বুঝছ, কেন সবার চাকরি যাবে? যত সব স্বদেশী এনে জুটিয়েছ! আরে সায়েব—সায়েব; কেরানী—কেরানী, একেবারে দু জাত। যেমন মানুষ আর বাঁদর। এটুকু যদি না মেনে নিয়েছ, তবে আর চাকরি করা চলবে না।

রমেশবাবু এতক্ষণ পর্যন্ত নিজের কাজই করছিলেন, মুখ ফিরিয়ে বললেন, আমরা যে সবাই বাঁদর তার প্রমাণ ত অকারণ কিচির-মিচিরেই পাওয়া যাচ্ছে। আর যে নিয়ম-নিয়ম বলেছেন আপনারা, কত নম্বর অফিস অর্ডারে লেখা আছে যে সাহেবকে লিফ্‌ট ছেড়ে দিতে হবে? আপনারা দেন বলেই ত আর তা নিয়ম হয়ে ওঠে না!

যা পাঁচজনে করে তাই নিয়ম, বললেন কেষ্টবাবু। পবিত্রবাবু নিয়ম না মানেন, ঠ্যালা তিনি সামলাবেন। আমি বলে দিয়েছি সায়েবকে, উনি অডিটারের লোক, তাঁকে বলতে।

টিফিনের সময় খাওয়া শেষ করে গিরিজাদার সামনের টেবিলে ঠ্যাং দুটো তুলে দিয়ে আরামে সিগারেট ফুঁকছি, আর গিরিজাদার কাছে ঘটনাটা বলছি। এমন সময় গট্‌গট্‌ করে বুড়ো সাহেব এসে ঢুকল ঘরে। একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেল আমাকে ও অবস্থায় দেখে। আমিও তাড়াতাড়ি পা নামিয়ে সোজা হয়ে বসলাম।

He is your friend? সাহেব জিজ্ঞাসা করলে গিরিজাদাকে। তাই বুঝি, আপিসের নিয়মে দোষ ধরার অধিকার ওর আছে? অডিটারের বন্ধুও অডিটার নাকি?

প্রশ্নের জবাব আমিই দিলাম, কেরানী বা অডিটারের প্রশ্ন নয়, সহজ ন্যায়-অন্যায় বোধটুকু যে-কোন লোকেরই থাকতে পারে। আমি বুঝতেই পারছি না, আমি অন্যায়টা করলাম কোন্‌খানে। লিফ্‌টে জায়গা ছিল, তোমার নীচে দাঁড়িয়ে থাকার কোন প্রয়োজনই ছিল না।

কেরানী আর অফিসার একই লিফ্‌টে যায় না—এ-ই রেওয়াজ, বললে সাহেব।

গিরিজাদা জবাব করলেন, সারা দিন যাকে নিয়ে কাজ করা যায়, এক মিনিট তার সঙ্গে লিফ্‌টে উঠতে কোন আপত্তির কারণ থাকতে

পারে না মিঃ অ্যাট্‌ল-হোয়াইট। তা ছাড়া, তোমার কেরানীরা সবাই শিক্ষিত ভদ্রলোক, ডার্টি কুলিজ নয়।

আমি এ নিয়ে কোন বিটার কনট্রোভার্সি চাই নে মিঃ বোস, বললে সাহেব। আমি তোমার সঙ্গে এমনি দেখা করতে এসেছিলাম। একটা সিগারেট নিতে পারি? বলে সাহেব টেবিলের উপর-রাখা পাঁচশো পঞ্চান্নর কৌটোটার দিকে দৃষ্টি দিলেন।

গ্ল্যাড্‌লি, বলেই কৌটোর মুখটা খুলে আমি উঁচু করে ধরলাম।

তোমার? সিগারেটটা তুলতে তুলতে জিজ্ঞাসা করলে সাহেব।

আমি চুপ করেই রইলাম। এবং সাহেব সিগারেটটা ঠোঁটের ফাঁকে রেখে পকেটে হাত দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশলাই জ্বালিয়ে ধরিয়ে দিলাম।

থ্যাঙ্ক ইউ, বলে আর একটি সিগারেট তুলে নিল সাহেব। তারপর রাইট ও, মিঃ বোস, বলে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

সাহেবের সঙ্গে এর পর আর আমার চাক্ষুষ হয় নি। কিন্তু রোজই টিফিনের সময় গিরিজাদার ঘরে সাহেবের চাপরাশি এসে হাজির হত, সাব সিগ্রেট মাঙা। প্রথম দিনের হিসেব মত দুটি করে সিগারেট আমি বেয়ারার হাতে তুলে দিতাম।

একদিন হেসে মণিবাবু বললেন, কই ভবানীদা, চাকরি ত কারুরই গেল না, মায় পবিত্রবাবুও বহাল তবিয়তে রয়েছেন।

জবাব দিলেন কেষ্টবাবু, সে খবর বুঝি জানো না, সন্ধি হয়ে গেছে। শর্ত, পবিত্রবাবু রোজ দুটি করে পাঁচশ পঞ্চান্ন সিগারেট খাওয়াবেন সায়েবকে।

মন্তব্য করলে হরিশ, ব্যাটা কিপ্টে, তৃতীয় পক্ষের ছুকরী বউয়ের শখ মিটিয়ে নিজে ত খায় হাওয়া গাড়ী, পাঁচশ পঞ্চান্নর গন্ধ পেয়েছে যার কাছে, তার উপর রাগ হলেও সেটা মনে রাখতে পারে না।

বেলা বারটার সময় হন্তদন্ত হয়ে আপিসে ঢুকলেন সুবোধবাবু। চেহারা দেখেই বোঝা যায়, স্নানাহার কিছুই হয় নি। ব্যাপার কি? বলে সবাই ঘিরে ধরল সুবোধবাবুকে।

ভীষণ বিপদ ভাই, হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন সুবোধবাবু। ছেলেটা

সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে হাত ভেঙ্গে ফেলেছে, হাসপাতাল থেকে ব্যাণ্ডেজ করিয়ে বাড়ী পাঠিয়ে তবে আপিসে আসছি।

স্বাভাবিক ভ্রূভঙ্গী করে বললেন ভবানীদা, কে তোমায় আপিসে আসার জন্য গলায় দড়ি দিয়ে টেনেছে?

না, না, তবে কি-না—

সুবোধবাবু আমতা আমতা করছিলেন, কেষ্টবাবু বললেন, ব্যাপারটা কি হল বল দেখি? কম্পাউণ্ড ফ্র্যাকচার?

অত শত বুঝি না আমি, বললেন সুবোধবাবু, পা পিছলে সিঁড়ি থেকে গড়িয়ে পড়েছে। দশ মিনিটের মধ্যে হাতটা ফুলে গেল, তার উপর অসম্ভব ব্যথা। হাসপাতালে বললে, ফ্র্যাকচার হয়েছে।

তোমার ত খাওয়া-দাওয়া হয়নি দেখছি, কেষ্টবাবু বললেন, তা বাড়ী চলে যাও।

একটা জরুরী ফাইল ছিল আমার কাছে।

ফাইলটা আমাকে দিয়ে যাও। আমি ব্যবস্থা করে নেবো'খন।

সুবোধবাবু ফাইলটা খুলে কি দেখাতে যাচ্ছিলেন, ভবানীবাবু ধমক দিলেন একটা, আচ্ছা বাপ যাহোক, ছেলের হাত ভেঙেছে, উনি মরছেন আপিসের ফাইলের ভাবনায়। ওরে বাবা, আপিসের আর লোকগুলি ত মরে যায় নি, যাও এখন বাড়ী গিয়ে খাওয়া-দাওয়া করে ছেলের পাশে বসে একটু বিশ্রাম কর।

সুবোধবাবু বাড়ী যাওয়ার জন্য তৈরি হন, কিন্তু সবাইয়ের কাছেই একবার করে ইমপর্‌টেণ্ট ফাইল্‌টা ডীল না করে ফেলে চলে যাওয়ার জন্যে উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

মণিবাবু বললেন, ছাখ্‌ সুবোধ, তুই আপিসে একবার করে আসতে চাস, আসিস, বারণ করব না; কিন্তু কাজ নিয়ে কিচ্ছু মাথা ঘামাতে হবে না তোকে।

কেষ্টবাবু বললেন, সুবোধ, ছুটি নিতে চাও ত বল, সায়েবকে বলে করে দিচ্ছি।

ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা ছেলে বিছানায় পড়ে থাকবে, বললেন সুবোধবাবু, আমি তার পাশে বসে ত আর বিশল্যকরণী বুলিয়ে দেবো না।

আসল কথা সুবোধদা, আপিসে না এলে মন ভাল লাগে না, না? হরিশ বলে।

তোমরা ছোকরারা ত যে-কোন ছুতোয় ডুব মারতে পারলেই খুশী, ভবানীদা বলেন। জান, আমার তেইশ বছর চাকরিতে তেইশ দিনও ছুটি নিই-নি।

আশ্চর্য ভবানীদা, গম্ভীর ভাবে বলে হরিশ। আজও আপিসে আপনার স্ট্যাচু হল না?

তার মানে? অগ্নিশর্মা হয়ে বলেন ভবানীদা, স্ট্যাচু তৈরি করবে কেন?

হরিশ বলে, করবে না-ই বা কেন? এমন লয়েল সার্ভিস!

যারা খেতে পরতে দিচ্ছে তাদের প্রতি লয়েল হব না ত কার প্রতি হব? বলেন ভবানীদা।

সুবোধবাবু চলে গেছেন ততক্ষণে। রমেশবাবু এসে কেষ্টবাবুর কাছে নালিশ করলেন, একি অবিচার বড়বাবু! যে ফাঁকি দিতে পারে না, তারই ঘাড়ে আপনারা সব গছাবেন? বলবেন ভেরী গুড ক্লার্ক, লেট হিম্ ডু ইট্; আর যে পান খেয়ে আড্ডা দিয়ে ঘুরে বেড়াবে তার ফাঁকি দেওয়ার ব্যবস্থা দিব্যি বহাল থাকে!

গুড্ ক্লার্ক—স্বীকৃতিটাই কি কম কথা, কেষ্টবাবু বলেন।

রমেশবাবু জবাব করেন, তার জন্য একটা ইন্‌ক্রিমেণ্ট, কি, একটা প্রমোশন পাওয়া যাবে কি? সেখানে আপনাদের খালি সিনিয়রিটির প্রশ্ন।

হেমচন্দর এসে হাজির হয়েছে, টিফিনের লিষ্টি বানাবে। কেষ্টবাবু নিজের টেবিলে এসে বসলেন, রমেশবাবুকে বলে এলেন, তোমার উপর নির্ভর করতে পারি বলেই ত দায়িত্ব চাপাই। সুবোধের ফাইলটা তোমাকেই ডীল করতে দেবো ভাবছিলাম—

সে আমি একশোবার করব, রমেশবাবু বলেন, কারণ, তার বিপদের সময় এটুকু না করলে চলবে কেন?

আমার তিন মাসের মেয়াদ হু হু করে কেটে গেল, কেষ্টবাবু বললেন, নতুন স্কীমের জন্য আবার লোক নেবে পবিত্রবাবু, আর একটা নতুন দরখাস্ত দিয়ে দেবেন।

আমার স্ত্রী ও সন্তান থাকা সত্ত্বেও তখন পর্যন্ত আমি ছা-পোষা গৃহস্থ

হয়ে উঠি নি, এ ক'দিনের কেরানী-জীবনেই বেশ বুঝতে পেরেছি, যে বৃহত্তর জীবন আমার স্বপ্ন ও সাধনা, তার সঙ্গে যোগসূত্র ঢিলে হয়ে আসছে। এখানে পাকাপাকি বাসা বাঁধলে সে সম্পর্কে ছেদ অনিবার্য। সবার পক্ষে হয় ত নয়, কিন্তু এখানকার পরিবেশের সঙ্গে মিলে গিয়ে অন্য জগতের জন্য আমার মনের কোন অংশকে আমি পৃথক করে রাখতে পারি না। তা ছাড়া, সকাল বেলা উঠে প্রতিদিন আপিস যাওয়ার তাড়া আমার একেবারেই বরদাস্ত হচ্ছে না। 'সবুজ পত্র'-এর চাকরি ত আছেই। তাই নতুন করে আর দরখাস্ত করলাম না।

বিদায় নিয়ে যেদিন চলে আসি কেষ্টবাবু বললেন, আপনি থাকলে আমরা খুশী হতাম সত্যি।

ছাখো, কবি মানুষের প্রতি মনের টান না হওয়াই ভাল, বললেন ভবানীদা, ওরা মুখেই মনের কথা বলে, কিন্তু মন বলে কোন পদার্থই ওদের নেই।

দিনের বেলা কেরানীর কাজ নেওয়ার পর থেকে রবিবার সকালটা আমার নিয়মিত 'কমলালয়' যেতে হয়, 'সবুজপত্র'-সম্পর্কে চৌধুরী মহাশয়ের সঙ্গে কথাবার্তা কওয়ার এইটেই সময়।

এই সময়, ১৯১৯ সালে, তাঁর ছোটগল্প-সংগ্রহ 'আহুতি' প্রকাশিত হয়। শেষ ফর্মার ছাপার নির্দেশ আমার হাতে ধরে দিতে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ভূমিকা কিম্বা উৎসর্গ কিছু থাকবে না?

ভূমিকায় কোন দরকার নেই, বলেন চৌধুরী মহাশয়, তবে উৎসর্গ—কাকেই বা করব, সবাইকেই ত করা হয়ে গেছে। তুমি কিছু সাজেস্ট করছ পবিত্র?

আমি বললাম, শরৎবাবুকে—

খাসা বলেছ। চোখ-মুখ-কণ্ঠ সর্ব অঙ্গ দিয়ে যেন খুশী উপচে পড়তে লাগল তাঁর। কি রকম ভুলো হয়েছি দেখেছ। এটা ত আমার নিজেরই মনে আসা উচিত ছিল, অথচ এককথায় তোমায় বলে দিলাম—আর কেউ নেই। তা হলে লিখে ফেলো।

তিনি বললেন, আমি লিখে নিলাম, পাঠিয়ে দিলাম ছাপাখানায়।

বই যখন বেরুল, তখন আমারই উপর ভার পড়ল বাজে-শিবপুরে তা পৌঁছে দেবার। রবিবার বিকেলে এসে হাজির হলাম। শরৎদা একাই বসে তামাক টানছিলেন, ভেলুটা পায়ের কাছে শুয়ে। আমি ঘরে ঢুকতেই ভেলু একবার মেজাজী দৃষ্টি হানলে, তারপর আবার মাথা কাত করে চোখ বুজলে।

পবিত্র, কি মনে করে? চাকরি-বাকরি করছ শুনলাম।

কেরানী হয়েছি। কিন্তু গিরিজাদার সুবাদে সেখানে মেজাজ দেখিয়ে চলেছে লাটসাহেবী।

শুনেছি সব গিরিজার কাছে, হেসে বললেন দাদা, এটা কি পূর্ববঙ্গের মাটির গুণ, না, বালিগঞ্জের ভাতের, এ সমস্যার সমাধান করতে পারিনি আমি।

আমি কিন্তু এক কথায় এর জবাব দিতে পারি। এর মূলে আছে গিরিজাদার স্নেহলাভের দম্ভ।

প্রচ্ছন্ন দম্ভ মনে মনে কোন না কোন বিষয়ে সবারই থাকে, বললেন শরৎদা, এগোইজম্ হয় ত নিন্দনীয় কিন্তু নিজের সম্বন্ধে একেবারে বৈষ্ণবী দীনতা—এও আমার অসহ্য লাগে। যাক্, কেরানীগিরির সঙ্গে 'সবুজপত্র'-সেবার কোন বিরোধ বাধে নি ত?

চৌধুরী মহাশয়ের কোন আপত্তি নেই জেনেই ত ভরসা করে চাকরি নিয়েছি।

সে খবরও আমি পেয়েছি গিরিজার কাছে। তোমার কাছে যা জানতে চাইছি, তা হল, দশটা-পাঁচটা চাকরি করে 'সবুজপত্র' ও চৌধুরী মশায়ের সঙ্গে সংযোগ ঠিক রক্ষা করা যাচ্ছে কি না।

প্রতি রবিবার সকালে তাঁর কাছে হাজিরা দিই। এবং প্রয়োজন মত ছাপাখানায়ও গিয়ে থাকি।

চৌধুরী মশায়ের খবর কি? জিজ্ঞাসা করলেন দাদা।

নতুন গল্পের বই বেরিয়েছে, তারই একখানা আপনাকে দেবার জন্য আমাকে পাঠিয়েছেন, আজ নিজের তাগিদে আসি নি।

আমাকে বই দেবার জন্যে তোমাকে পাঠিয়ে দিলেন! হল কি চৌধুরী মশায়ের? ব্যাপারটা বড় বেখাপ্পা ঠেকছে হে।

আপনি কি বলতে চান, আপনার প্রতি তাঁর কোন প্রীতি নেই?

তিনি উদার-হৃদয় লোক, তাঁর বসুধৈবকুটুম্বকম্ এবং স্বভাবত তিনি স্নেহশীল। সে হিসেবে আমাকেও ভালবাসেন, তা আমি জানি। কিন্তু তিনি হলেন অভিজাত-বিদগ্ধচূড়ামণি, আর আমি শরৎ চাটুজ্যে—এ কথা ত ভুলতে পারিনে। কোথায় বালিগঞ্জ, আর কোথায় বাজে-শিবপুর। 'চার-ইয়ারি কথা' আর 'চরিত্রহীন'—এ দুটোর জাতই যে সম্পূর্ণ আলাদা।

জাত আলাদা হলেই একটি বড় আর একটি ছোট—এই ছুঁৎমার্গ, আর তা নিয়ে লাঠালাঠি—সে দিন কি আজ আছে?

নিশ্চয়ই আছে। প্রতিদিনের জীবনে দেখতে পাচ্ছি,—দুনিয়ার সর্ব সমাজে।

কিন্তু মনীষী যাঁরা, তাঁদের সাধনাই ত এই বিরোধ দূর করা। আপনি কেন মনে মনে রাগ পুষে রাখবেন?

চৌধুরী মশায়ের প্রতি রাগ পুষে রাখব, এ তুমি ভাবতেও পারলে পবিত্র? তবে সাহিত্যের বাজারে যে কামড়া-কামড়ি চলছে তাতে সত্যি মেজাজ খারাপ হয়ে যায়।

খবরের কাগজে মোড়া প্যাকেটটি দাদার হাতে এগিয়ে দিলাম।

সাগ্রহে বইটি খুললেন কিন্তু উৎসর্গ-পৃষ্ঠা খুলতেই তাঁর মুখের চেহারা অসম্ভব গম্ভীর হয়ে গেল। হাত থেকে গড়গড়ার নলটা নামিয়ে রাখলেন।

মিনিট খানেক চুপ করে থেকে বললেন, লোকে মিথ্যে বলে না, বড় বড় পণ্ডিতদের কাণ্ডজ্ঞান থাকে না, অন্তত সারা বাঙলার পণ্ডিত সমাজ চৌধুরী মশায়ের সম্বন্ধে এ ধারণা করে নেবে। গলাবাজি করে বলতেও ছাড়বে না। সাবিত্রীকে যে এনে মেসের ঝি বানিয়েছে আর তাকেই করেছে উপন্যাসের নায়িকা, বিনোদিনীর বটতলা সংস্করণ কিরণময়ীকে দিয়ে যে পুরুষ মানুষকে ঘরের বার করিয়েছে, কোন রুচিশীল লোক তাকে সাহিত্যিক বলে স্বীকার করেও সমাজে মাথা তুলে বেড়াতে পারে, এ ত আমি ভাবতেই পারছি না। আমিও ত কুকুর পুষি, কিন্তু কোন্ কুকুর-বিলাসী ভেঁলুকে পোষা কুকুরের মর্যাদা দেবে? একটু থেমে আবার বললেন, আমি চৌধুরী মশায়ের জন্যে দুশ্চিন্তা বোধ করছি পবিত্র। আর সব ত দূরের কথা, জোড়াসাঁকো না ওঁকে বয়কট করে।

জোড়াসাঁকো সম্বন্ধে আপনার এ ধারণা কেন? আমি বললাম, সেখানে সংকীর্ণতার অবকাশ নেই, এ আপনি নিশ্চয় জানবেন।

উদারতা-সংকীর্ণতার কোন প্রশ্নই তুলছি না, বললেন দাদা, অভিজাত এবং ব্রাত্যের মধ্যে যে শাশ্বত ব্যবধান—সেটা ভাঙবার যে চেষ্টা করে, সে ত সাংঘাতিক বিপ্লবী। সুষ্ঠু সমাজ-জীবন ও সংস্কৃতির যাঁরা ধারক ও বাহক তাঁদের পক্ষে এহেন বিপ্লবীকে সহ্য করা সম্ভব নয়।

দিন কয়েক পরে আবার শরৎদার কাছে এলাম, 'আহুতি' সম্পর্কে শান্ত মনে তিনি কি বলবেন তা জানবার আশায়।

বইখানি আগাগোড়া পড়েছি, বললেন দাদা, এই নিয়ে আহুতি গল্পটি চার বার পড়া হল।

তা ত হল, কিন্তু আপনি যে ব্রাত্য সমাজের লোক, ভদ্র সমাজের আচার মেনে না চলে তাই কি জাহির করতে চান? আমি বললাম।

কেন বল ত? আচার আমি মানি না, কিন্তু সচেতন ভাবে লঙ্ঘন করে চলতেও আমার আনন্দ নেই।

বইখানার একটা প্রাপ্তি-স্বীকার পর্যন্ত করলেন না!

সেটা আমার দোষ নয় পবিত্র। চিঠি লেখার ব্যাপারে আমি যে কি অগাধ কুড়ে সে খবর দুনিয়া শুদ্ধ সবাই জানে, আর তুমি জান না? তবু এই দেখ লিখতে শুরু করেছিলাম—

পাশের ছোট টেবিলের উপর হাত বাড়িয়ে অসমাপ্ত চিঠিখানা আমার হাতে তুলে দিলেন। আমি চিঠিটা পড়তে থাকলাম। শরৎদা বলে গেলেন, সে দিনই লিখতে বসেছিলাম, তারপর কারা এল, আর শেষ করা হল না।

অসমাপ্ত চিঠিখানিতে লিখেছেন:

বাজে শিবপুর। হাওড়া।
১লা আগষ্ট, '১৯

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

পবিত্র 'আহুতি' দিয়ে গেছে। আর তার গোড়াতেই আমার নাম ছাপা। ওটার ওপর যার চোখ পড়বে তার চোখ যে শুধু ওখানেই থাকবে না,—কপাল পর্য্যন্ত ঠেলে উঠবে এ আমিও দিব্য চোখে দেখতে পাচ্ছি। তার পর চোখ যখন নামবে তখন অনেক দূর পর্য্যন্ত নামবে। তারা

বলবে, এ তো জানা কথা। সংসারে কবি এবং বড় বড় পণ্ডিতদের কাণ্ডজ্ঞান থাকে না, অতএব প্রমথবাবুর কাজটা না হয় বোঝা যায়। কিন্তু এই লোকটার কি স্পর্দ্ধা! আমাকে তারা কোন মতেই ক্ষমা করবে না, এবং যে সকল বাক্য উচ্চারণ করবে তা কল্পনা করেই আমি যেন কাঠ হয়ে গেছি। কিন্তু, কি করা যাবে।

বইখানি আবার আগাগোড়া পড়লুম। 'আহুতি' গল্পটি এ নিয়ে চার বার পড়া হ'ল। ঠিক এর জোড়া আমি আর দেখতে পাইনে।

সেদিন সুরেন মৈত্রের (শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ) সঙ্গে 'চার-ইয়ারি'র আলোচনা হচ্ছিল। এক সত্যিকারের সমজদার লোক। অর্থাৎ, সমজদার আমি তাঁকেই বলি যাঁর সঙ্গে আমার মতভেদ হয় না।

আমার একটি আত্মীয় আছেন, তিনি 'দগ্ধ-কচু'র ছোট শ্যালীর মত। যাঁর মুখ দিয়ে প্রায়ই কথা বার হয় না। কিন্তু যখন বেরোয় তখন তার ওজন আশি সিক্কের এক তিল কম নয়। তিনি আপনার জাত-শত্রু। যেমন সাপের নেউল। আপনার লেখার নিন্দে করতে কখনো তাঁর উৎসাহের অভাব দেখিনি। অনেক দিন আগে একটা সাহিত্যের বৈঠকে তিনি 'চার-ইয়ারি'র শ্রাদ্ধ করে বললেন, তে-পলে বেলোয়ারী কাঁচের মত হে, না আছে ভার, না আছে নিজস্ব কোন একটা রং। তিনটে পল্ দিয়ে শুধু তিন শ' রকমের রঙ বেরোচ্চে,—কোনটা পাকা নয়, কোনটা constant নয়,—সব ফাঁকি! সব ফাঁকি!!

এর থেকে বোধ হয় দুটো জিনিস পাওয়া যায়। একটা এই যে, এর তিনটে মুখ দিয়ে তিনশ' রকমের রঙ বার হয়, আর আপনার বইয়ের সম্বন্ধে বিজ্ঞাপন দেওয়া চলে না,—'পড়িতে পড়িতে চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়া যাইবে, —সতী লক্ষ্মীর হাতে দিলে সংসার পবিত্র হইবে, ঘরে-ঘরে সাবিত্রী-সত্যবান বিরাজ করিবে। এমন শিক্ষাপ্রদ বই বাঙ্গলায় আর বাহির হয় নাই।...'

চিঠিখানির লিখিত অংশ পড়া শেষ করে আমি বললাম, আধখানা লিখেছেন, কিংবা পুরোটা লিখে ডাকে দিতে ভুলে গেছেন, একদম না লেখার সঙ্গে তার তফাৎ কতটুকু?

তফাৎ কিছুই নেই, দাদা বললেন, শুধু তোমাকে বোঝাতে চাই, আমি অভদ্র নই, আমি কুড়ে। অবশ্য চৌধুরী মশায়ের প্রতি আমার কর্তব্য আছে।

তাহলে চিঠিখানা এখুনি শেষ করে ডাকে ফেলিয়ে দিন।

না-ই বা দিলাম পবিত্র, তার চেয়ে চলই না, সরজমিনে গিয়ে বক্তব্য জানিয়ে আসি।

আমি উৎসাহিত হয়ে উঠলাম। শরৎদার উৎসাহ তার চেয়েও বেশী, কারণ যে ভাবে বলামাত্র তিনি খাড়া হয়ে উঠলেন, তা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। তাড়াতাড়ি পাঞ্জাবিটা গায়ে চড়িয়ে চাদরখানা হাতে নিয়ে বললেন, চল।

ট্রামে নোনাপুকুর পর্যন্ত এলাম, হাওড়ার পুল অবশ্য হেঁটে পার হতে হল। নোনাতলা থেকে ফিটন ভাড়া করে 'কমলালয়ে' এসে দেখি চৌধুরী মহাশয় নেই, শুনলাম ক্লাবে গিয়েছেন। এত দূর এসে শরৎদাকে নিয়ে ফিরে যাব, মন তাতে কিছুতেই সায় দিল না, বললাম, চলুন ক্লাবেই যাই।

শরৎদা বললেন, চল।

ফিটন ছেড়ে দিয়েছিলাম। কি ভাবে যাব ভাবছি, এমন সময় গাড়ী নিয়ে মাখন এসে ঢুকল, বললে, সাহেবকে ছেড়ে দিয়ে এলাম ক্লাবে।

আমি মাখনকে বললাম আমাদের সাহেবের কাছে নিয়ে যেতে, মাখন দ্বিরুক্তি করলে না।

ক্যামাক স্ট্রীটে এই ওরিয়েণ্ট ক্লাবটি বিলেত-ফেরত কালা আদমীদের মজলিস। বিলেতে কিছুকাল বাস করে তারপর ভারতবর্ষে ফিরে আসতে বাধ্য হয়ে যাদের জীবনটা ব্যর্থ হয়ে গেল, এদেশে জন্মাবার এবং এদেশে বসবাস করবার জন্য তাদের মনের ক্ষোভ দূরীকরণের এইটেই হল অন্যতম আরোগ্যশালা। অর্থাৎ নেটিভ পরিবেশ সম্পূর্ণ বর্জন করে বিলেতী সামাজিক কায়দায় যতটা সম্ভব সময় যাপন করে বিলাত-বাসের বিকল্প স্বাদ আস্বাদনের প্রচেষ্টায় এই ক্লাবে জমায়েত হন সকলে। বিরাট বাড়ী, ঐশ্বর্যময় পরিবেশ, তাস, বিলিয়ার্ড, মদ্য, বলড্যান্স—এই ক্লাবের কর্মসূচী। অবশ্য তাস-বিলিয়ার্ড বলড্যান্স—এ সবে যাদের বৈরাগ্য, এমন দু-চার জনও যে এখানে যাতায়াত করেন না, তা নয়। সমপদস্থ ব্যক্তিদের সঙ্গে সামাজিকতা রক্ষার প্রয়োজনে এখানে আসা কিছুটা অপরিহার্য।

আমি ইতিপূর্বে চৌধুরী মহাশয়ের সঙ্গে এখানে এসেছি। শরৎদা বললেন, এ কোথায় নিয়ে এলে পবিত্র? একেবারে অচেনা রাজ্য।

আমি বললাম, তীর্থে পৌঁছতে হলে পথের কষ্ট এবং পথের অপরিচিতি গায়ে মাখলে চলবে কেন দাদা!

সে কথা ঠিক, বললেন শরৎদা, এখন দেবতার দেখা পেলেই রক্ষা।

আমি শরৎদাকে দাড়াতে বলে সাহেবকে খুঁজতে লাগলাম।

হল ঘর পেরিয়ে উত্তরের বারান্দার একটা নির্জন কোণে একাকী একটা ইজিচেয়ারে বসে আছেন চৌধুরী মহাশয়। পাশে টিপয়ে পানীয় ও সিগারেটের টিন, হাতেও সিগারেট কিন্তু চোখ এবং মন নিবদ্ধ হয়ে আছে কোলের উপর রাখা একখানা বইয়ে।

খুব কাছে আসতে চৌধুরী মহাশয়ের চমক ভাঙল, চোখ তুলে বললেন, কি ব্যাপার পবিত্র? কথার স্বরে কিছুটা উৎকণ্ঠাও প্রকাশ পেল।

বললাম, শরৎদা এসেছেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে।

শরৎবাবু? বিস্ময়ে কিছুটা অভিভূত হয়েই বললেন, আগে যদি একটা খবর দিতে, তাহলে তাঁকে ফিরে যেতে হত না।

ফিরে তিনি যান নি, আমি বললাম, মাখনকে ব'লে এখানেই নিয়ে এসেছি তাঁকে।

এনেছ? কোথায় তিনি?

বাইরে অপেক্ষা করছেন।

তা নিয়ে এসো।

আমি গিয়ে শরৎদাকে সঙ্গে করে নিয়ে এলাম।

চৌধুরী মহাশয় খানিকটা এগিয়ে এসেই অভ্যর্থনা করলেন, কি ব্যাপার?

ধন্যবাদ জানাতে এলুম, বললেন শরৎদা। আপনি আমাকে 'আহুতি' উৎসর্গ করেছেন।

যোগ্য ব্যক্তিকে সম্মান দিয়েছি আমি, বললেন চৌধুরী মহাশয়। এর মধ্যে ধন্যবাদের অবকাশ কোথায়?

বয় চেয়ার দিয়ে গেল। শরৎদা বসলেন, আমিও। শরৎদা বললেন, ধন্যবাদটা আমার ব্যক্তিগত, কিন্তু আর পাঁচ জনের পক্ষ হয়ে কিছুটা সাবধান বাণীও আপনাকে জানান দরকার।

সাবধান বাণী! চৌধুরী মহাশয়ের চোখে মুখে বিস্ময়।

হ্যাঁ, সাবধান বাণীই, বলে চললেন শরৎদা, লোকে বলে থাকে, বড় বড় লেখক এবং মনীষীদের সাধারণ বুদ্ধি কম। এর পর আপনার সম্বন্ধে লোকে বলবে—ভীমরতি হয়েছে। নইলে শরৎ চাটুজ্যেকে বই উৎসর্গ করে!

হেসে ফেললেন চৌধুরী মহাশয়, বললেন, গায়ের জ্বালায় অনেকেই

অনেক কিছু বলে, আপনি আমি তাদের কথায় গলে পড়লে চলবে কেন? হয়ত সাধারণ বুদ্ধি আমাদের কম, কিন্তু আমরা যে অসাধারণ বুদ্ধিতে বিশ্বাসী।

আপনাকে তারা অসাধারণ বলে মেনে নিলেও শরৎ চাটুজ্যেকে ইতর বলেই গালাগাল করে।

আর প্রমথ চৌধুরীকেও কেউ গালাগাল করে না—এ কথাও আপনি হলফ করে বলতে পারেন না। বললেন চৌধুরী মহাশয়, এর জন্যে দুঃখ করলে কি হবে? তার চেয়ে বাগানের চাষ করে যাওয়াই ভাল।

শরৎদা জবাব করলেন, ফুল ফোটাতে আপনি পারেন, তাই হুল আপনার গায়ে লাগে না; অনেক মধুর ভাণ্ডারী কি-না। 'আহুতি' অনেকবার পড়েছি। পবিত্র যেদিন বই দিয়ে আসে, তার পরেই আবার পড়ি। এমন গল্প আর কেউ লিখতে পারে—আমি ভাবতেই পারি না।

আর আপনি যা লেখেন, সে লেখাও আর কেউ লিখতে পারে কি?

টিপয়ের উপর ছোট্ট বইখানায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করে শরৎদা জিজ্ঞাসা করলেন ওখানা কি বই?

দান্তের 'ডিভাইন কমেডী,' বলেই বইখানা এগিয়ে দিলেন চৌধুরী মহাশয়।

ইংরিজি ভাল জানি না, তায় আবার ল্যাতিন।

মূল ল্যাতিন নয়, এখানা ইতালীয়ান অনুবাদ। বললেন চৌধুরী মহাশয়।

শরৎদা বললেন, ইংরিজিটাও যদি ভাল জানতাম তা হলেও ভাবনা ছিল না। বাইরের দুনিয়ার সাহিত্য-সম্পদ আমার অজানাই রয়ে গেল।

ঠিক অতটা বিনয় আমার কাছে না করলেও পারতেন শরৎবাবু, হেসে বললেন চৌধুরী মহাশয়, আপনার খবর একেবারে জানি না তা নয়। বাইরের দুনিয়াটা যদি আপনি কমই জেনে থাকেন, দেশের মানুষকে ত প্রাণে প্রাণে জেনেছেন, সেটাই কি কম কথা! মাঝে মাঝে মনে হয়, মানুষকে অবহেলা করে আমরা যারা লেখাপড়া নিয়ে মজে থাকি তাদের জীবনে বিরাট ফাঁক থেকে যায়। কিছুটা ফাঁকিও।...

গল্প জমে উঠেছে দেখে আমি বললাম, শরৎদা, তাহলে বসুন, আমি চলি।

চৌধুরী মহাশয় বললেন, 'তা তুমি এসো পবিত্র, মাখনকে দিয়ে ওঁকে আমি বাড়ী পৌঁছে দেবো।'

দিন কয়েক পরের কথা। শরৎদার বাড়ীতে এসে বসতেই একখানা চিঠি ও একটি গল্পের পাণ্ডুলিপি আমাকে এগিয়ে দিলেন দাদা, বললেন, ছাখো। ডাকে এসেছে কানপুর থেকে।

চিঠিখানির লেখিকা লীলারানী গঙ্গোপাধ্যায়। গল্পটিও তাঁরই লেখা। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইনি কে?

দাদা বললেন, যতটুকু চিঠিতে আছে তার বেশী কিছু জানিনে।

গল্পটায় কি আছে আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

দাদা জবাব করলেন, সবে পেয়েছি, গল্পটি এখনো পড়িনি, তবে চিঠিতে দেখছি, গল্পটি 'পথ-নির্দ্দেশ'-এর পরিশিষ্ট। তুমি বরং পড়ে দেখো।

শরৎদা পড়ে দেখতে বলার আগেই আমি গিলতে শুরু করে দিয়েছি। একদমে পড়া শেষ করে ফেললাম।

কি, পড়লে?

পড়লাম, ভাষার ব্যাপারে আপনার অনবদ্য অনুকরণ, আর হেম ও গুণীর মিলন।

অর্থাৎ—ইনি বিধবার বিবাহ দিতে চান, এই কি? ইনি ত ব্রাহ্ম-সমাজের নন।

বোধ হয় হেম ও গুণীর অবস্থা দেখে করুণা জেগেছে।

এর মধ্যে প্রশ্ন আছে পবিত্র, শুধু ক্ষণিকের খেয়ালে মনের আপত্তি সত্ত্বেও যদি উনি করুণাপরবশ হয়ে মিলন ঘটিয়ে থাকেন, তাহলে সে মিলনের বিশেষ কোন মূল্য আছে বলে মনে করি নে। যা হোক, আমার কুড়েমি ত জান, তুমিই না হয় আমার হয়ে প্রাপ্তি-স্বীকারটা জানিয়ে দাও। তারপর ভেবে চিন্তে চিঠির জবাব দেওয়া যাবে। আমার বই পড়ে উনি এইটে নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন যে, আমার মতে বিধবা-বিবাহ সমাজে না থাকার জন্য অনেকগুলি বড় এবং সুন্দর জীবন ব্যর্থ ও নিষ্ফল হয়ে গিয়েছে।

তাই যদি আপনার মত হয়, অন্তত আপনার বই পড়লে তাই লোকের ধারণা হবে, তাহলে বিধবা-বিবাহ দিতে আপনি এত সঙ্কোচ বোধ করছেন কেন?

সঙ্কোচ আমি বোধ করি নি পবিত্র, সঙ্কোচ বোধ করেছে সমগ্র সমাজ। এবং সেই সামাজিক আদর্শে লালিত বিধবা মেয়েরা নিজেরাই। বৈধব্যের ব্যর্থতা এবং বেদনায় পুড়ে খাক্ হয়ে গেলেও বৈধব্যের আদর্শ তারা মন থেকে একেবারে নামিয়ে দিতে পারে না। এই বাস্তব সত্যটুকুকে আমি অস্বীকার করি কি করে? সামাজিক আচার যারা লঙ্ঘন করতে চায়, সব সময় সমাজ তাদের বিরুদ্ধে লাঠি নিয়ে তেড়ে আসে না। কিন্তু আচার-লঙ্ঘনপ্রয়াসীর মনের মধ্যেই সমাজ যে সংস্কারের বাসা বেঁধে পাহারা দিচ্ছে, তাকে হটাতে না পারলে সমাজ-সংস্কার কখনই সম্ভব নয়। আর তাকে হটানোও কি দু-একজনের লোক-দেখানো প্রচেষ্টাতেই সম্ভব? আর একটা কথা জান পবিত্র, পরের উপর উদার সংস্কার-প্রবর্তনের বাহাদুরি নিতে অনেকেই উৎসাহী, কিন্তু নিজের বেলায় অনেক 'কিন্তু' এসে হাজির হয়।

তাহলে বর্তমান সামাজিক অবস্থায় বিধবাদের জীবনে কোন সার্থকতাই নেই—এই কথাই কি আপনি বলতে চান?

মোটেই না। নিরুপমাকে তুমি জান, যাঁর 'দিদির' মত একখানি উপন্যাস আমি আর কারুর হাত দিয়ে বেরুতে দেখিনি, সেই নিরুপমাই যখন ষোল বছর বয়সে বিধবা হয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গেল, আমি তাকে বার বার করে কি বুঝিয়েছিলাম জান? বুড়ি, বিধবা হওয়াটাই যে নারীজীবনের চরম দুর্গতি এবং সধবা থাকাটাই সর্বোত্তম সার্থকতা—এর কোনটাই সত্য নয়। সেই থেকে তাঁর সমস্ত মন সাহিত্যে নিযুক্ত করে দিই, সমস্ত রচনা সংশোধন করি এবং হাতে ধরে লিখতে শেখাই, তাই আজ সে মানুষ হয়েছে শুধু মেয়েমানুষ হয়েই নেই।

কিন্তু এ সুযোগ ক'জনের ভাগ্যে জুটবে? ভাল মেয়ে-লেখিকা ক'জন আছেন আমাদের দেশে?

আর পুরুষদের লেখা রাশি রাশি বাংলা উপন্যাস যে বার হচ্ছে, সেগুলি কি ভাল? প্রায়ই অন্তঃসারহীন অপাঠ্য, পোনর আনাই অন্যলোকের চুরি। মেয়েরা আর যা-ই করুক, চুরি করে উপন্যাস লেখে না। ছোট্ট পরিবারের মধ্যে যা দেখে, নিজের জীবনে যথার্থ যা অনুভব করে, তা-ই কল্পনা দিয়ে প্রকাশ করতে চেষ্টা করে এবং সেই জন্যে কৃত্রিমতার অবকাশ নেই তার মধ্যে।

কিন্তু দাদা, মেয়েদের লেখায় কৃত্রিমতা না থাকলেও আন্তরিকতা আছে

একথা আমি বিশ্বাস করি না। কোন মেয়েকে দেখেছেন, নিকটতম লোকের কাছেও সম্পূর্ণ মন খুলে কথা কইতে? আজ পর্যন্ত যে পৃথিবীর কোন দেশে প্রথম শ্রেণীর মেয়ে-কথা-সাহিত্যিক জন্মাল না, তার মূল কারণও বোধ হয়, তাদের মনকে তারা কারু কাছে কোন দিন খুলে ধরতে পারে না।

এক মিনিট চুপ করে চোখ বুজে রইলেন শরৎদা, গড়গড়ার নল হাতেই রয়েছে, ভেলু পায়ের কাছে কুণ্ডলী পাকিয়ে, সব চুপ চাপ। শরৎদাকে কোণঠাসা করতে পেরেছি এই ভেবে আমিও আত্মপ্রসাদে চুপ হয়ে গেছি। একটু পরেই চোখ মেলে দাদা বলতে লাগলেন, তোমার কথা অস্বীকার করতে পারিনে পবিত্র, মেয়েরা মনের কথা মুখে বলতে পারে না, এ ত প্রবাদে পরিণত হয়েছে। আর মনের কথা মনে চেপে কথা-সাহিত্য সৃষ্টি হয় না, এ কথাও সত্য। কিন্তু তার জন্য অপরাধী করবে মেয়েদের? নিজেদের দিকে একবার তাকিয়ে গ্যাখো, মেয়েদের মনের সত্যটুকু শুনবার সাহস পুরুষের নেই, সব সময় সংশয়, সেই কারণে যুগ যুগ থেকে মেয়েদের মনের কথা খুলে বলতে দিই নি আমরা; আজ যদি মনকে চেপে রাখা তাদের স্বভাবে দাঁড়িয়ে গিয়ে থাকে, তার জন্য দায়ী মেয়েরা নয়, দায়ী পুরুষ। দাও তাদের কথা বলবার সুযোগ, বেশ কিছু দিন সুযোগ পেয়ে তারা নিঃসংশয় হোক, সাহস পাক, তারপর দেখবে তাদেরও মিথ্যার বেসাতি করবার কোন প্রয়োজন হবে না।

কথাগুলো শেষ করেই দাদা আবার চেয়ারে দেহটাকে এলিয়ে দিলেন, মনে হল দারুণ উত্তেজনার পর ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। কাজেই তর্ক না বাড়িয়ে চুপ করে গেলাম আমি, হয় ত দাদার কথার প্রতিবাদ করার কিছুই ছিল না আমার, প্রসঙ্গান্তরও পাড়লাম না। বললাম, খুব ক্লান্ত লাগছে আপনাকে।

চার-পাঁচ দিন জলে ভিজে জ্বরের মত হয়েছে, কদিন লঙ্ঘন চলছে, কোথাও বার হতেও পারি নি।

আমি বললাম, সামনে কেউ থাকলে আপনি কথা না বলে পারবেন না, কাজেই আপনাকে বিশ্রাম দেওয়ার প্রয়োজনে আমাকে এখন চলে যেতে হবে। আপনার চেহারা দেখে আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল আপনার শরীরের অবস্থা, আপনাকে কথা কইয়ে আনন্দ পাওয়ার লোভে আপনার সম্বন্ধে অন্য কিছু খেয়াল থাকে না।

তার জন্য অনুতাপ না করলেও তোমার পাপ হবে না পবিত্র। শরীর খারাপ বলে পেঁচা-মুখো হয়ে নিঃসঙ্গ বসে থাকব, আমার এই শাস্তিতে তোমরাও শান্তি পাবে না।

কিছুক্ষণ চুপ করেই বসে থাকলাম, চলে আসবার সময় দাদা বললেন, অনেক দূরে থাকি, তুমিও কাজের লোক, তবু বলি, লোক মারফতে খবর পাঠাবার আগেই আবার এসো।

'কমলালয়ে' আর এক রবিবারের সকাল। বারান্দার কোণে ক্রিং ক্রিং করে টেলিফোনের ঘণ্টা বেজে উঠল, তুলে ধরতেই ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক পরিচিত কণ্ঠে শুনতে পেলাম, আমি আশু মুখুজ্যে কথা বলছি, প্রমথবাবু আছেন?

আমি তাঁকে টেলিফোন ধরতে বলে চৌধুরী মহাশয়কে এসে বললাম।

টেলিফোনের কথাবার্তার একদিক যতটা কানে গেল তাতে মনে হল আশুবাবু আসছেন। চৌধুরী মহাশয় বললেন, একটু লক্ষ্য রেখো, স্যর আশুতোষ আসছেন।

আমি একটু বিস্মিত হলাম, তিনি বড একটা কোথাও যান না, এই আমার শোনা ছিল, তাই বিস্ময়ে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, ব্যাপার কি?

আমার এই অস্ফুট অভিব্যক্তি চৌধুরী মহাশয়ের কানে গেল। তিনি বললেন, ল কলেজের মাস্টারি করতে আমার আর ভাল লাগছে না, এ কথাটা তাঁর কানে কে যেন পৌঁছে দিয়েছে! সেই জন্যেই আসছেন হয় ত। অবশ্য আমাকে সঠিক উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন নি।

ইতিপূর্বেই স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সংস্পর্শে আমি এসেছিলাম, কিন্তু সে অভিজ্ঞতার স্মৃতি খুব সুখের নয়। হাওড়া সাহিত্যসম্মেলনে তাঁর প্রস্তাবগুলির বার বার বিরোধিতা করায় তিনি যে শেষ পর্যন্ত বিরক্তিভরে বলে উঠেছিলেন, কে হে এ ছোকরা—সেই দৃশ্য আমার চোখের সামনে ভাসতে লাগল। বাঙলার বাঘ, যাঁকে নাকি লাটসাহেব পর্যন্ত ভয় করেন, এবং যাঁর ক্রোধ আমি আগেই উদ্রেক করেছি, তাঁর মুখোমুখি হয়ে তাঁকে সংবর্ধনা করতে হবে। বড়ই অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। তিনিই বা কি বলবেন আর আমিই বা কি করে তাঁকে সম্পূর্ণ মর্যাদা দেবো।

বারান্দার নীচেই এসে থামল মোটরগাড়ী। আমি এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিলাম। গাড়ী থেকে নেমে এলেন শার্দূল পুরুষ, পরনে থান ধুতি, গলাবন্ধ সাদা কোট, বাঁ কাঁধে কোচানো চাদর আমি পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেই আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি! তুমি এখানেই থাক নাকি?

আজ্ঞে না, মেসে।

প্রমথ—

আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।

ইতিমধ্যে চৌধুরী মহাশয়ও বেরিয়ে এসেছেন এবং তিনিও পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন আশুতোষকে। তারপর দুজনে গিয়ে ঢুকলেন বসবার ঘরে। আমি বারান্দায় রেলিং-এ ভর দিয়ে লন ও বাগানের অভ্যস্ত দৃশ্যের মধ্যে নতুন সৌন্দর্য সন্ধান করতে থাকলাম।

কিছুক্ষণ পরে ননী এসে জানালে, সাহেব ডাকছেন।

আমি সসঙ্কোচে ঘরে ঢুকলাম। চৌধুরী মহাশয় বললেন, এই পবিত্র।

হ্যাঁ, আমি ওকে দেখেছি হাওড়া-সাহিত্য-সম্মেলনে, বললেন স্যর আশুতোষ, কিছুটা পরিচয়ও পেয়েছি, বেশ করিৎকর্মা ছেলে, আশু মুখুজ্যেকে হারিয়ে দিয়েছে, সোজা কথা—বলেই হো হো করে হেসে উঠলেন।

সে কি ব্যাপার? মৃদুহাস্যে প্রশ্ন করলেন চৌধুরী মহাশয়।

আশুতোষ বললেন, সে সব ক্ষাত্র-অক্ষাত্র যুদ্ধের কথা তুমি না-ই যদি শুনে থাক, তা হলে আর শোনবার দরকার কি? আমার দিকে ফিরে বললেন, ভাল। যা করবে, অমনি প্রাণমন দিয়ে জেদের সঙ্গে করবে। আমার সঙ্গে দেখা করো একদিন।

আশুতোষ চলে যাওয়ার পর ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন চৌধুরী মহাশয়, না পবিত্র, হল না। ল কলেজের কাজ ছেড়ে দিয়ে একটু যে নিজের কাজ করব ভেবেছিলাম, তা আর হল না। ওঁকে এড়াতে পারলাম না।

বাঙলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে যাঁরা পরিচিত, গায়ে পড়ে চিঠি লিখে তাঁদের

সঙ্গে আলাপ জমাবার আমার যে আগ্রহ, তার ফলে অনেকের সঙ্গেই পরিচিত হয়েছিলাম। আমার এই না-দেখা বন্ধুদের অন্যতম কবি কালিদাস রায় তখন রঙ্গপুর জেলার উলিপুর স্কুলের হেড্ মাস্টার। স্নেহবশতই হোক বা কাজের প্রয়োজনেই হোক, কালিদাস-দা আমাকে তাঁর স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ছাপিয়ে দেবার অনুরোধ জানান। আমি দায়িত্ব গ্রহণে সাগ্রহ সম্মতি জানাতে তিনি কিছু আগাম টাকাও পাঠিয়ে দেন। যথারীতি আগাম টাকা জমা করে আমি উইক্‌লি নোট্‌স্ প্রেসে প্রশ্নপত্রগুলি ছাপতে দিই। দিচ্ছি-দেবো-করেও প্রেস সুপারিনটেণ্ডেণ্ট সনৎবাবু কাজটিতে যথেষ্ট বিলম্ব করে ফেলেন। শুক্রবার সন্ধ্যায় তিনি ছাপা কাগজ ডেলিভারী দিলেন অথচ পরীক্ষা আরম্ভ সোমবার। ডাকে পাঠালে প্রশ্নপত্রগুলো যথাসময়ে পৌঁছবার কোন সম্ভাবনা নেই দেখে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে আমি প্রেসের মালিক মেজসাহেব, অর্থাৎ জে. চৌধুরী মহাশয়ের কাছে পরামর্শ চাই। সব শুনে তিনি বললেন:

যদি তোমার পক্ষে সম্ভব হয় তবে নিজে গিয়ে কোয়েশ্চান পেপার-গুলো পৌঁছে দিয়ে আসাই কর্তব্য, পবিত্র। ছাপাখানার ত্রুটির জন্য এর খরচ ছাপাখানাকেই বহন করতে হবে।

আমি সাগ্রহে রাজী হলাম। একে উত্তরবঙ্গে কখনও যাই নি, তায় কবি কালিদাস রায়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের সুযোগ; আর তা ছাড়া, স্কুলের পরীক্ষা পণ্ড না হতে দেওয়ার অন্য উপায়ই বা কি?

অনেকের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করে আবিষ্কার করলাম, রঙ্গপুরের কুড়ি-গ্রাম স্টেশনে নেমে গরুর গাড়ী করে যেতে হবে উলিপুর। অনেকখানি সংশয় ও অনিশ্চয়তা নিয়ে শুক্রবার রাত্রেই নর্থ-বেঙ্গল এক্সপ্রেসে উঠে বসলাম। নামবার সময় যত এগিয়ে আসতে থাকে মনে ততই সংশয় বেড়ে ওঠে। কুড়িগ্রামে যখন নেমে পড়লাম বেলা অনেকখানি গড়িয়েছে। সারা স্টেশনে রেল-স্টাফের বাইরে স্বজাতি অর্থাৎ যাকে বলি আমরা ভদ্রলোক, এমন বেশী লোক চোখে পড়ল না। বেশ বিব্রত বোধ করছি। টিকেট কালেক্টারকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন, মাইল এগার বার রাস্তা হবে, শুকনোর দিন, কোন অসুবিধে হবে না, গরুর গাড়ীতে গড়গড়িয়ে চলে যাবেন।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে গরুর গাড়ীর আস্তানায় এসে একটি তরুণ বাঙালী

ভদ্রলোককে দেখতে পেয়ে কিছুটা আশ্বস্ত বোধ করলাম। প্রিয়দর্শন সুবেশ যুবক গরুর গাড়ীতে মালপত্র তুলছেন। আমি তাঁর কাছে কি এবং কেমনভাবে জিজ্ঞাসা করব এই সঙ্কোচ নিয়ে আশে পাশে ঘোরাফেরা করছি, যুবক নিজে থেকেই কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় যাবেন আপনি ?

উলিপুর যাব শুনে তিনি আনন্দে বলে উঠলেন, আমার বাড়ীও সেখানে, আমি যাচ্ছি।

কালিদাস রায়ের বাড়ী যাব শুনে তিনি আরো উৎসাহিত হলেন। বললেন, আমি তাঁর ছাত্র-স্থানীয়, এবং প্রতিবেশী। জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার গাড়ী আসবে কি ?

গাড়ী আর আসবে কি করে, আমি জবাব করলাম, কালিদাসবাবুকে খবর দিয়ে আসতে পারি নি আমি।

কিছু যদি মনে না করেন, অনেকখানি আন্তরিকতা নিয়ে বললেন যুবক, তাহলে আমার সঙ্গেই চলুন, আমি আপনাকে যথাস্থানে পৌছে দেবো।

আমি হেসে বললাম, মনে করা ত দূরের কথা, আমি নিজে প্রস্তাব করার সঙ্কোচ কাটাচ্ছিলাম মাত্র।

দুজনে উঠে বসলাম। কাঁচা মাটির রাস্তা দিয়ে ঘড়ঘড় করে ছুটল গরুর গাড়ী। ঝাঁকানি এবং দোলানিটা দীর্ঘ ট্রেন যাত্রার পরে মোটেই মনোরম লাগছিল না।

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল অঘোরে বেঘোরে বেহারে একায় চড়ে নাকাল হয়ে গান বেঁধেছিলেন। গান বাঁধার ক্ষমতা আমার কোনদিনই নেই। লেখার ক্ষমতাও কম, কিন্তু মনীষী-জনের রচনা জীবনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার সুযোগ পেলাম। আমার মনে পড়তে লাগল, হাস্যরসিক ললিত বাঁড়ুজ্যে মশায়ের গরুর গাড়ীর প্রশস্তি। হয় ত গরুর গাড়ী ভারতীয় পল্লীজীবনের শান্তি ও মন্থরতার প্রতীক, কিন্তু তার গতি মন্থর হলেও শান্ত নয়। আর সমগ্র উত্তর ভারতের সিন্ধুগাঙ্গেয় অঞ্চল অবিমিশ্র সমভূমি হলেও, আমাদের পল্লী অঞ্চলের পথঘাট মোটেই সমতল নয়। কেউ তাদের সমতল করে রাখবার জন্যে মাথাব্যথা অনুভব করে না। কখনও এদিকে কাত হয়ে চলেছে, কখনো ওদিকে ঢলে পড়ছে, আর যখন তখন খাদের মধ্যে চাকা পড়ে ঝাঁকানির চোটে আমাদের শূন্যে তোলার দাখিল। গরু দুটো চলছে ধীর

পদক্ষেপে, কিন্তু মাঝে মাঝে গাড়োয়ান কি খেয়ালে তাদের তাড়া দিতেই একদমে খানিকটা দৌড়িয়ে নিচ্ছে। সেকালের থার্ডক্লাস ট্রেন ও সেকেণ্ড ক্লাস ট্রামের ঝাঁকুনির থেকে অন্যরকমের এক অনুভূতি জাগছে তাতে।

যাঁর দৌলতে আমার এই নিশ্চিন্ত যাত্রা, তাঁর সঙ্গে আলাপ জমাবার জন্যে আমাকে বেগ পেতে হল না। কালিদাসবাবু আমার কে হন, কেন আমি কালিদাস বাবুর ওখানে চলেছি, তাঁর প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে নিজের কথা সবই প্রকাশ করে ফেললাম। সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর প্রচুর আগ্রহ আলাপ-আলোচনাতেই ধরা পড়ল। পরিচয়ও পেলাম, উলিপুরেরই স্থায়ী বাসিন্দা তাঁরা, কাশীমবাজার-রাজের স্থানীয় কাছারির সঙ্গে এই পরিবারের সংযোগ আছে, গরুর গাড়ীখানাও রাজ-কাছারির। খবরটা জানিয়েই যুবকটি বললেন, নইলে কি আর গাড়ী টানা গরুর এমন পুরুষ্ট চেহারা হয় এদেশে!

যুবকের হাবভাব, কথাবার্তা এবং তাঁর হাতের বইখানা—ফরাসী নাট্যকার ব্রিউর তিনখানা প্রসিদ্ধ নাটকসংগ্রহ—দেখে শুনে তাঁর সম্বন্ধে আমি যথেষ্ট আগ্রহ বোধ করলাম, নেহাৎ কৃতজ্ঞতা বোধ থেকে নয়। কলকাতায় এম. এ. ক্লাসের ছাত্র কৃষ্ণদয়াল বসুর তখনও কবি-খ্যাতি হয় নি, কিন্তু তাঁর মনের মধ্যে যে কবি বাসা বেঁধে আছে, তার পরিচয় আমি ভাল করেই পেলাম। বললেন, এই বিল আর ক্ষেত, আর মাঝে মাঝে কয়েক ঘর চাষী জড় হয়ে পাশাপাশি বাস করছে। দূর থেকে দেখতে খুব মিষ্টি, কল্পনায় সেখানে কত সুগন্ধ ফুল ফোটে, তার গন্ধে আমরা মশগুল হয়ে যাই, কিন্তু বাস্তবে তাদের জীবন যে শুধু ঘেঁটু আর কাঁটা—একেবারে ফণিমনসার ঝাড়, তা দূর থেকে অনুমান করা যাবে না!

আমি বললাম, বাঙলার পল্লীচিত্র কবিতায় আর সাহিত্যে কতটুকুই-বা রূপ পেয়েছে, পতিসরে বসে রবীন্দ্রনাথ যেসব কবিতা লিখেছেন তা ত প্রকৃতির শাশ্বত সৌন্দর্যেরই রূপায়ণ।

রবীন্দ্রনাথ বিরাট প্রকৃতির অখণ্ডরূপকে প্রত্যক্ষ করেছেন, বললেন কৃষ্ণদয়াল, তিনি শাশ্বত সৌন্দর্যকে রূপায়িত করার অধিকারী; আমাদের দৃষ্টি ছোট, যেখানে যতটুকু দেখি সেইটুকুই বলতে পারি। কিন্তু রূপ-সৃষ্টি করতে হলে মনে প্রেমের সঞ্চার চাই। ভালোবাসতে পারলে

রূপহীনও অপূর্ব রূপ নিয়ে ধরা দেয়। আপনি মাস্টার মশাইয়ের কুন্দ কবিতা পড়েছেন? বলেই সুর করে আবৃত্তি শুরু করে দিলেন:

পবন তুমি এসো না হেথা মিটিবে নাকো তিয়াসা
ভ্রমর তুমি গুঞ্জ বৃথা মিটিবে নাকো পিয়াসা
মানব আঁখি এসো না ভাই,
পাবে না সুখ সুষমা নাই
যা কিছু ধন দীনতা লাজ হীনতা শুধু মরমে
কুসুম ভরা জগৎ হেরি ঝরিতে চাহি শরমে।

অবজ্ঞাত ফুল কুন্দের বেদনা এমন ভাবে প্রকাশ করতে হলে মনের মধ্যে কতখানি গভীর প্রেম থাকতে হবে, বলুন ত!

আমি বললাম, যার কাছ থেকে গন্ধ বা সৌন্দর্য উপভোগ করার কোন কিছু পাওয়া যায় না, তার জন্য দরদ বোধ করতে পারে গভীর অনুভূতিশীল মন। কালিদার মনের এ স্বরূপ আমাদের সুপরিচিত; অবশ্য লেখার ভিতর দিয়ে, তাঁকে আমি এখনো চাক্ষুষ করি নি।

করলে খুশীই হবেন, বললেন কৃষ্ণদয়াল, তবে আমি মাস্টার মশাইয়ের চরিত্র বা কাব্যের প্রসঙ্গ অবতারণা করতে চাই নি, বাঙলাদেশের মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে যে কাব্য আছে তারই কথা বলছিলাম। বর্ত্তমান নগর-কেন্দ্রিক সাহিত্য সে দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছে, আর অবহেলিত কুন্দফুল—সে ত প্রতীক মাত্র, রূপগুণ ঐশ্বর্য—কোন সম্পদ যার নেই, এমন মানুষ সংসারে অসংখ্য। নীতিগ্রন্থের নির্দেশ অনুসারে তাদের নিয়ে আমাদের এতটুকুও মাথা ঘামাবার কথা নয়, কিন্তু অনুভূতিশীল কবিকে সেদিকে দৃষ্টি দিতেই হবে।

আজও কিন্তু প্রকৃতি ছেড়ে মানুষের দিকে দৃষ্টি দেয়নি বাঙলার কবি, আমি বললাম।

গরুর গাড়ী কালিদার বাড়ীর সামনে আমায় যখন এনে নামালে, তখন দুপুর প্রায় পড়ে গেছে। কৃষ্ণদয়াল ভিতরে খোঁজ নিয়ে এসে জানালেন, কালিদা স্কুলে গিয়েছেন। আমাকে বসবার ঘরে বসিয়ে এবং অনতিদূরস্থ স্কুলবাড়ী থেকে কালিদাকে ডাকতে লোক পাঠিয়ে কৃষ্ণদয়াল নিজের বাড়ী চলে গেলেন। যাওয়ার সময় ভাবখানা যা দেখালেন,

তাতে যেন তাঁর ঘাড়ে চড়ে সারা পথ আসবার বদান্যতা দেখিয়েছি বলে তাঁরই আমার প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করার কথা।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই এসে হাজির হলেন কালিদা। কেউ কাউকে চিনি না, কাজেই প্রথম সাক্ষাতে মুহূর্তের জন্য দুজনেই একটু বিহ্বল বোধ করলাম। কিন্তু চিনে নিতে যেখানে অসুবিধে নেই, হরফের দৌলতে মনের সংকোচ অনেক আগেই কেটে গেছে, সেখানে প্রত্যক্ষ ঘনিষ্ঠতা হতে বিলম্ব হল না।

আমি প্রশ্ন-পত্র পৌঁছে দিতে এসেছি শুনে তিনি বিস্মিত হলেন, বললেন, বুঝেছি বিশেষ অনিবার্য কারণেই প্রশ্নপত্র এসে যথাসময়ে পৌঁছায় নি। এবং পৌঁছায়নি বলেই সাময়িকভাবে পরীক্ষা স্থগিত রাখার ব্যবস্থা করতে গিয়াছিলাম স্কুলে।

স্থগিত রাখার ব্যবস্থা কি পুরোপুরিই করে ফেলেছেন? আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

কালিদা জবাবে বললেন, সে যা-হোক হবে। কি হয়েছে আর কি হবে তা নিয়ে তোলাপাড়া করার অনেক সময় পাওয়া যাবে, আপাতত তুমি মুখ হাত ধোও, খেয়ে দেয়ে ঠিক হয়ে নাও। কলকাতা থেকে উলিপুর, পথশ্রম ত সোজা নয়।

ফুটফুটে পাঁচ-ছ বছর বয়সের একটি মেয়ে আমি এসে পৌঁছনো থেকে ছায়ার মত আমার সঙ্গ নিয়েছে। তার দিকে চেয়ে কালিদা বললেন, কাকু।

আমি ডাকতেই ও কাছে এগিয়ে এল এবং পরম আত্মীয়ের মত কোলে বসে গেল। জিজ্ঞাসা করলাম, কি নাম তোমার?

বললে, আন্নু। তারপর বললে, কাকু, তুমি কোথায় থাক? আমাদের বাড়ী আস না কেন?

এই ত এসেছি।

আগে আস নি কেন?

আবার আসব।

রোজ আসবে?

সময় পেলেই আসব।

পাড়া-গাঁয়ের স্কুলের পরীক্ষা হঠাৎ বন্ধ করতে হলে অনেক হাঙ্গামা

করতে হয়, বললেন কালিদা, স্কুলে নোটিশ লটকে দিলেই ত চলে না, পাঁচ-ছ মাইল দূর থেকে ছেলেরা আসে। তাদের অকারণ হাঁটা বন্ধ করবার জন্য দিকে দিকে দূত পাঠাতে হয়েছে।

আমি বললাম, শুধু প্রশ্ন-পত্রের জন্যই এই বিপর্যয়। যদি পরীক্ষাটা পরশু করা যায়, তাহলে আমার পরিশ্রমটা সার্থক হবে।

আর তা না হলে, তোমার পরিশ্রম একেবারে ব্যর্থ—এই কথাই কি বলতে চাও? প্রশ্ন করলেন কালিদা। তারপর হেসে নিজেই তার জবাব দিলেন, আন্তরিক কোন কাজই কোন দিন ব্যর্থ হয় না। যে দায়িত্ব-বোধ নিয়ে তুমি এতদূর ছুটে এসেছ, তার মূল্য এবং মর্যাদা তুমি পাবেই, আজ আমার কাছে না হোক, কাল আর একজনের কাছেও হয় ত না হতে পারে, কিন্তু এই জীবনের পরীক্ষাগারে তুমি নিশ্চয়ই ভাল নম্বর পাবে।

আমার কিন্তু তবু মনে হতে লাগল, যাতে সোমবারেই পরীক্ষা হয়। কালিদা বললেন, স্কুলের দরোয়ান বা গ্রামের ছেলে-ছোকরা যারা আমার হুকুমে হাঁটাহাঁটি করে সব জায়গায় খবর দিয়ে এসেছে, তাদের আজই কি আবার পাঠাতে পারি? কাল যাহোক ব্যবস্থা করা যাবে। পরশু পরীক্ষা শুরু হলে খুব বেশী এসে যাবে না। যে ভাবে হোক, অন্যকে কষ্ট দিয়েও শুধু কথা রাখার জন্যই কথা রাখতে আমি প্রেরণা পাই না।

গ্রাম ছোট হলেও জমিদার ছোট নন। মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর বাহিরবন্দ পরগণার বিশটি কাছারির সদর আপিস এই উলিপুরে। রাজ-কাছারি-সংশ্লিষ্ট মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের সংখ্যা এখানে নগণ্য নয়। বস্তুত তাঁরাই এখানকার ভদ্রসমাজ। রাজার স্কুল তাঁদেরই কেন্দ্র করে চলে। সেই কারণেই উলিপুরের সমাজ প্রবাসীপ্রধান। বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলের লোক সমবেত হয়ে যে সমাজ গড়ে তুলেছে, তার মধ্যে আঞ্চলিক সংস্কারের চেয়ে বাঙালী সংস্কৃতির সাধারণ রূপই ফুটে উঠেছে।

কাছারির যিনি প্রধান, সারা গ্রামেরই তিনি প্রধান—একেবারে গার্জিয়ান। তাঁর নাম আমার আজ আর মনে নেই কিন্তু তাঁর বাড়ীতে অল্প সময়ের জন্যে গিয়েছিলাম, তাতেই অনুভব করলাম শুধু পদাধিকার বলেই তিনি গার্জিয়ান নন—প্রতিটি গ্রামবাসীর, এমন কি, জমিদারীর অন্তর্গত

আশপাশের অনেক গ্রামের ভাল-মন্দ কল্যাণ-অকল্যাণ সব কিছুর দায়িত্ব তিনি বহন করে চলেছেন। গ্রামবাসীর সমৃদ্ধি কতটা জানি না কিন্তু গ্রামের সমৃদ্ধি চোখে পড়বার মত। সুন্দর সমতল পথঘাট, হাসপাতাল, লাইব্রেরি, স্কুল, দীঘি, ডাকঘর, খেলার মাঠ—পল্লীজীবনে যা-কিছু থাকলে জীবন পূর্ণাঙ্গ হতে পারে, জাতীয় পরিকল্পনা গ্রামের যে আদর্শ চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরে, তা প্রত্যক্ষ করেছিলাম উলিপুরে।

এই পরিবেশে নির্ঝঞ্ঝাট, নিরিবিলি ছোট সংসার নিয়ে কালিদার জীবন। তাঁর সংস্কৃত মনের প্রলেপ সেখানকার সমাজে পরিব্যাপ্ত বলেই মনে হল। ছাত্রদের নিয়েই অধিকাংশ সময় কাটে, আর অবসর সময় কাটে কাব্যচর্চায়। কাছারিতে কথা কয়ে দেখলাম, কালিদা কেবল হেড মাস্টার বলেই তাঁদের মামুলি সম্মানের পাত্র নন। ত্রিশ-বত্রিশ বছরের ছোকরা, সে আবার কিসের হেডমাস্টার! কিন্তু কবি কালিদাস রায় যে স্কুলের দায়িত্ব নিয়ে উলিপুরে বসবাস করছেন এবং তরুণ সমাজের মনোগঠনের ভার নিয়েছেন, তা নিয়ে উলিপুরবাসীর গর্ববোধ প্রচ্ছন্ন নয়, একেবারে প্রকাশ্য।

আমি রবিবার রাত্রেই চলে আসতে চাইলাম। কালীদা ছাড়লেন না। রাত্রিতে পরম যত্ন করে খাওয়ালেন বৌদি। পরদিন কালীদা সঙ্গে করে স্কুলে নিয়ে গেলেন। মাস্টার মশাইদের কাছে এবং আর সকলের কাছে আমার সম্পর্কে যে সব কথা বললেন, তাতে আমার সেখানে বসে থাকাই দুষ্কর হল। কেন এসেছি কালিদার মুখে সেই কাহিনী শুনে মাস্টার মশাইদের মধ্যে কেউ কেউ এরূপ দায়িত্বজ্ঞানের কাহিনী ছাত্রদের মনে গেঁথে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করায় আমি যারপরনাই অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। দু-একজন শিক্ষক কলকাতায় রাজনৈতিক পরিবেশ এবং সামাজিক ও সাহিত্যবিষয়ক পরিস্থিতি সম্বন্ধেও অনেক খোঁজখবর নিলেন।

বিকেলবেলা কৃষ্ণদয়াল এসে আমাকে নিয়ে গেলেন তাঁদের বাড়ীতে। জলযোগ ও গল্পগুজবান্তে সেখান থেকে উঠে আসবার সময় ব্রিউর নাটিকা সংগ্রহখানা চেয়ে নিলাম। ফেরত দেবো না এমন ইচ্ছা মনের কোণেও ছিল না, কিন্তু বইখানা ফেরত দেওয়া হয় নি। অবশ্য বইখানা আজ আর আমার কাছেও নেই, কোথায় আছে এবং কেমন করে গেছে, সে খবর কিছুই জানি না।

দুদিন উলিপুরে কাটিয়ে কলকাতায় ফিরে এলাম, মেজ সাহেব সব শুনে বললেন, খরচাটা হয়ত ছাপাখানার কর্মচারীদের কাছ থেকেই আদায় করা উচিত, তাদের দায়িত্বজ্ঞান তাতে একটু বাড়ে। তবে গরীবের কষ্টের পয়সা মেরে শাস্তি দেওয়া আমার মনে ধরে না। আর ওরা ত কেউ বসে থাকে না, আমার 'নোট্‌স্‌'-এর কাজ নিয়েই অত্যন্ত বিব্রত থাকতে হয় ওদের।

যে ক'টা টাকা রোজগার করি তা দিয়ে সসম্মানে জীবিকা নির্বাহ করা সম্ভব হয় না। কাজেই ভদ্র-সমাজে ভব্যতা বজায় রাখার যে প্রাথমিক প্রয়োজন সেইটিই মেটাতে পারি না আমি, অর্থাৎ যে যেখানে পাওনাদার আছে তাকে সময়মত কথা রক্ষা করে টাকা দিয়ে উঠতে পারি না। তাতে শুধু যে পাওনাদার ক্ষুণ্ণ হয় তা-ই নয়, আশপাশের আর পাঁচজনও মনে করে—লোকটা একেবারে ছেঁদো। সময় মত টাকা দিয়ে কথা রাখতে না পারার যে মনোবেদনা তা কাউকে দেখানো যায় না, না-দেওয়ার স্বভাবটাই সকলের চোখে প্রকট হয়ে ওঠে।

চুনাপুকুরের মেসে এইভাবে সময় মত টাকা দিতে না পারার জন্য মন কষাকষি দানা বাঁধছিল। ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করেই মানে মানে বিদায় নেবার সুযোগ খুঁজলাম এবং একদিন অনেক কষ্টে বাকী-বকেয়া মিটিয়ে দিয়ে স্যুটকেশ, বিছানা ও বইয়ের পুঁটলি নিয়ে উঠলাম এসে এক মেসে।

তিন নম্বর মির্জাপুরের এই মেসটি যে বাড়ীব পিছনের অংশে, তার সামনের অংশটায় তখন মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল। আমার মত আধা-বেকার এই মেসে আরো ছিলেন। তাঁদের মধ্যে হরেকৃষ্ণ বিশ্বাস অন্যতম। আমাদের দুজনের মধ্যে রীতিমত একটা ব্রাদারহুড গড়ে ওঠে, কারণ কতকগুলি কমন ফ্যাক্‌টার আমাদের মধ্যে ছিল: সকাল বেলা উঠেই তাড়াতাড়ি আপিস যাওয়ার তোড়জোড় করতে হয় না। আর সবাই যখন আপিস থেকে ফিরে এসে চা-খাবার খায়, আমরা তখন চা খেয়ে চরতে বেরোই। হরেকৃষ্ণ চাকরির তল্লাসে দুপুরে প্রায়ই এক

রাউণ্ড ঘুরে আসে, কিন্তু থালা সাজিয়ে চাকরি নিয়ে কেউ বসে নেই। কাজেই ব্রাদারহুডে আর একটা বিশেষ সূত্র হল পয়সা উপার্জনের সুলুক-সন্ধান আলোচনা করা। মেসের পয়সা কি ভাবে দেওয়া হবে তার জল্পনা-কল্পনা করা, এই ধরনের আরো কত কি!

মেসের লাগোয়া মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলের সঙ্গেও আমার সৌহার্দ্য গড়ে উঠল। মোটাসোটা গোলগাল ছেলেটি, বিশু বোস, হো হো করে হাসে, প্রাণ খুলে বড় গলায় কথা বলে, গলায় গানের সুর নেই, এ সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন হয়েও যখন তখন মনের আনন্দে গান গেয়ে ওঠে। এই বিশু ও যীশু দু-ভাই-ই ছিলেন গুরুদেবের অত্যন্ত প্রিয় পাত্র। যীশু তখন ল-কলেজের ছাত্র, তবুও হোস্টেল কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ অনুমতিক্রমে তিনি মেডিক্যাল হোস্টেলে ঠাঁই পেয়েছিলেন।

রাস্তার অপর পারেই গোলদীঘি। তখনকার রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের অজস্র জনসভার ক্ষেত্র। তখন পর্যন্ত দীঘির চার কোণে চারটি ক্লাবকে ইজারা দিয়ে অধিকাংশ ফাঁকা জায়গা থেকে জনসাধারণকে বঞ্চিত করা হয় নি। একমাত্র বিদ্যাসাগরের মর্মর মূর্তি ও ডেভিড হেয়ারের কবর ছাড়া, দীঘির চার পাশে 'বড় রক্ত জোর' বাঙালী যুবাসমাজের সমাবেশে কোথাও কোন অন্তরায় ছিল না।

মেসের কুঠুরি ছেড়ে, বিশেষ করে গরমের সময় অনেক রাত্রি পর্যন্ত গোলদীঘির ভিজে হাওয়ায় বসে গুলতানি করি। বিশুর সঙ্গে এসে এই হোস্টেলেরই সুদর্শন ও তরুণতর আর একটি মেডিক্যাল ছাত্র জমায়েত হয়। সাহিত্যের প্রতি তার প্রবল অনুরাগ। সাময়িক পত্র-পত্রিকায় কার কি লেখা প্রকাশিত হচ্ছে, বিহার-প্রবাসী এই বাঙালী যুবক সে সম্বন্ধে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। আলোচনা ও রস গ্রহণে তার সূক্ষ্ম অনুভূতি মাঝে মাঝে আমাকে বিস্মিত করে দেয়।

যদিও বিশুই ছিল এই তরুণের অন্তরঙ্গতম, তবু ওরই ষড়যন্ত্রে এর সম্বন্ধে এক গোপন রহস্য আবিষ্কার করে ফেললাম। খালি ঘর পেয়ে বিশু একদিন আমাকে একখানা খাতা দেখালে যার মধ্যে দু-একটি কবিতা থাকলেও বেশীর ভাগই দু-তিন পাতার মধ্যে সম্পূর্ণ গল্প। বিশু বললে, বলাই বেশ গোপনে কবিতা লেখে। কেউ জানবে—এটা যেন ওর বিভীষিকা। আপনি যেন আবার তাকে বলে দেবেন না যে আমি খাতাটা চুরি করে আপনাকে দেখিয়েছি।

গল্পগুলো পড়ে আমার বিস্ময়ের সীমা রইল না। একাধারে গল্প, ছোট ও ছোটগল্প—এই তিনটি গুণবিশিষ্ট এই ধরনের বাঙলা রচনা ইতিপূর্বে আর কারুর কলম থেকে বেরিয়েছে বলে আমার জানা নেই। রবীন্দ্রনাথের কথিকা থেকে এর জাত সম্পূর্ণ আলাদা। একেবারে চাঁছাছোলা কাহিনী পেশ করা হয়েছে। একটিও অবান্তর শব্দ নেই কোনখানে, ভাববহুল মন্তব্য দিয়ে পাঠকের মনকে অভিভূত করবার চেষ্টা নেই কোনখানে, সামান্য ঘটনা-সমাবেশ ও বাক্যালাপের মধ্যে একটি বিশেষ বক্তব্য পূর্ণাঙ্গ ও পরিস্ফুট।

বিস্ময়বোধ তখনকার মত চেপে রাখলেও অনতিবিলম্বে একদিন বলাই মুখুজ্যেকে চেপে ধরলাম, বলি চাঁদ, তোমার গল্পগুলো ত পরীক্ষার স্তর পার হয়েছে, আর তা গোপন করে রাখবার দরকার কি?

চোখে মুখে বিস্ময় ফুটিয়ে বলাই প্রশ্ন করল, আমার গল্প? আপনাকে এ সব কথা কে বললে?

গোয়েন্দাগিরির চেষ্টা না-ই বা করলে, আমি বললাম, এমন অন্যায় তুমি করোনি গল্প লিখে, যা প্রকাশ হয়ে পড়াতে তোমাকে এখন কে বলেছে সেইটেই আবিষ্কার করতে হবে। গুপ্তচরবৃত্তিটা যদি আমিই করে থাকি, তাহলে ফাঁসির যোগ্য অপরাধ করিনি, ঠিকই। এখন সরকারী ভাবে তুমি আমায় খাতাটি ধরে দেবে কি, যাতে তার রস রসিকজন মাত্রেই উপভোগ করতে পারে।

থাক দাদা, বললে বলাই, ডাক্তারী শাস্ত্র পড়ি, ছুরি হাতে নিয়ে মড়া কাটা আর সূঁচ হাতে নিয়ে ইন্‌জেক্‌শন—এতেই হাত পাকানো এখন আমার তপস্যা। কলম যদি ধরি, বড় জোর, প্রেসক্রিপশনের মক্‌স করতে ধরব। এর বাইরে আমার হাত এবং কলমের ব্যবহার গুরুজনের কাছে অমার্জনীয় ধৃষ্টতা বলেই গণ্য হবে।

কিন্তু একবার তোমার মিঠে হাতের স্বাদ পেলে সবাই হয় ত বলে উঠবেন, গল্প লেখার জন্য যে হাত তৈরি হয়েছে সে হাত প্রেস্‌ক্রিপশন লিখে আর ইন্‌জেকশন দিয়ে অপব্যবহার করতে দেওয়া হবে না।

গোলমাল তাহলে ত বাড়বে দাদা, জবাব করলে বলাই, ডাক্তারের ছেলে, করে খাবার জন্যে ডাক্তারী পড়ছি। মনের গোপন কোণে একটু সাহিত্য নেশা লুকিয়ে আছে বলেই কি আমায় পড়াশুনা বন্ধ করে বাউণ্ডুলে করে ছেড়ে দেবেন?

তাহলে ফুলগুলো কি সবার অজ্ঞাতেই ঝরে পড়বে বলতে চাও?

না দাদা, স্মিতহাস্যে বললে বলাই, আপনার অ্যানালজির একটু ত্রুটি ধরিয়ে দিচ্ছি, ধৃষ্টতা মার্জনা করবেন। ফুল ঝরে পড়ে কদিনেই, লেখার পাতা পোকায় না কাটলে অনেক দিন থাকে। কিছু দিন দেরিতে তাকে দৃষ্টিগোচর করলে কোন ক্ষতি হবে না তার। সময় আসুক, তখন যা হয় দেখা যাবে।

এর পর বলাইকে লেখা প্রকাশের জন্য আমি আর কখনো বিরক্ত করিনি। ধরা যখন পড়েই গেছে তখন আমি চাইলে আমাকে লেখা দেখাতে আর আপত্তি করে নি।

গোলদীঘিতে জলের ধারে বসে আমরা আবড়ুম-গাবড়ুম অনেক গল্পই করি। ওখানে বারোয়ারি মূত্রাগারের পাশে বেড়া ঘেরা স্তম্ভটি যে ডেভিড হেয়ারের কবর একথা আমাদের কারুরই জানা ছিল না, লক্ষ্য করি নি কোন দিন। হঠাৎ সেইটি আবিষ্কার করলাম আমরা। দীনবন্ধু মিত্রের 'গঙ্গার কলিকাতা দর্শন' কবিতাটি সেই দিনই আলোচিত হয়েছিল। তাতে আছে ঃ

'দেখ মাতা গোলদীঘি বড় রক্ত জোর
বিরাজে দক্ষিণ পাশে হেয়ারের গোর।'

অপরিসীম ঔৎসুক্য নিয়ে সেদিনই আমরা হেয়ারের গোর আবিষ্কার করলাম।

সান্ধ্য আড্ডার আলোচনায় বিশু বললে, এই ইংরেজ জাতকেই কি না বলা হয় উদার মহান ; নীচতা যা-কিছু, আমাদের চোখে পড়ে তা নাকি ব্যক্তি-বিশেষে আবদ্ধ। ওরা জাতকে জাত—একটা অশ্রাব্য গালাগালি দিয়ে বিশু কথাটা শেষ করলে।

আমি বললাম, শুধু ইংরেজের দোষটাই দেখছ, আর নিজেদের মহত্ত্বের কথা একবার ভেবে দেখ দেখি। যে মহাপুরুষ বাঙালীকে ভালবাসার অপরাধে স্বজাতিদের কবরখানায় জায়গা পেলেন না, তাঁকে গোলদীঘিতে সমাহিত করে যেটুকু সম্মান আমরা দিয়েছিলাম, তার দশগুণ অপমান করছি আমরা তাঁর মৃত-আত্মাকে। গোলদীঘিতে এক বারোয়ারি মূত্রাগার বানাবার আর জায়গা ছিল না, হেয়ারের কবরের দশ গজের মধ্যে ছাড়া। অথচ দেখো, যারা ওটা বানিয়েছিল, তাদের বিজাতীয় মনোভাবকে যদি বা মার্জনা করতে পারি, আমরা বাঙালী, হেয়ারের এই অপমান দিনের পর দিন নিরঙ্কুশ চিত্তে সহজ-ভাবে বহন করে চলেছি, আমাদের এই নীচতা সহ্য করি কি করে ?

বিশু দাঁড়িয়ে পড়ে বলে উঠল, বহুৎ আচ্ছা দাদা, কাল থেকে আমরা এটা তোলার জন্য আন্দোলন শুরু করে দিই।

বেশ ভাল ভাই, আমি বললাম, এখনই আন্দোলন শুরু হল, কাল পুঁটিরামের দোকানে হিঙের কচুরি খেয়ে তাকে সমাহিত করা যাবে। আরে, আমরা সব সোডার বোতল, মনে ধাক্কা লাগে, হৈ হৈ করে উঠি, তারপর একটু সবুর করার সুযোগ পেলেই ঠাণ্ডা মেরে যাই।

কটকপ্রবাসী আমার জনৈক বন্ধুর পরিচয় বহন করে মিঃ বোস এসে উঠলেন আমার মেসে। দু-একদিন থাকবেন আমার অতিথি হয়ে। মিঃ বোস ঘরে এসে বসেছেন, তাঁর সঙ্গে দু-চার কথা কয়ে আমি ঠাকুরকে ডেকে পাঠালাম যাতে অতিথির খাবার জন্য বিশেষ একটু ব্যবস্থা করা যায়। উৎকলবাসী মেসের রাঁধুনি বামুনটি নিঃসঙ্কোচেই ঘরে এসে ঢুকল। কি যে হল হঠাৎ, বাঁশ পাতার মত কাঁপতে কাঁপতে দণ্ডবৎ হয়ে পড়ে গেল সেখানে। পড়ে গেল কিন্তু কাঁপুনি তবু থামে না, আমি বিব্রত বোধ করতে লাগলাম কিন্তু আমার অতিথি বসে বসে মুখ টিপে হাসছেন।

আমি ঘর থেকে বেরিয়ে জল নিয়ে এলাম মাথায় ঢালতে, কি জানি, মৃগীর ব্যারাম কি-না। কিন্তু জল ঢালবার উপক্রম করতেই বামুনঠাকুর উঠে পড়ে পড়ি-কি-মরি করে দৌড়ে পালাল। আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম। ফেরারী আসামী নয় ত?

আমার বিমূঢ়ভাব দেখে বোস মহাশয় প্রশ্ন করলেন, ব্যাপার কি বলুন দেখি, এ লোকটা এখানে কি করে?

আমাদের রাঁধুনি বামুন, জবাবে আমি জানালাম।

বামুন! এই পরিচয়ই ও আপনাদের দিয়েছে নাকি? বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন বোস।

জবাবে আমার বিলম্ব দেখে তিনি আবার বললেন, ব্যাটা ত ধোবা, কটকে আমারই প্রজা। কলকাতায় এসে পৈতে ঝুলিয়ে ব্রাহ্মণ হয়ে গেছে!

বলেন কি!

বলব আর কি, বোস মশায় বলে চললেন, ভাবছি মরণ ওর, না

মরণ আমাদের হাঁড়ির, জাতের। বামুন ছাড়া রাঁধতে দেবেন না আপনারা; অথচ সে বামুন কি না, সেটা যাচাই করাও দরকার মনে করেন না।

প্রয়োজনটুকু ত সামাজিক, আমি বললাম, আমি বামুন, গলায় পৈতে ঝুলিয়ে এই কথা এসে বললেই আমাদের জাত রক্ষা হয়।

খোঁজ নিয়ে ঠাকুরকে আর পাওয়া গেল না। উনুনের কয়লা মিথ্যেই পুড়ছে, বাজার যেমন এসেছে, তেমনি পড়ে আছে। মেস-ভৃত্য দেবেন ঘরে ঘরে ঠাকুরকে খুঁজছে, আমার ঘরে আসতেই ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম, —সে ফেরার। দেবেন বাইরে পানের দোকানে খোঁজ নিতে গিয়েছিল। তারা বললে, সে ত কলুটোলার দিকে হন্ হন্ করে চলে গেল। ফিরেও তাকায় নি কোন দিকে।

অতিথিকে খাওয়াবার এক বিশেষ ব্যবস্থা করতে গিয়ে নাকাল হলাম, এখন তাঁকে হোটেলে নিয়ে যেতে হবে—এ চিন্তা সহ্য হল না! অগত্যা পুঁটিরামের দোকানে গিয়ে দু'জনে নগদ পয়সায় ক্ষুন্নিবৃত্তি করলাম।

বিশু এবং আমি কদিন ধরেই লক্ষ্য করছি যে, আমাদের সান্ধ্যবৈঠকে তৃতীয় ব্যক্তি অর্থাৎ বলাই হাজির থাকছে না। নিজেদের মধ্যে এ নিয়ে আমরা পরস্পরকে প্রশ্ন করেছি, কিন্তু কেউ কোন সঠিক জবাব দিতে পারি নি। অগত্যা বলাইকেই একদিন পাকড়াও করা গেল। বিশু বললে, একেবারে যে কৃষ্ণপক্ষ পড়ে গেল! চাঁদের দেখা পাওয়া যায় না! কোথায় আড্ডা জমাচ্ছ সন্ধ্যা বেলা?

সহজ ভাবেই জবাব করলে বলাই, কলেজের পড়া।

সন্ধ্যের পর ঘরের বাতি নিভিয়ে কলেজের পড়া করতে কোথায় যাওয়া হয় শুনি? ব্যঙ্গের সুরে বললে বিশু।

প্রাকৃটিক্যাল ট্রেনিং দাদা, বলাই জবাব দিলে। প্রফেসারের নির্দেশে তাঁর একটি রোগীকে অ্যাটেণ্ড করি সন্ধ্যা বেলা।

ডাক্তার হয়ে উঠছ তা হলে, আমি বললাম।

আপাতত নার্স বললেও চলে, বললে বলাই। বিশেষ করে রোগিণীর অভিভাবক অনুপস্থিত।

রোগিণী? ভুরু কুচকে প্রশ্ন করলে বিশু। সে আবার কোথায়? হাসপাতালে?

না দাদা, হোটেলে। পূর্ববঙ্গ থেকে এসেছেন চিকিৎসার জন্যে কলকাতায় ডাঃ—এর চিকিৎসাধীনে আছেন।

বিশু বললে, ডাক্তার—অভিভাবকবিহীন রোগিণীকে নার্স করবার ভার তোমায় দিলেন—সারা মেডিক্যাল স্টুডেণ্ট মহল ঘেঁটে। ডাক্তারের রস আছে, কিংবা কোন মতলব আছে জানি না।

মতলব আবার কি থাকবে? বলাই জবাব করল। চল্লিশোর্ধ্বা রোগিণী, সঙ্গে তাঁর বিবাহিতা কন্যা।

আমি বললাম, এঁদের অসুস্থ অবস্থায় হোটেলে রেখে নিজে অনুপস্থিত থাকে, আচ্ছা অভিভাবক ত!

বলাই জবাবে গম্ভীরভাবে বললে, সব কথা না শুনে কোন লোকের সমালোচনা করা, আপনার কাছে আশা করি নি আমি।

অবস্থাটা বলেই ফেল তাহলে, আমরা শুনি, বললে বিশু।

বলাই বলে চলল অবস্থাটা:

স্ত্রীকে ডাক্তারী পরীক্ষা করাবার জন্যে নিয়ে এসেছিলেন ভদ্রলোক। সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থ, পেশা গুরুগিরি। মেয়েকে নিয়ে এসেছেন সঙ্গে, মার সাহায্যের জন্য। কিন্তু ডাক্তার—রোগিণীকে পরীক্ষা করে জানালেন, কলকাতায় কিছুদিন আণ্ডার অবজারভেশন চিকিৎসা করা দরকার। বেশী দিন হোটেলে থেকে চিকিৎসা করবার মত যথেষ্ট পুঁজি তিনি নিয়ে আসেন নি। হাসপাতালে ভর্তি করবেন এমন রোগীও নন। তাই স্ত্রী-কন্যাকে ডাক্তার ও হোটেল-ম্যানেজারের হেফাজতে রেখে ভদ্রলোক দেশে ফিরে গেছেন, প্রয়োজন মত টাকাকড়ির চেষ্টায়।

যে রকম সহজ সুরে বলাই বলে গেল কাহিনী, তাতে তা নিয়ে তাকে রসিকতা করার মনোভাব আর আমাদের রইল না। বেশ বুঝতে পারলাম, পল্লীগ্রামের মহিলা রুগ্ন অবস্থায় কলকাতার হোটেলে অভিভাবক-বিহীন হয়ে থেকে বলাইয়ের উপর পুত্রবৎ নির্ভর করবেন এ-ই স্বাভাবিক। এবং সেই স্নেহ ও দায়িত্বকে অস্বীকার করবার মত ছেলে বলাই নয়।

বিশু পর্যন্ত গম্ভীরভাবে বললে, তা ডাক্তার—যখন তোমার উপর দায়িত্ব দিয়েছেন, তখন সর্বান্তঃকরণে তোমার তা পালন করা উচিত।

এবার তা হলে আমি যেতে পারি? আপনারা অনুমোদন করছেন, বলে বলাই বেরিয়ে গেল।

আমরা আমাদের গতানুগতিক হাসিঠাট্টা গল্পগুজবে ডুবে রইলাম।

দিন আষ্টেক পরে সকাল বেলায় বলাই আমার ঘরে এসে হাজির। বললে, বড় মুশকিলে পড়া গেছে পবিত্রদা। শেয়ালদা অঞ্চলে একটা নামকরা হোটেল, সেখানেও যে মানুষ নিশ্চিন্তে স্ত্রী-কন্যাকে রেখে যেতে পারবে না—এ কি সাংঘাতিক অবস্থা!

কি ব্যাপার হল? আমি বিস্ময়ে প্রশ্ন করলাম।

বলাই জবাবে বললে, সাংঘাতিক অত্যাচার শুরু করেছে হোটেল-ওআলারা। কি করা যায়, সেই পরামর্শই চাইছি আপনার কাছে।

ব্যাপারটা বলাই যা বললে তা হল এই:

ভদ্রলোক যাবার সময় হোটেলের ম্যানেজারকে কয়েক দিনের টাকা জমা দিয়ে বলে গিয়েছিলেন, যদি আমার ফিরতে কোনক্রমে একআধ দিন দেরি হয়ে যায়, আপনি সেটা চালিয়ে নেবেন। হোটেলের মালিক হেসে জবাব করেছিলেন, আপনার কোন ভাবনা নেই। এমনি কত লোক থাকে। আমরাও ত মানুষ, টাকা দিতে একআধ দিনের এদিক ওদিক হলে তাড়িয়ে দিই না তাদের।

ভদ্রলোকের ফিরতে দু-এক দিন নয়, অনেক বেশী দেরি হয়ে গেল। টাকা ফুরোবার দিন কয়েক যেতে না যেতেই ম্যানেজারের শ্যালক তার হোটেলের খবরদারির কাজে বেশ কড়া হয়ে উঠলেন। ভদ্রমহিলাকে ঘরে এসে জানালেন, যে-টাকা তাদের হিসেবে জমা দেওয়া ছিল সে-টাকা যখন ফুরিয়ে গেছে, তখন আরও টাকা না দিলে হোটেলে তাদের থাকতে দেওয়ার অসুবিধা হবে!

ম্যানেজার-শ্যালকের কথার জবাব দিলে ভদ্রমহিলার সদ্যবিবাহিতা কন্যা, বাবা ত ম্যানেজারবাবুকে বলে গেছেন যে, তিনি ফিরে এসে টাকা দেবেন।

ও, আচ্ছা ঠিক আছে, বলে বাঁকা হাসি হেসে সেদিনকার মত বিদায় নিয়েছিল শ্যালকপুঙ্গব।

দু দিনের জায়গায় ছ দিন হয়ে গেল, ভদ্রলোক এলেন না, টাকা পাঠালেন না, শুধু চিঠি লিখলেন স্ত্রীর কাছে এবং ম্যানেজারের কাছে—যেতে দেরি হয়ে যাচ্ছে, তবে ভাবনার কোন কারণ নেই, ফিরে এসেই টাকাকড়ি সব মিটিয়ে দেবেন।

শ্যালকটি কারণে-অকারণে দিনে বহুবার এদের ঘরে এসে উপস্থিত হয়। এটা-ওটা অজুহাতে যতক্ষণ পারে গল্প করে। সহানুভূতি দেখে বিগলিত হয়ে মা ও মেয়ে দুজনেই তাকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করে। আমি যতক্ষণ আছি, কোন ভাবনা নেই আপনাদের—দিনে বার কয়েক শ্যালক মহাশয় একথা শুনিয়ে দেয়।

কিন্তু ভাবনা তিনিই সৃষ্টি করে দিলেন। একদিন বেশ গম্ভীরভাবে জানালেন এসে, টাকা না হলে আর আমরা পারছি না, অনেক টাকা হয়ে গেছে। বাধ্য হয়েই আপনাদের 'মীল' বন্ধ করতে হবে আমাদের।

যারপরনাই বিব্রত বোধ করেও মেয়েটি মার তরফে জবাব করেছিল, আপনাদের পক্ষে অসম্ভব হলে দেবেন না খাবার, আমরা বাইরে থেকে আনিয়ে নিয়েই যা-হোক বরং খাব।

কে জানে, মেয়েটির এরকম সপ্রতিভ জবাবের প্রতিবাদেই কি না সেদিনই সন্ধ্যার সময় শ্যালকপুঙ্গবের কাছ থেকে একটি চিঠি এল মেয়েটির কাছে—তুমি যদি আমার কথা রাখ, তাহলে আমি আমার কথা রাখব, আমাদের পাওনা টাকা-কড়ির জন্য কিছু ভাবতে হবে না তোমাদের।

নিরুপায় হয়ে মেয়ের মা বলাইকে দেখান চিঠিখানা, এবং বলাইয়ের সাহায্য চান।

বলাইয়ের কাছে আদ্যোপান্ত শুনে রাগে আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত কাঁপতে লাগল। ইচ্ছে হল, ছুটে গিয়ে শ্যালকের বেআদবি ঠাণ্ডা করে দিয়ে আসি। কিন্তু দল পাকিয়ে হোটেলে গিয়ে হৈ-হল্লা মারামারি করা তখনই সম্ভব—যখন হাতে টাকার জোর থাকে, ঠক্ করে চাঁদির জুতা মারতে পারি হোটেলওআলার মুখে; কিন্তু শুকনো পকেট নিয়ে দেনদারের হয়ে পাওনাদারের বিরুদ্ধে কোন অপমানেরই প্রতিবাদ করা সম্ভব নয়।

ভেবে দেখি, কি করা যায়। রাস্তা একটা বার করতেই হবে, বলে বলাইকে তখনকার মত বিদায় করে দিলাম।

কিছু টাকা চাই। প্রায় শ'খানেক। এখনি চাইবা মাত্র এ টাকা কার কাছে পাওয়া যেতে পারে, ভাবতে ভাবতে কোন কূলকিনারা পেলাম না। মোল্লার দৌড় মস্‌জিদ পর্যন্ত, আমার দৌড় 'কমলালয়'। তবু মনে হল, ন'মার কাছে চাইলে পাই কি না পাই কিছু ঠিক নেই, বরং না দিতে পেরে তিনি বিব্রত বোধ করলে আমার পক্ষে দ্বিগুণ আপসোসের বিষয়

হবে। কিন্তু তাঁর দাদা সুরেন ঠাকুর, হিন্দুস্থান ইনসিওরেন্সের হর্তাকর্তা বিধাতা, দরাজ মন, খোলা হাত। আর চৌধুরী বাড়ীর সম্পর্কে আমিও তাঁর স্নেহভাজন।

কলেজ থেকে বলাই ফিরে আসতেই বললাম তাকে, চল একটা জায়গা থেকে টাকাটা সংগ্রহের চেষ্টা দেখি। এমন লোকের কাছে যাব, যিনি কখনও না বলতে জানেন না।

সন্ধ্যার পরে দুজনে এসে দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনে হাজির হলাম।

সাধারণত সুরেন ঠাকুর মহাশয় এ বাড়ীতে থাকেন না, তাঁর স্ত্রী-পুত্র থাকেন রাঁচিতে, দুই মেয়ে থাকে পিসীর কাছে, আর তিনি নিজে থাকেন তদানীন্তন হিন্দুস্থান বিল্ডিং-এর ওপর তলায়। স্ত্রী-পুত্র কলকাতায় আসতে সাময়িকভাবে এই সময় পারিবারিক আবাসে বাস করছেন। বিশ্বভারতীর বর্তমান কার্যালয় যে বাড়ীতে, পরবর্তীকালের রবীন্দ্রনাথ নির্মিত সেই বিচিত্রা ভবনেই তখন সুরেন্দ্রনাথ সপরিবারে অবস্থিত।

তখনকার দিনে পরিচিত কাউকে ঠাকুর বাড়ীতে ঢুকতে হলে কোন এত্তেলার প্রয়োজন ছিল না। আমি ও বলাই সোজা দোতলায় উঠে এলাম। দেখলাম বারান্দায় ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে মামাবাবু একখানা বই পড়ছেন। আমাকে দেখেই বললেন, কি ব্যাপার, রাত্রি করে?

বিশেষ বিপদে পড়েই এসেছি। আমার বন্ধুটি এবং আমি দুজনে পরামর্শ করে অগত্যা আপনারই শরণ নিয়েছি।

আমাদের দু'জনার বসবার জন্য চেয়ার আনার হুকুম দিলেন তিনি। চেয়ারে বসে আদ্যোপান্ত কাহিনীটি আমি তাঁকে বলে গেলাম। সর্বশেষে বললাম, টাকাটা হোটেলওআলার নাকের উপর ছুঁড়ে দিতে পারলে, তবেই সসম্মানে একটি সদ্যবিবাহিতা কিশোরী মেয়ের জান মান বাঁচানো সম্ভব। এবং সেই টাকার আরজি নিয়েই এসেছি আপনার কাছে, অন্য কোথাও যোগাড় করে উঠতে পারিনি।

কত টাকা তোমাদের দরকার? জিজ্ঞাসা করলেন সুরেনবাবু।

আমি বলাইয়ের মুখের দিকে তাকালাম, বলাইও আমাকে কিছু না বলে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমি বলে ফেললাম, প্রায় শ'-সওয়াশো টাকা হলে সবদিক মানিয়ে নেওয়া যাবে।

একটুকাল চোখ বুজে কি ভাবলেন সুরেনবাবু, তারপর স্ত্রীকে ডেকে পাঠালেন।

সংজ্ঞা দেবী এসে উপস্থিত হতে সুরেনবাবু তাঁকে বললেন, একটি পরিবারকে বিশেষ বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য কিছু নগদ টাকা এখুনি দরকার; তোমার কাছে কি আছে?

টাকা পঞ্চাশ-ষাট হবে, উত্তর করলেন সংজ্ঞা দেবী।

টাকাটা তুমি আমাকে পাঠিয়ে দাও, কালই দরকার হলে টাকা তুলে আনব।

সংজ্ঞা দেবী চলে গেলে সুরেনবাবু বললেন, দেখি গোপালকে জিজ্ঞাসা করে, সে কত দিতে পারে!

এজমালি ঠাকুর এস্টেটের খাজাঞ্চী গোপালবাবুকে ডেকে পাঠাতে তিনি শশব্যস্ত এসে হাজির হলেন। ভক্তি, বিনয় ও আনুগত্য তাঁর সমগ্র দেহে পরিস্ফুট। দীর্ঘকায় গোপালবাবু তাঁর স্থূল বপুটি ফতুয়ায় আবৃত করে কাঁধের গামছাখানায় গললগ্নীকৃতবাস হয়ে করজোড়ে এসে দাঁড়ালেন। মুখে কোন প্রশ্ন নেই, চোখে মুখে আজ্ঞা লাভের প্রত্যাশা। সুরেনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, গোপাল, আমার একখানা চেক রেখে নগদ শ'খানেক টাকা দিতে পার, এখুনি?

মাথা নেড়ে গোপালবাবু বললেন, তা পারব না কেন। আর চেকেরই বা দরকার কি! কাল বরং যখন ব্যাঙ্কে যাব তখন চেকখানা দিয়ে দেবেন, আমি ভাঙিয়ে নিয়ে আসব।

বেশ বেশ, তা-ই হবে। বলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন সুরেন্দ্রনাথ, যেন ভীষণ একটা বিপদের হাত থেকে তিনি নিজেই বেঁচে গেলেন।

টাকাটা তাহলে নিয়ে আসি, বলে গোপালবাবু অন্তর্হিত হলেন। এবং মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই ফিরে এলেন একশ টাকা হাতে করে। টাকাটা রেখে গোপালবাবু চলে যাওয়ার পরে সুরেনবাবু আমাদের বললেন: এই দেড়শো টাকায় তোমাদের সব দিক ভাল ভাবে মীমাংসা হবে আশা করি।

নিশ্চয়ই। আমি সোল্লাসে বলে উঠলাম। আপনার কাছে এলে সমস্যার যে সমাধান হবেই, এই স্থির বিশ্বাস ছিল বলেই আসতে ভরসা পেয়েছিলাম।

মৃদু হেসে মন্তব্য করলেন সুরেনবাবু, একজন যা ভয় দেখিয়েছে তার

প্রতিপক্ষে কোনখান থেকে ভরসা না পেলে চলবে কেন? নিরুপায় হয়ে পরাজয় স্বীকার করে দুর্জনকে দৌরাত্ম্য করতে দেবে—এটা তরুণের ধর্ম নয়। আর কারুরই নয়। যা হোক, ওদের বিলি-ব্যবস্থা নিরাপদে এবং, সুষ্ঠুভাবে হয়ে গেলে আমাকে একটা খবর দিও, উদ্বেগে থাকব।

আমরা দুজনে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে বেরিয়ে এলাম। রাস্তায় নেমেই বলাই বললে, দু শো তারিফ দিচ্ছি পবিত্রদা, তুমি পারবে জেনেই তোমাকে ভরসা করেছিলাম। চল, এখন দেখি গিয়ে তাদের কি হাল।

আমি বললাম, আমাকে আর কেন ভাই? টাকা নিয়ে তুমি যাও, তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা কর গিয়ে।

ওরে বাব্বা, বলে উঠল বলাই, ওই হোটেলের ম্যানেজার আর তার শয়তান শালা—তাদের সঙ্গে বোঝাপড়া করা আমার কর্ম নয়। তা ছাড়া, টাকা দিলেই ওদের ওখানে আর থাকা উচিত কি না, আর না হলে থাকবেই বা কোথায়—এসব সমস্যা তুমি না হলে আমি একা সামলাতে পারব না।

থাকবেন কোথায় তা আর আমি কি করে বলি, বল। মেসে এনে ত আর তুলতে পারব না।

তাঁরা যে রকম বিপন্ন তাতে মেসে আসতে হয় ত আপত্তি নাও করতে পারেন।

হ্যাঁ, একটা বাঘের ভয়ে ছুটে আসবে একদল নেকড়ের মধ্যিখানে। বিপদে পড়ে তারা দিগ্বিদিক জ্ঞান হারালেও তুমি আমি কেন দেবো তাদের আবার ভুল করতে?

তা হলে তুমি আমি দুজনকেই যেতে হয়।

গায়ে পড়ে বিপন্ন মহিলার সাহায্যে এগিয়ে যাওয়ায় যে শিভাল্‌রি আছে তা দেখিয়ে বেড়ানোয় আমার আপত্তি।

তোমার কাছ থেকে একথা আশা করিনি পবিত্রদা। যেমন নিরাসক্ত ভাবে টাকা যোগাড় করে দিয়েছ তেমনি অনাসক্ত চিত্তে তাদের নিরাপদ ব্যবস্থাও করবে তুমি।

অগত্যা বলাইয়ের সঙ্গে হোটেলে গিয়ে হাজির হলাম। বলাই দরজায় টোকা মারতেই ভিতর থেকে ভীরু কণ্ঠে সাড়া এল, কে?

বলাই বললে, ভয় নেই, আমি বলাই। সঙ্গে আমার দাদা আছেন।

খুট করে দরজা খুলতেই বলাই জিজ্ঞাসা করল, আমার দাদা আছেন সঙ্গে, ভিতরে নিয়ে আসব কি?

জবাব আমার কানে পৌঁছল না, বলাই বলল, ভিতরে এসো পবিত্রদা।

বলাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে খাটের পাশে বসলাম। সসঙ্কোচে দাঁড়িয়ে রইলেন মধ্যবয়সী শীর্ণকায়া গৌরবর্ণা সামান্যাভরণা মহিলা। ঘরের কোণে বাক্সের উপর বসে যে মেয়েটি, সদ্যোস্তিন্নযৌবনা, সুন্দরী নয়, স্বাস্থ্য ও লাবণ্যের প্রতীক। সিঁথির সিঁদুর ও কপালে সিঁদুরের বড টিপ সাক্ষ্য দিচ্ছে তার পরিণীত জীবনের। বুঝলাম এই মেয়েটিকেই হোটেল-শ্যালক ওদের কাছ থেকে প্রাপ্য টাকার বদলে আর কিছু দেবার তাগিদ দিয়েছে।

বলাইয়ের দিকে তাকিয়ে আমি প্রশ্ন করলাম, আজ কি খেয়েছেন ওঁরা সারা দিন? হোটেল দিয়েছিল খাবার?

ভদ্রমহিলা জবাব করলেন, খাবার নিয়ে এসেছিল চাকর, আমি ফেরত দিয়েছি, চিঁড়ে আনিয়ে খেয়েছি দুজনে।

আমি বললাম, এখানে আর আপনাদের থাকা হতে পারে না। কেউ আছেন কলকাতায় আপনাদের আত্মীয় যেখানে দু-পাঁচ দিন থাকতে পারেন মেয়ে নিয়ে? যিনি টাকা সংগ্রহে দেশে গিয়েছেন তাঁকে বিব্রত করে তাড়া দিয়ে নিয়ে এসে লাভ হবে না ত কিছু। সময় মত আসবেন তিনি।

একটুকাল ভেবে নিয়ে মহিলা বললেন, আমার এক দূর-সম্পর্কের মাসী আছেন উল্টাডিঙিতে। আর কারুর কথা মনে করতে পারছি না।

মাসী রাখবেন আপনাদের? বলাই জিজ্ঞাসা করল।

মাসীর অবস্থা ভাল নয়, তিনি জবাব করলেন। তবে বিপদে পড়ে গিয়ে তাঁর কাছে দু-চার দিনের জন্য আশ্রয় চাইলে ফেলতে পারবেন না।

তাঁর ঠিকানা জানেন?

লেখা আছে, খুঁজে দেখতে হবে।

এ বেলাও বাইরের খাবার টাবার খেয়েই থাকুন, আমি বললাম। আমরাই বরং আনার ব্যবস্থা করে দিয়ে যাচ্ছি।

ভেজানো দরজায় টোকা মেরে একটি কিশোর উঁকি মেরে থতমত খেয়ে গেল। বলাই জিজ্ঞেস করলে, কি চাস্‌রে রতন?

মাথা চুলকোতে চুলকোতে রতন বললে, মা ও দিদি ওবেলা দই

চিঁড়ে খেয়েছেন, এ বেলা কি খাবেন? ঠাকুর খাবার দিচ্ছিল, আমি বলেছি, জিজ্ঞাসা করে আসি।

বলাই বললে, এ বেলাও বাইরের খাবারই খাবেন।

মুখখানা বিমর্ষ করে রতন বললে, দু বেলাই বাইরের খাবার?

হ্যাঁ। হোটেলের রান্না ভাল লাগছে না ওঁদের, আমি বললাম, তাই একদিন মুখ বদলানো।

একটা টাকা ওর হাতে দিয়ে বললাম, কিছু লুচি আর মিষ্টি কিনে এনে দে তুই।

হাত খালি করে একটু পরে গেলে হবে? জিজ্ঞাসা করলে রতন।

হবে, কিন্তু তা বলে বেশী দেরি করিসনে, বললে বলাই।

দেরি করব কি, সেই কখন চিঁড়ে খেয়েছেন,—বলেই টাকাটা নিয়ে বেরিয়ে গেল রতন।

তাহলে বলাই, কাল সকালেই আমরা এসে ওঁদের উল্টাডিঙি পৌঁছে দেবো। ভদ্রমহিলার দিকে মুখ না ফিরিয়েই তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললাম, আজ রাতটুকু কাটিয়ে দিন এখানে। কোন ভয় করবেন না। কাপুরুষ যারা তারা আপনারা ভয় পেয়েছেন দেখলেই সাহস পাবে।

আপনারা যখন ভরসা দিচ্ছেন তখন আর ভয় পাব কেন?

আমি দাঁড়িয়ে উঠলাম, বললাম, আমি চলি বলাই, তুমি বরং ওঁদের খাবার আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করে যেয়ো।

পরদিন সকালে আমরা দুজনে ওঁদের তৈরি হতে বলে হোটেল-ম্যানেজারের ঘরে এসে উপস্থিত হলাম। ম্যানেজারকে বললাম,—নম্বর ঘরের বোর্ডারদের দরুন আপনার কি পাওনা হয়েছে?

সে কথা কেন, বললেন ম্যানেজার, ভদ্রলোক বলে গেছেন তিনি দেশ থেকে ফিরে এসে টাকাকড়ি মিটিয়ে দেবেন।

ওঁরা এখনি চলে যাবেন কি না জবাব করলে বলাই।

হঠাৎ! ব্যাপার কি? বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন ম্যানেজারবাবু।

টাকা না দেওয়ার জন্য আপনার হোটেল ওঁদের মীল্-বন্ধের নোটিশ দিয়েছে। কাল ওঁরা খান নি।

চোখ দুটো কপালে তুলে ম্যানেজার বললেন, বলেন কি, আমি ত জানি না কিছু।

আপনি যদিচ না-ই জানেন, আমি বললাম, ব্যাপারটা তা-ই ঘটেছে। টাকার অসুবিধায় পড়ে আত্মসম্মান নিয়ে আপনার এখানে আর থাকা সম্ভব হচ্ছে না ওঁদের। তাই উনি এক আত্মীয়ের বাড়ী গিয়ে উঠবেন ইচ্ছা করছেন।

বড়ই দুঃখের কথা, বললেন ম্যানেজার, আমি বরং ওঁদের বুঝিয়ে বলছি।

আর বুঝিয়ে বলতে হবে না, রাগের সুরে বললাম আমি। ম্যানেজারি করেন, হোটেলে কি ঘটে না-ঘটে তার খোঁজ রাখেন না! বুঝিয়ে বলে ভদ্র মহিলার মর্যাদা নষ্ট করার কোন্ অধিকার আছে আপনার ?

কথা বাড়িয়ে লাভ কি, বললে বলাই, আপনার পাওনা-গণ্ডা মিটিয়ে নিন, ওঁরা চলে যাবেন। হোটেলে কেউ চিরদিন থাকতে আসে না।

খাতা খুলে একটা কাগজে পেন্সিলে হিসেব করে ম্যানেজার পাওনার অঙ্কটা জানালেন, প্রায় আশি টাকার কাছাকাছি।

এবার আমি সুর বদলালাম। বললাম, ও টাকাটা আপনার শালার নামে খরচা লিখে রাখুন, একটি পয়সাও পাবেন না আমাদের কাছ থেকে। বোর্ডারদের নিয়ে যাচ্ছি।

ম্যানেজারও এবার অন্য সুর ধরলেন, এত চোখ রাঙাচ্ছেন কেন ? নিয়ে যাব বললেই আপনাদের আমি নিয়ে যেতে দিতে পারি না। আমার হেপাজতে যিনি ওঁদের রেখে গিয়েছেন, তাঁর হুকুম ছাড়া কারুর হুকুমেই হোটেল থেকে বেরুতে দেওয়া হবে না ওঁদের।

জোর করে আটকাবেন নাকি ? বললে বলাই।

বেশ ত, চেষ্টা করে দেখুন না, আমি বললাম। মহিলা বর্ষিয়সী, তিনি কোথায় যাবেন বা থাকবেন সে বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন। স্বামীর মতের যদি বা প্রয়োজন থাকে, আর কারুর অভিভাবকত্ব মেনে চলার তাঁর কোন দরকার নেই।

তবে হ্যাঁ, বললে বলাই, মেয়েটিকে আটকাতে পারেন আপনি যদি তাঁর স্বামীর দেওয়া কোন অথরিটি থাকে আপনার হাতে।

তার মানে ? থতমত খেয়ে জিজ্ঞাসা করলে ম্যানেজার।

বলাই পকেট থেকে একখানা হাতে লেখা বাংলা চিঠি ফেলে দিলে তাঁর

সামনে। ম্যানেজার তুলে নিয়ে পড়তে শুরু করতেই আমি জিজ্ঞাসা করলাম হস্তলিপিটি চেনেন?

চিনি, আমার শালার। মুখখানা যেন একটু ম্লান হয়ে গেল।

আপনার শালা-শ্বশুরবাড়ী—তারাই কি হোটেলের মালিক? আমি প্রশ্ন করলাম। না, আপনার শালা এখানে কারবার ফেঁদেছেন কিছু?

সে হোটেলের কাজে আমার এ্যাসিস্ট্যাণ্ট, বললে ম্যানেজার।

আমি বললাম, নিয়মমত ম্যানেজারকেই এ্যাসিস্ট্যাণ্টের কৃতকর্মের দায়িত্ব বহন করতে হয়; না হয় তাকে শাস্তি দিতে হয়। পারবেন আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে ওঘরে গিয়ে সবার সামনে শালাকে জুতোতে?

চিঠিখানা বাঁ হাতের মুঠিতে শক্ত করে ধরে রেখে বললে ম্যানেজার,—আপনারা যে একেবারে আদালতের পেয়াদা এসেছেন মনে হচ্ছে।

বলাই বললে, পেয়াদা নিয়ে আসাটাই আপনার ইচ্ছে দেখছি।

চেষ্টা করে দেখুন না, ম্যানেজার বললে।

চিঠি ফেরত দিন, আমি বললাম।

ওর জন্যেও আদালতের পেয়াদা লাগবে, ম্যানেজার বেশ গম্ভীর ভাবেই উত্তর করল।

আমি বললাম, চিঠি আপনি রাখতে চান, রাখুন। সার্টিফাই-করা ফোটো-স্টাট্ কপি আমার থানায় জমা করা আছে। চল হে বলাই, থানা-পুলিশই করিয়ে ছাড়বে এরা।

আমি উঠে দাঁড়াতেই ম্যানেজার বললে, অত চটছেন কেন দাদা। আপনি জানেন, আমার দিক থেকে কোন ত্রুটি হয় নি।

শালা সামলাতে পারেন না, সেইটেই ত আপনার অমার্জনীয় ত্রুটি। আবার হোটেল করতে এসেছেন! আমি বললাম।

যাক যাক, যা হয়ে গেছে, বিনীত সুরে বললে ম্যানেজার। ওঁরা যদি আত্মীয় বাড়ীতেই যাওয়া ভাল মনে করেন, আমি বাধা দেবো কেন বলুন? আপনারাই ত বলেছেন, হোটেলে চিরদিন কেউ থাকে না। তবে আমাকে একেবারে লোকসানের মধ্যে ফেলবেন না।

বোর্ডাররা যেখানে অপমানিত হয়, বললে বলাই, মহিলাদের সম্ভ্রম থাকে না, সে হোটেলে টাকা দেবে মানুষ! উলটে সম্ভ্রমহানির গুণোগারি আদায় করা উচিত আপনার কাছ থেকে।

হেসে মন্তব্য করলে ম্যানেজার, পয়সার হিসাবেই যদি মহিলাদের সম্ভ্রম মাপা যেত, তবে আপনাদের এত রাগ করবার কোন দরকারই ছিল না। সম্ভ্রম যদি ওঁদের হানি হয়ে থাকে—

সে বিষয়ে এখনো আপনার সংশয় আছে নাকি? আমি বললাম।

না, না, ঠিক তা বলছি না, বলে চলল ম্যানেজার, আমি পয়সা না নিলেই সে সম্ভ্রম ফিরে আসবে না,—এই কথাই আমি বলতে চাইছিলাম।

তবু আপনার পকেটে হাত পড়লে আপনি কিছুটা অবহিত হবেন ভবিষ্যতে এমনি আর না ঘটে। আমি বললাম

পঞ্চাশটি টাকা নিয়ে ম্যানেজার খুশী হয়েই ফুল সেটেলমেণ্টের রসিদ দিয়ে দিলেন। এবং চাকরদের জানিয়ে দিলেন, ওঁদের যাবার ব্যাপারে যথাসাধ্য সাহায্য করতে। শ্যালক-পুঙ্গবের, অবশ্য, কাছাকাছি কোথাও সাক্ষাৎ পাওয়া যায় নি।

থার্ড ক্লাশ ঘোড়ার গাড়ী করে মা ও মেয়েকে নিয়ে আমি ও বলাই এসে উল্টাডিঙির ঠিকানা-মত বাসায় পৌঁছলাম।

গাড়ী থেকে নেমে ওরা ভিতরে ঢুকতেই মাসীর খাণ্ডারদানি গলা শুনতে পেলাম। ভারী আমার কুটুম এসেছেন! পারবো না আমি অত ঝঞ্ঝাট পোয়াতে।

আমি মেয়েটিকে ইসারায় দরজার কাছে ডেকে পঞ্চাশটি টাকা হাতে দিয়ে বললাম, এটা মাসীকে এখনি দাও গিয়ে। বলো, মা দিলেন।

মেয়েটি গিয়ে কি ভাবে টাকা দিলে চোখে পড়ল না, একটু পরেই শুনলাম মাসীর গলার স্বর অনেক নেমে গেছে। বলছেন, তা আর কি করব বাছা, বিপদে পড়ে এসেছে বোনঝি, অসুবিধা হলেও ফেলতে ত পারব না।

বলাই আমার দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বললে, সত্যি পবিত্রদা, টাকা এমন জিনিস যে ফণা-ধরা কেউটের মাথায় ঠেকালেও বোধ হয় পায়ে লুটিয়ে পড়বে।

চলে আসবার সময় ভদ্রমহিলার হাতে আর পঞ্চাশটা টাকা দিয়ে বলাই বললে রেখে দিন। ওষুধপত্র আরও কত কি দরকার লাগতে পারে।

চোখেমুখে কৃতজ্ঞতা ফুটে উঠল তাঁর, বললেন, কি আর বলব বাবা, তোমরা ব্রাহ্মণ, আশীর্বাদটুকুও করা উচিত হবে না। ভগবান তোমাদের ভাল করবেন।

একটু চুপচাপের পর আবার বললেন, আমি ওঁকে চিঠি লিখে দিচ্ছি, কিন্তু ইতিমধ্যে যদি এসে পড়েন, তোমরা একটু খোঁজ রেখো।

সুরেন ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে ব্যাপারটা জানিয়ে এলাম। একটি মাত্র কথা—যা তাঁকে বললাম না, তা হল—পঞ্চাশ টাকার দুধকলা দিয়ে তবে ফোঁস-মনসা মাসীকে শান্ত করার খবর। বললাম, মাসী হৃষ্টচিত্তেই ওঁদের গ্রহণ করেছেন।

মেস-জীবনের গতানুগতিকতার মধ্যে বিশ্বপতির বাড়ীর আড্ডাটি ছিল আমার প্রধান বৈচিত্র্য। কেন এবং কেমন করে সবুজপত্রগোষ্ঠীর মধ্যে বিশ্বপতির সঙ্গেই আমার অন্তরের হৃদ্যতা সৃষ্টি হয়েছিল, তার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ কোন দিনই করতে পারিনি। তবে তার অন্তর ছিল আমারই মত বোহেমিয়ান—যদিও জীবনযাত্রা ছিল তার প্রচুর সংহত।

বিশ্বপতির বাড়ীর পরিবেশের প্রতি আমার আকর্ষণ ছিল আরও বেশী। বিশ্বপতি পণ্ডিত এবং গুণী—একথা তার বন্ধুজন অকুণ্ঠচিত্তে চিরদিন স্বীকার করে এসেছে, কিন্তু তার গুণপনার স্বীকৃতি বাড়ীর পরিজনের মধ্যেও যেভাবে দেখেছি তেমনটি সচরাচর চোখে পড়ে না। বাবা, দাদারা ছোট ভাইয়েরা তাকে স্বাভাবিক স্নেহ ও শ্রদ্ধা করতেন ঠিকই, কিন্তু তার সঙ্গে তাঁদের ব্যবহারের মধ্যে সব সময়ই বিশ্বপতির গুণপনার স্বীকৃতিও ধরা পড়ত। তার উপর বিশ্বাসও ছিল তাঁদের অগাধ। প্রকৃত রসজ্ঞ বিশ্বপতি যাই করুক না কেন, গতানুগতিক লোকবিচারে যতই তা নিন্দনীয় হোক না কেন, এটুকু বিশ্বাস বাড়ীর সকলেরই ছিল যে অন্যায় সে কিছুই করবে না। সত্যি বলতে কি, আমি একেবারে তাজ্জব ব'নে গেলাম যেদিন ওর বাবা আগের দিন অনেক রাত্রিতে ওর বাড়ী ফেরার প্রসঙ্গ তুললেন, আর বিশ্বপতি স্বচ্ছন্দে উত্তর করলেন—যাদুমণির গান শুনছিলাম। ওর পিতৃদেব সানুমোদন হাস্যে বললেন, শীতের রাত্রে ঠাণ্ডা না লাগে, সেইটে লক্ষ্য রেখো বাবা।

যাদুমণি সে কালের বিখ্যাত গায়িকা, মহারাজ যতীন্দ্রমোহনের আনুকূল্যে সঙ্গীত শিক্ষায় তিনি অসামান্য পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন, তাঁর গানের

আসরে মশগুল হয়ে রাত দুপুর অবধি কাটানো রসবোধের পরিচয় বলে স্বীকৃত হলেও সাধারণ নীতিবোধের মাপকাঠিতে তা নিন্দনীয় ছিল, কারণ সে যুগের গায়িকারা অধিকাংশই এ-যুগের গায়িকাদের মত গৃহস্থ-বধূ বা গৃহস্থ-কন্যা হিসেবে সমাজে সম্মানের আসন লাভ করতেন না। এ হেন গানের আসরে রাত দুপুর পর্যন্ত রসের আকর্ষণে বসে থাকা বিশ্বপতির পক্ষে অন্যায় আচরণ নয়, বিশ্বপতিজনকের এই মনোভাবে পুত্রের প্রতি তাঁর গভীর বিশ্বাসই ফুটে উঠল।

বিশ্বপতির মেজদাকেও ছোট ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলতে দেখেছি—যেন বিশ্বস্ত এবং গুণী বন্ধুর সঙ্গেই আলাপ করছেন।

সন্ধ্যার দিকে বিশ্বপতির বেনেটোলা লেনের বাড়ীতে আমরা জমায়েত হতাম। আর যাঁরা নিয়মিত আসতেন তাঁদের মধ্যে অগ্রণী লালবাজারের অন্যতম কেরানী নিকুঞ্জবিহারী সেন। পুলিশ আপিসের কেরানী হলেও শিক্ষায় রুচিতে এবং রসবোধে বিশ্বপতির পরম সৌহার্দ্য অর্জন করেছিলেন তিনি। আর আসতেন সঙ্গীতরসিক আতপ বাঁড়ুজ্যে, যাঁর আর একটা নেশা ছিল মোহনবাগানের খেলা। এই আড্ডার প্রতিও তাঁর ছিল অপরিসীম নিষ্ঠা—ঝড় জল বৃষ্টি ঋতুভেদ কোন কিছুতেই তাঁর আসার কামাই হত না। পটুয়াটোলার ফণীবাবু ও ফটিকবাবু—এঁরাও আসতেন।

বিশ্বপতি সাহিত্যিক, অথচ তাঁর এই আড্ডাটি গান, খোশগল্প ও খেলা-ধুলোর গরম আলোচনাতেই মশগুল হয়ে থাকত এবং সব কিছুর মধ্যে সমান আগ্রহে অংশ নিতেন বিশ্বপতি নিজে। এই আড্ডায় শিল্পরস বিতরণ করতেন মেজদা তারকব্রহ্ম চৌধুরী। পৈত্রিক আমদানি কারবার তিনিই দেখা শুনা করতেন, কিন্তু তাঁর অবসর সময় কাটত শিল্প-সংগ্রহে। দেশী ও বিদেশী ছবির সংগ্রহ তাঁর ছিল প্রচুর। প্রায়ই তাতে নতুন নতুন সংগ্রহ সন্নিবিষ্ট হত এবং আমাদের অকৃপণ ভাবে সে রস তিনি পরিবেশন করতেন। বিশ্বপতির নিজের ছবি আঁকাও তখন সমান আগ্রহে চলেছে। আরব্ধ, অসমাপ্ত ও সমাপ্ত ছবি নিয়ে অনেক অনধিকারচর্চা করেছি আমরা, আমাদের সে চর্চাকে শিল্পী বিশ্বপতি কিন্তু সশ্রদ্ধভাবে স্বীকার করে নিয়েছেন।

প্রবাসীর গল্প-প্রতিযোগিতার প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত 'অশোক' নিয়ে তখন বেশ খানিকটা সাড়া পড়ে গেছে। ভারতবর্ষের পরিত্রাণের পথপ্রদর্শক

অহিংসব্রতী গান্ধীজীর প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগপূর্ণ হৃদয় রিভলভারধারী সন্ত্রাসবাদী যুবক অশোকের আদর্শবাদের ভাবময় চিত্র সেদিনের জাতীয় আদর্শবাদ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের নবজাগ্রত চেতনাকে উদ্বেল করে তুলে-ছিল। লেখক মণীন্দ্রলাল বসুর রচনাশৈলীর কাব্যময়তাও বাঙলা কথা-সাহিত্যে অভূতপূর্ব মনে হল।

বিশ্বপতির বৈঠকে 'অশোক' এবং তার লেখক-প্রসঙ্গ আলোচনাক্রমে বিশ্বপতি প্রস্তাব করলেন, আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই কি না। বলা বাহুল্য, এই ধরনের প্রস্তাব নিজে থেকে করাই যার স্বভাব, তাকে দ্বিতীয় বার তা জানাতে হল না। বরং আমিই বিশ্বপতিকে তাগাদা দিয়ে নিয়ে গেলাম।

ডাঃ কার্তিক বসুর অগ্রজ সিদ্ধেশ্বর বসু মহাশয়ের পুত্র মণীন্দ্রলাল তখন এম, এ, ও ল ক্লাসের ছাত্র। আমহার্স্ট স্ট্রীটের বাড়ী থেকে সন্ধ্যায় এসে নরেন সেন স্কোয়ারে কাটান। সন্ধ্যার সময় বিশ্বপতির সঙ্গে গিয়ে আমি হাজির হলাম। সেখানে গুটি দুই-তিন সঙ্গী নিয়ে ঘাসের উপর বসে কথাবার্তা চলছে তাঁদের। বিশ্বপতি আর আমি ওঁদের পাশাপাশিই বসে পড়লাম। যে সুদর্শন নম্রনয়ন ও মধুর হাসি যুবক বিশ্বপতিকে স্বাগত প্রশ্ন করলেন তিনিই মণীন্দ্রলাল।

তোমার 'অশোক' গল্প বের হবার পর অনেক লোকই তোমাকে খুঁজে বার করবে, তার একজন প্রকৃষ্ট উদাহরণ আমার সঙ্গে, বললেন বিশ্বপতি।

আমার দিকে তাকিয়ে হাত তুলে নমস্কার করলেন মণীন্দ্রলাল, বললেন, অশোক গল্প আপনার ভাল লেগেছে?

শুধু আমার নয় যাঁরা পুরস্কারের জন্য নির্বাচন করেছেন তাঁদের যোগ্যতায় দেশের সাহিত্যরসিকদের আস্থা আছে। আর পুরস্কার না পেলেও এই গল্প পড়ার পরে সকলেই বাঙলা সাহিত্যক্ষেত্রে নতুন আবির্ভাব অনুভব করতে পারতেন।

প্রত্যুত্তরে কিছু বললেন না মণীন্দ্রলাল। সলজ্জ হাসিতে আমার মুখের দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিলেন। বিশ্বপতি বললেন, পবিত্র যখন তোমাকে খুঁজে পেয়েছে, তখন এই নতুন আবির্ভাব আর অনুভবের বিষয় হয়েই থাকবে না, দিকে দিকে ও ঘোষণা করে বেড়াবে।

পবিত্রবাবু—

মণীন্দ্রলালের মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বিশ্বপতি বলে চললেন, পবিত্রবাবুটিকে ত চেনো না,—ও সাংঘাতিক লোক। প্রমথ চৌধুরীর আড্ডা থেকে শুরু করে ভারতীর আড্ডা, জলধরদার বৈঠক, মানসীর আড্ডা, মায় সাহিত্য-পরিষদের আখড়া পর্যন্ত সর্বত্র ওর অবাধ গতায়াত। সাত দিনের মধ্যে দেখবে, সর্বত্র তুমি প্রখ্যাত হয়ে পড়েছ। তোমার অশোক যারা পড়েনি, তাদেরও পড়তে বাধ্য করবে। এবং যে নেহাতই অবাধ্য হবে তাকে অন্তত অশোক এবং তাঁর লেখক মণীন্দ্রলাল বসু সম্পর্কে অবহিত হতে হবে।

আমি জবাব করলাম, সাহিত্যের দরবারে দরোয়ানি করাতেই আমার আনন্দ। কে কখন আসছেন, কখন কোন্ সামন্তরাজ, কি রাজচক্রবর্তীর আগমন হচ্ছে তা ঘোষণা করা ছাড়া নিজের দিক থেকে সাহিত্য-সেবার আর কোন ক্ষমতাই আমার নেই।

তবু ভাল, মণীন্দ্রলালের একজন সঙ্গী মন্তব্য করলেন, নতুন লেখকদের অস্বীকার করা এবং কষাঘাতে জর্জরিত করে সাহিত্যক্ষেত্র থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার যে রেওয়াজ এদেশে আছে, তার মধ্যে আপনার মত মুখর ভাটের অস্তিত্ব কিছুটা উৎসাহ ও আশার সঞ্চার করবে।

আমি কিন্তু লেখার আনন্দে লিখি, বললেন মণীন্দ্রলাল। সুখদুঃখ ও আদর্শ-সংঘাত সত্ত্বেও মানুষ এবং জীবন আমার চোখে অপূর্ব সৌন্দর্যে মণ্ডিত হয়ে দেখা দেয়। আমার সেই অনুভূতি আমি লেখায় প্রকাশ করি। গল্প হল কি না, সমালোচনায় কি তার মূল্য হবে, তা ভেবেও কখনো দেখি না।

বিশ্বপতি বললেন, যাই হোক, প্রবাসী যখন তোমাকে প্রথম পুরস্কার দিয়েছে, তখন সমালোচকেরা তোমাকে খুব বেশী কোণঠাসা করে রাখতে পারবে না। লেখার আনন্দে লিখে যাবে বটে, কিন্তু সম্পাদকের নিজেদের আগ্রহেই তা ছাপবেন মনে হচ্ছে। আর পাঠকেরা গল্প পড়ে আনন্দ পেলে উন্নাসিক সমালোচকদের তুড়ি মেরে নস্যাৎ করে দেবে।

বিভিন্ন সাহিত্যিক গোষ্ঠীর সঙ্গে আপনার বুঝি প্রচুর হৃদ্যতা? স্মিত-হাস্যে প্রশ্ন করলেন মণীন্দ্রলাল।

আরে একেবারে ভ্যাগাবণ্ড, বললেন বিশ্বপতি। চাকরি করেন প্রমথ চৌধুরীর কাছে। প্রধান ডিউটি হল সময়মত মাইনে পাওয়া, আর গৌণ

কাজ সবুজ পত্র-এর ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করা। কাজেই চাকরির বাইরে যতসব সাহিত্য-গোষ্ঠীর সঙ্গে মিতালী পাতিয়ে রস দেওয়া-নেওয়াই ওর প্রধান কাজ হয়েছে। একেবারে পেরজাপতি!

মৌমাছি বললে ভাল হত না ভাই? আমি বললাম, ফুলে ফুলে মধু-আহরণ করি বটে কিন্তু প্রজাপতির মত ক্ষণবিলাসী চঞ্চলচিত্ত আমি —এ কথাটা শুনতে ভাল লাগে না।

প্রজাপতি ক্ষণবিলাসী হতে পারে মণীন্দ্রলাল মন্তব্য করলেন, লঘুচিত্তও বটে, কিন্তু সে ত হুল ফোটায় না, আর ফুলের মধু নিজের ভাণ্ডারে নিয়ে জমা করে না। ফুল থেকে ফুলে উড়ে নতুন ফুল ফোটাতে ও ফল ধরাতে প্রজাপতিকেই চাই, মৌমাছিকে নয়।

হ'ল পবিত্র! বললেন বিশ্বপতি। পড়েছ রোমান্টিকের হাতে, সে বলবে স্কুলপাঠ্য পুস্তকে মৌমাছি শ্রমের আদর্শ হলেও, শ্রমের চেয়ে প্রেম বড় এবং প্রেমের চেয়েও বড় সৌন্দর্য। প্রজাপতি প্রেমের প্রতীক, বিধাতার সৃষ্টিতে সৌন্দর্যের অপূর্ব নিদর্শন।

মৌমাছি হুল ফোটায় ঠিকই, আমি বললাম।

তার সব চেয়ে অপরাধ, সব সময় অকারণ ভ্যান্ ভ্যান্ করে, বললেন বিশ্বপতি। প্রজাপতি নীরব প্রেমিক।

তাও মানি. আমি বললাম, মৌমাছির সব দোষই মেনে নিলাম, কিন্তু ফুলের মধু লুট করে নিয়ে নিজের ভাণ্ডারে সে জমায় বলেই না মানুষের মধু-পিপাসা তৃপ্ত হতে পারে!

অপূর্ব যুক্তি তোর, তীব্র স্বরে মন্তব্য করলেন বিশ্বপতি। 'ডাকাত লুঠ করে অনেক ঘড়া মোহর মাটিতে পুঁতে রেখেছিল বলেই চাষীর ছেলে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে মোহর পেয়ে গেল, অতএব ডাকাত মহা-পুরুষ, এই ত?

তোমরা ভাই, অকারণ তর্ক করছ, বললেন মণীন্দ্রলাল। ফুলের কাছে দুই-ই সমান লুঠেরা। অথচ ফুল ফোটায় ফল ধরায় দুজনেই। মানুষ মৌচাকে মধু পায়, হুলও খায়; প্রজাপতি ভালমন্দ কিছুই দেয় না।

অতএব কুইট্‌স্, বললেন বিশ্বপতি।

প্রজাপতির অতিরিক্ত দান—তার সৌন্দর্য, তবু বলি কুইট্‌স্, বললেন মণীন্দ্রলাল। ঝগড়া করে কি হবে?

কি আর হবে, বললেন বিশ্বপতি, নস্যির ঝাঁঝটা শুধু একটু জমবে ভাল।

মণীন্দ্রলালের সহচরেরা হো হো করে হেসে উঠলেন। মৃদু হাস্য করলেন মণীন্দ্রলাল নিজে। বিশ্বপতি বড় এক টিপ নস্যি চড়ালেন। আমার চুরুটটা যে কখন নিভে গিয়েছিল, হঠাৎ সে খেয়াল হতে আমি দেশলাই বার করলাম।

উঠবার আগে আমি মণীন্দ্রলালকে অনুরোধ জানালাম বিশ্বপতির বাড়ী আসবার জন্য, মনে মনে অভিলাষ, তার জোরে আড্ডাটার সাহিত্যিক চরিত্র বাড়িয়ে তোলা যাবে।

মণীন্দ্রলাল হেসে বললেন, আমি কিন্তু আমাদের এই পরিচিত খোলা পরিবেশেই ভাল থাকি। আপনি আসুন না এখানে, যখন সময় করতে পারেন। আপনার কাছ থেকে গোটা সাহিত্যিক জগতের খবরাখবর পাব।

মিথ্যে চেষ্টা করছিস পবিত্র, বিশ্বপতি বললে, ও লোক দেখলে ভয় পায়। অপরিচিত পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নিতে ওর সময় লাগে। তার চেয়ে তোর ত বিশ্বপরিক্রমা আছেই, ঘুরতে ঘুরতে মাঝে মাঝে এসে সাহিত্য-সমাজের রয়টারী করে যাস ওর কাছে।

জালিয়ানওআলাবাগ হত্যাকাণ্ডের পরে সারা ভারতের মাটি তখন বিস্ফোরকে পরিণত হয়েছিল। অশান্তির প্রকাশ বাইরে দেখা যায় নি, তা নয়; কিন্তু সর্বত্র একটা থমথমে ভাব, কখন যেন বিক্ষোভের ঘূর্ণিবাত্যায় সারা দেশ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

এই অবস্থায় ১৯২০ সালের ৩১-এ জুলাই ঘটল লোকমান্য তিলকের মৃত্যু। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী তখন উদীয়মান সূর্য, কিন্তু লোকমান্যের জনপ্রিয়তাও অস্তমুখী নয়। নরমপন্থী কংগ্রেসের মধ্যে তিনি চরমপন্থী প্রবর্তন করেছিলেন। আবেদন-নিবেদনে ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে রাজনৈতিক অধিকারের কণামাত্র লাভকেই যারা জাতীয় আন্দোলনের পরমার্থ বিবেচনা করতেন, পদমর্যাদা বংশমর্যাদা ও শিক্ষা-মর্যাদায় তাঁরাই এতদিন

জাতীয় নেতৃত্ব পরিচালনা করে এসেছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে দীপ্তকণ্ঠে তিলকই ঘোষণা করেছিলেন—আবেদন-নিবেদনে নয়, দাবির জোরেই অধিকার আদায় করতে হবে। সুরাট কংগ্রেস হট্টগোলের মধ্যে ভেঙে গিয়েছিল, সেখানে কোন সমাধান হয় নি। নরমপন্থীরাই কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব কবজা করে রেখে দিয়েছেন। তিলক তখন সময়ক্ষেপ করছেন জাতীয় যুবশক্তির সংগঠনে। শিবাজী উৎসবের প্রবর্তনে মহারাষ্ট্র যুবশক্তিকে উদ্বোধিত করেছেন তিনি। শহীদ ক্ষুদিরামের দেশভক্তিকে তারিফ করে তিনি বাঙালীর অন্তর জয় করেছেন। বাঙালী আজ যা ভাবছে, কাল সারা ভারত তার অনুসরণ করবে—এই মতবাদের অন্যতম প্রবর্ত্তক হিসেবেও তিনি বাঙলার পরম প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন।

সেই তিলকের মৃত্যুতে কলকাতার সমগ্র মধ্যবিত্ত সমাজে যে শোকের কালোছায়া দেখেছি, তার আগে তেমনটি কখনো চোখে পড়ে নি। ট্রামে, বৈঠকখানায়, রোয়াকে, চায়ের দোকানে, ফুটপাতের কোণে কোণে, যেখানে দু-চার জন মিলিত হয়ে কথাবার্তা কইছে, সেখানেই আলোচ্য বিষয় তিলকের মৃত্যু এবং তার ফলস্বরূপ ভারতের জাতীয় আন্দোলনের অপরিসীম ক্ষতি।

এই অবস্থায় মৃত্যু সংবাদকে সম্পূর্ণ অবহেলা করে এংলো-ইণ্ডিয়ান মুখপত্র স্টেট্‌সম্যান পত্রিকার ৩রা আগস্টের সম্পাদকীয় স্তম্ভে দেড় কলম প্রবন্ধ বেরুল তিলককে ইতর ভাষায় গালাগালি করে। তাতে লেখা হল:

The death of Mr. Tilak brings to a close a career which might have been rich in beneficent results, but was so wrongly directed as to yield little except evil passions. .. ... His aims were wrong, his methods indefensible and mischievious and the spirit in which he worked bad. (মিঃ তিলকের মৃত্যুতে এমন একটি জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটেছে যা কল্যাণকর প্রভাবে সমৃদ্ধ হতে পারত; কিন্তু তা এমন বিপথে চালিত হয়েছে যে দুষ্ট মনোভাব ছাড়া আর কিছুই দিতে পারে নি। ... তার উদ্দেশ্য ছিল বিপথগামী, তার কর্মপন্থা ছিল অসমর্থনযোগ্য ও ক্ষতিকর এবং যে মনোভাবে তিনি কাজ করেছেন তাও ছিল হীন।) শুধু এতেই ক্ষান্ত না হয়ে সম্পাদক কবে কোথায় কোন্ ইংরেজ তিলককে গালাগালি দিয়েছেন তা

উদ্ধৃত করে তিলকের মৃত্যুতে দেশ যে রাহুমুক্ত হয়েছে তার জন্য দারুণ পরিতৃপ্তি প্রকাশ করলেন।

With the death of Mr. Tilak, India is purified by the disappearance of a malign and degrading influence . of good faith honour and fairness he had no conception. (তিলকের মৃত্যুতে এক বিষাক্ত ও নীচ প্রভাবের অপসরণে ভারতবর্ষ পবিত্রীকৃত হয়েছে। ...সৎবিশ্বাস, সম্মানবোধ ও ন্যায়ান্যায় ভেদ সম্পর্কে কোন ধারণাই তার ছিল না)।

কলকাতার ভারতীয় সমাজে প্রবল আকারে "স্টেট্‌স্‌ম্যান" বিদ্বেষ ফেটে পড়ল। ইতিপূর্বে একাধিক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে তারা গান্ধীকে "fanatic Mahatma," "the humourous Mahatma" প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত করেছে। ইংলণ্ডের উদারতান্ত্রিক দলের পক্ষে ভারতসচিব মণ্টেগু ভারতবর্ষের জন্য শাসন-সংস্কারের প্রস্তাব করায় লর্ডসভার মতামতের প্রতিধ্বনি করে 'স্টেট্‌স্‌ম্যান' তাঁর প্রতি যথেষ্ট শ্লেষ ও কটূক্তি বর্ষণ করেছে। এমন কি, জালিয়ানওআলাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রধান ঘাতক ও'ডায়ারকে পুরস্কৃত করার জন্য তহবিল খুলে অর্থ সংগ্রহ করেছে। এই সব কিছু উপেক্ষিত হয়েছিল, কিন্তু পরলোকগত তিলকের প্রতি কটূক্তি দেশবাসী কোন মতেই সহ্য করতে রাজী হল না।

ঠিক এই সময় আর একটি ঘটনা ঘটল, জনসাধারণের স্বতঃপ্রণোদিত দান 'মহাত্মা' উপাধিতে ভূষিত গান্ধী বড়লাট চেম্‌স্‌ফোর্ডকে জুলু যুদ্ধে ও বুয়র যুদ্ধে সেবাকার্যে লব্ধ পদক ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধে সন্ধিতে তুরস্কের প্রতি দুর্ব্যবহার ও মুসলমান-বিশ্বের ধর্মগুরু খলিফাকে বিতাড়নের ফলে সারা ভারতে মুসলমানদের মনে যে আঘাত দিয়েছে ইংরেজ এবং জালিয়ানওআলাবাগের হত্যাকাণ্ডে দেশবাসীর প্রতি যে, পশুবৎ আচরণ করেছে, তারই প্রতিবাদ জানিয়ে গান্ধীজী লিখলেন যে এহেন সরকারের দেওয়া ভূষণ তিনি গ্রহণ করতে পারেন না। তিনি লিখলেন :

"Your Excellency's light-hearted treatment of official crime, your exoneration of Sir Michael O'Dyer, Mr. Montagu's despatch and above all, the shameful ignorance of the Punjab events and callous disregard of the feelings of Indians betrayed by

the House of Lords have filled me with the greatest misgivings regarding the future of the Empire, have estranged me completely from the present government and have disabled me from tendering, as I have hitherto whole heartedly tendered my loyal co-operation. In my humble opinion the ordinary method of agitating by way of petitions and deputations and the like is no remedy for moving to repentance a government so hopelessly indifferent to the welfare of its charge as the Government of India has proved to be. (মহামান্য বড়লাট বাহাদুরের সরকারী অপরাধ বিষয়ে লঘুচিত্ত ব্যবহার, স্যর মাইকেল ও'ডায়ারের দোষস্খালন প্রচেষ্টা, মিঃ মণ্টেগু প্রেরিত বার্তা এবং সর্বোপরি পাঞ্জাবের ঘটনাসমূহ সম্পর্কে লর্ডসভার লজ্জাকর অজ্ঞতা এবং ভারতীয়দের মনোভাব তাদের চূড়ান্ত ঔদাসীন্য, সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমার মনকে সংশয়ে ভরে তুলেছে, বর্তমান সরকারের প্রতি আমাকে সম্পূর্ণ ভাবে অমিত্রমনোভাবাপন্ন করে তুলেছে এবং এ যাবৎ আমি আন্তরিক ভাবে যে রাজানুগত্য-সুলভ সহযোগিতা দিয়ে এসেছি, ভবিষ্যতে তা দিতে আমাকে অক্ষম করে তুলেছে। আমার বিনীত অভিমত এই যে, ভারত সরকার তার অধীনস্থ প্রজাদের সম্পর্কে এমন অমার্জনীয় ঔদাসীন্য দেখিয়েছে, আবেদন-নিবেদনের গতানুগতিক আন্দোলনে তার মধ্যে অনুশোচনা সৃষ্টি করা সম্ভব নয়)।

গান্ধীজীর এই পত্র প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উষ্মায় ফেটে পড়ল ফিরিঙ্গি মুখপত্র 'স্টেট্‌স্‌ম্যান'। দীর্ঘ সম্পাদকীয়তে অজস্র শ্লেষবাণ বর্ষণ করে লেখা হল:

They (British Government) have as a consequence forfeited Mr. Gandhi's respect and affection. Doubtless the loss will cause much concern to Lloyd George but why does Mr. Gandhi punish the Government of India for the sins of the Allies? Does he suppose that the sight of Lord Chelmsford shrinking under the lash of Mr. Gandhi's indignation will lead the prime minister to assemble in hot haste at San Remo to cancel the Turkish treaty?

(অতএব বৃটিশ সরকার মিঃ গান্ধীর শ্রদ্ধা ও প্রীতি হারিয়েছে! এতে লয়েড জর্জ বড়ই বিড়ম্বিত বোধ করবেন, তা নিঃসন্দেহ। কিন্তু মিঃ গান্ধী মিত্র পক্ষের পাপের শাস্তি ভারত সরকারকে দিচ্ছেন কেন? তিনি কি মনে করেন যে, তাঁর ক্রোধের কষাঘাতে লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ডকে সঙ্কুচিত হতে দেখেই প্রধান মন্ত্রী তুর্কী সন্ধি নাকচ করবার জন্য স্যান রেমোতে ছুটবেন?)

শ্লেষ বাক্যের পরে শুরু হল কটূক্তি:

It is surely the height of impudence that the creature of anarchy and disobedience to laws should attempt to put the responsibility of his crimes upon the ruler of the province, who was called upon in virtue of his position, to stamp out the fire which a silly fanatic had kindled. Has Mr. Gandhi no friends who would tell the truth to this victim of a swollen head? (এই অরাজকতা ও আইন অমান্যের প্রচারকের পক্ষে তার নিজের অপরাধের দায়িত্ব প্রদেশপালের উপর চড়াবার চেষ্টা বাস্তবিকই চরম ধৃষ্টতা। এক মূর্খ উন্মাদ যে আগুন জেলেছে তা নেবাবার দায়িত্ব সেই প্রদেশ পালের! মিঃ গান্ধীর কি কোন বন্ধু নেই যিনি এই আত্মম্ভরী লোকটিকে সত্যি কথা বলতে পারেন?)

'স্টেট্‌স্‌ম্যান'-এর ধৃষ্টতা ও আত্মম্ভরিতা এখানেই শেষ হয় নি। বিদেশ থেকে উড়ে আসা ও জোর করে জুড়ে বসা ইংরেজ সরকারের সমর্থনে ভুঁইফোড় বিজাতীয় সঙ্কর সমাজের মুখপত্র জনগণের হৃদসিংহাসনে অধিষ্ঠিত নেতাকে দেশত্যাগ করে যেতে বললে, কারণ তাঁর কার্যকলাপ তাদের মনঃপূত নয়। গান্ধীজীর অসহযোগ ছিল বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে কিন্তু বৃটিশ সরকারকে ভারতবর্ষের সঙ্গে এক করে মিলিয়ে চরম ধৃষ্টতায় স্টেট্‌স্‌ম্যান নির্দেশ দিলে:

The height of non-cooperation would be for Mr. Gandhi to shake the dust of India from his feet and go somewhere else—it does not in the least matter where. (মিঃ গান্ধীর পক্ষে চূড়ান্ত অসহযোগ হবে ভারতের ধুলো পা থেকে ঝেড়ে

ফেলে অন্য কোথাও চলে যাওয়া—কোথায় তাতে এতটুকুও আসে যায় না)।

আপামর ভারতীয় সমাজে স্টেট্‌স্‌ম্যান্‌-এর বিরুদ্ধে অপরিসীম বিক্ষোভ ফেটে পড়ল। তিলকের স্মৃতিসভায় ও শোকসভায় স্টেট্‌স্‌ম্যান বর্জনের প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং ক্রমে সেই বর্জনের জন্যই একটি বিশিষ্ট আন্দোলন গড়ে ওঠে। দেশনায়কবৃন্দ অনেকেই এই আন্দোলনকে সমর্থন জানান এবং সর্বত্র এই উদ্দেশ্যে সভা-সমিতি চলতে থাকে। গোলদীঘির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একদিন আনুষ্ঠানিক ভাবে স্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রিকা পোড়ানো হয়। এই আন্দোলনে সর্বাধিক কর্মপ্রবণতা দেখান সাংবাদিক শ্রীপ্রিয়নাথ গুহ। অনতিবিলম্বে স্টেট্‌স্‌ম্যান-এর তদানীন্তন মালিক আর. নাইট এণ্ড সন্স ভালো টোপ ফেলে গুহ মহাশয়কে গেঁথে তুলল। পরবর্তী যুগে স্টেট্‌স্‌-ম্যান-এর সম্পাদক মণ্ডলীর প্রথম ভারতীয় সদস্য হিসেবে মিঃ পি. এন. গুহ যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন।

পাড়ায় পাড়ায় তরুণ স্বেচ্ছাসেবকের দল গড়ে উঠল যারা চৌকি দেবে কোন হকার গোপনে কোথাও স্টেট্‌স্‌ম্যান সরবরাহ করছে কি না। যে স্কোয়াডে আমি ছিলাম, তার পাহারার এলাকা ছিল মিরজাপুর স্কোয়ার (শ্রদ্ধানন্দ পার্ক), কলেজ স্কোয়ার ও কলেজ ষ্ট্রীট হ্যারিসন রোডের মোড়—এই তিন-কোণা অঞ্চল। মোড়গুলো ছাড়াও মাঝে মাঝে স্পাই-ইং করতে হয়, কারণ, খেতাবধারী, পেন্সনভোগী ছাড়াও একদল পরম ইংরেজভক্ত তখনও স্টেট্‌স্‌ম্যান-ভক্তিতে গদ গদ। তাঁরা অভ্যাস মত স্টেট্‌স্‌ম্যান পড়বার অধিকার দাবি করে আমাদের ঔদ্ধত্যকে তিরস্কার করতেও ত্রুটি করেন নি। স্টেট্‌সম্যান-এর পক্ষে বাক্‌যুদ্ধেও প্রবৃত্ত হয়েছেন এবং অবশেষে 'গুণ্ডার অত্যাচারে' নিরুপায় হয়ে প্রকাশ্য পথ বর্জন করে গোপনে স্টেট্‌স্‌ম্যান আমদানি করেছেন।

হ্যারিসন রোডের মোড়ে একদিন হৈ হৈ করে এক পশ্চিমা ভদ্র-লোককে ট্রাম থেকে টেনে নামানো হল। ট্রামে বসে তিনি স্টেট্‌স্‌ম্যান পড়ছিলেন, ট্রামের লোকের প্রতিবাদে কান দেন নি। অবশেষে পথের উপর বহুজন পরিবৃত হয়ে 'শেম' 'শেম' ধ্বনির মধ্য তিনি অনুশোচনা প্রকাশ করলেন, বললেন, 'বয়কট' আন্দোলনের খবর তিনি এলাহাবাদে বসে একটু আধটু জানেন নি তা নয়, তবে তা যে সত্যি এত প্রবল

তা তিনি অনুমান করতে পারেন নি। হাওড়া স্টেশনে নেমে হুইলারের স্টল থেকে কোন সংশয় না নিয়েই কাগজখানা কিনেছিলেন। বলা বাহুল্য তাঁর হাতের পত্রিকা অনেক আগেই কে একজন টান মেরে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে। পদতলে পিষ্ট হয়ে তার সত্তার এতক্ষণে প্রভূত পরিবর্তন ঘটে গেছে।

গোলদীঘির উত্তর পশ্চিম কোণে তিলকের স্মৃতি-সভা। উপস্থিতদের মধ্যে রয়েছেন বিপিনচন্দ্র পাল, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্যারিস্টার আই. বি. সেন, শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।

বক্তৃতা-প্রসঙ্গে পাঁচুদা তিলককে অবাঙালী বঙ্গনেতা বলে অভিহিত করলেন। বললেন, তাঁর কর্মক্ষেত্র বাঙলা থেকে বহুদূরে হলেও বাঙালীর চিন্তা, বাঙালীর ভাব, বাঙালীর কর্মপ্রবণতা—সব কিছুরই তিলক ছিলেন অন্যতম প্রধান প্রচারক। ক্ষুদিরামের আত্মবলিদান বাঙালীকে যতই উচ্ছ্বসিত করুক, সর্বভারতীয় নেতৃবৃন্দ তাকে অবহেলাই করেছেন। কেউ কেউ তাঁকে য়্যানার্কিস্ট বলে কটূক্তি করতেও দ্বিধা বোধ করেন নি। একমাত্র তিলকই 'কেশরী' পত্রিকার সম্পাদকীয়তে ক্ষুদিরামের দেশ-প্রেমের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন। তার জন্য ইংরেজ সরকারের রক্ত-চক্ষুকে তিনি ভয় করেন নি, দীর্ঘকাল কারাদণ্ডও হাসিমুখে বরণ করেছেন।

এই সিংহবিক্রম পুরুষ যে India in Unrest গ্রন্থে জনৈক ইংরেজ কর্তৃক তাঁর নীতি ও কর্মপন্থ ধিকৃত হওয়ার জন্য লেখক ও প্রকাশকের বিরুদ্ধে বিলেতের আদালতে মান-হানির মামলা করতেও পিছ-পা হন নি, সেকথাও পাঁচুদা শ্রোতাদের কাছে বিবৃত করলেন।

সমবেত জনতার করতালির মধ্যে উঠে দাঁড়ালেন বিপিনচন্দ্র পাল। তিনি বললেন, তিলকের মৃত্যুতে যদি আমরা শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ি, শ্রীকৃষ্ণ-বিহীন অর্জুনের মত গাণ্ডীব ফেলে দিয়ে বসে থাকি, তাহলে ব্যর্থ হবে তিলকের জীবনের সাধনা। ১৯০৫ থেকে যে উদ্দীপনা ও চেতনা দেশময় সঞ্চারিত হয়েছে, তাকেই নতুন শক্তি ও সংগঠনী দিয়ে দৃঢ়তর করেছেন তিলক। জাতীয় কংগ্রেস আজো নরমপন্থীদের তাঁবে রয়েছে, সেই কংগ্রেসকে পুরোপুরি সংগ্রামমুখী করে তুলতে হবে। দ্বিগুণ উদ্দীপনায় আন্দোলন চালাতে হবে জনসাধারণকে। সাতসমুদ্রের ওপারে ইংরেজের দম্ভের আসন যাবে ধসে পড়ে। স্টেট্স্ম্যান-এর ঔদ্ধত্যের

প্রতিকার স্টেট্‌স্‌ম্যান বর্জনেই পরিসমাপ্ত হবে না, ইংরেজের যতগুলি প্রতিষ্ঠান এদেশে বসে সাম্রাজ্যের দালালি করছে, মুষ্টিমেয় খয়েরখাঁদের সহযোগিতায় জনগণের প্রতিনিধি বলে দাবি করছে নিজেদের সেই সবগুলিকে বর্জন করলে, তাদের দোকান গুটোতে বাধ্য করলে, তবেই তিলকের প্রতি অপমানের, জাতীয় আন্দোলনের প্রতি কটূক্তির, ও'ডায়ারকে পুরস্কৃত করবার দম্ভের যোগ্য প্রত্যুত্তর হবে।

প্রাক-মাইক যুগে পাল মহাশয়ের কণ্ঠ সমস্ত জনতা কাঁপিয়ে প্রশ্ন তুলল—দেশবাসী কি ইংরেজ সরকারের আর তার দালাল ও গুপ্তচরদের ঔদ্ধত্য সহ্য করবে?

সমবেত কণ্ঠে ধ্বনি উঠল—কখনই না।

বিপিনবাবু আরও বললেন, জালিয়ানওআলাবাগের প্রতীকার ও প্রতিবাদ কি হবে তা নির্ধারণের জন্য শহীদরক্তপূত এই বাঙলার এই কেন্দ্রেই কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন বসবে অচিরে। কলকাতাবাসী, সমগ্র বাঙলার জনসাধারণ সেদিন ভারতবর্ষকে পথ দেখাবার জন্য প্রস্তুত হোক। ইংরেজের সঙ্গে সামগ্রিক সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হবে। আবেদন-নিবেদনের দিন শেষ হয়ে গেছে। পশুর সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় না, কোন রফা হতে পারে না—এই স্থির বিশ্বাস নিয়েই কর্মপন্থা নির্ধারিত করতে হবে। আমি জানতে চাই, আপনারা তার জন্য প্রস্তুত আছেন কি-না।

গোলদীঘির জলে তরঙ্গ তুলে আকাশ পাতাল কাঁপিয়ে হাজার কণ্ঠে ধ্বনি উঠল—নিশ্চয়ই।

তিলকের জন্য শোক-প্রকাশ প্রস্তাবের সঙ্গে জাতীয় আন্দোলন দৃঢ়তর করবার এবং স্টেট্‌স্‌ম্যান বর্জন চালিয়ে যাবার প্রস্তাবও সভায় গৃহীত হল।

এতদিন নিজেকে নিয়েই বিব্রত থেকেছি, মনোমত পরিবেশ সন্ধান করেছি কেবল আত্মতৃপ্তির আশায়। সভার বক্তৃতা ও জনগণের উদ্দীপনা অন্তত তখনকার মত আমার মনে সংকল্প জাগিয়ে দিল, দেশের এই কর্মপ্রবণতার মধ্যে আমার নিজের অংশ আমাকে খুঁজে নিতে হবে। মনে নতুন সংকল্প নিয়ে গোলদীঘির জলের ধারে বসে নানা কথা ভাবতে লাগলাম। যে শোভন ব্যবহার ও কাব্য-সঙ্গীত-সাহিত্যের বৈঠকখানা-সংস্কৃতির পিছনে অবিরত ছুটোছুটি করছি, সেই মরীচিকার অন্বেষণ

কোথায় নিয়ে যাবে আমাকে! দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ আত্মপ্রকাশের ও আত্মবিকাশের কোন সুযোগ না পেয়ে পশুর জীবনভার নিঃশব্দে ও নিঃসংকোচে বয়ে নিয়ে চলছে; তাকে অস্বীকার করে ও পাশ কাটিয়ে সুন্দরের ধ্যানে নিমগ্ন হওয়া কি সম্ভব!—এই প্রশ্নই আমার মনকে আলোড়িত করতে লাগল। সমাজ-জীবনের অজস্র গ্লানির বিরুদ্ধে লেখনীর কষাঘাত চালিয়েছেন চৌধুরী মহাশয়। শরৎদা বার বার প্রশ্ন করেছেন—কেন মানুষ সামাজিক অত্যাচারের বোঝায় নিপীড়িত হবে?

বার বার এই কথাই মনে হতে লাগল—সাহিত্যিকের কর্তব্য কি এইখানেই শেষ, জনসাধারণ থেকে দূরে সরে থেকে সে কি শুধু প্রশ্নই করবে, আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে গ্লানিগুলি? জনসাধারণের মধ্যে নেমে এসে তাদের সুখদুঃখের অংশ গ্রহণ করে পরাধীনতার যে মূল-গ্লানি বিষের ন্যায় সমস্ত জীবনকে জর্জর করে রেখেছে, তাকে দূর করার আন্দোলনে যোগ দেওয়া কি সাহিত্য-সেবীর কর্তব্য নয়?

মনের এই অস্থিরতা কাটিয়ে উঠতে আমার বেশ ক'দিন সময় লাগল। তা কেটেও গেল। একদিনের উত্তেজনাকর পরিবেশে মনের মধ্যে যে উত্তেজনার চাঞ্চল্য জেগেছিল, প্রতিদিনের গতানুগতিকতায় তা ঝিমিয়ে পড়ল অবিলম্বে।

প্রথম মহাযুদ্ধের পরে বাজার যখন সরগরম, সব কিছু চড়াদামে বিকোচ্ছে, সেই সময় চৌধুরী মহাশয় 'কমলালয়' বিক্রী করে দিলেন নদীয়ার মহারাজের কাছে। নতুন বাড়ী তৈরী করতে যে স্বাভাবিক বিলম্বটুকু ঘটেছিল সেই সময়টা তিনি নগেন চৌধুরীর সানি পার্কের বাড়ীর নীচের তলায় ভাড়াটে হয়ে বাস করলেন। স্যার আশুতোষ চৌধুরীর একমাত্র জামাতা উপেন্দ্রনাথ চৌধুরীর অগ্রজ নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী কনিষ্ঠের খুড়ো-শ্বশুরকে যথেষ্ট সসম্মান ব্যবহারেই বাড়ীতে রাখলেন। তিনি নিজে অবশ্য ছিলেন আসামের চা-কর এবং সেখানকারই রাজনীতিক জীবনে সংশ্লিষ্ট, আসাম আইন পরিষদের সদস্যও তিনি হয়েছিলেন বলে মনে পড়ে।

ভারতবর্ষের প্রান্ত থেকে প্রান্ত তখন পাঞ্জাবের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে

উঠেছেন। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস তখনও মডারেটদের হাতে, এই কংগ্রেসকে কেন্দ্র করেই ইংরেজের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনার সংকল্পে গরমপন্থী নেতারা কংগ্রেস দখলের চেষ্টা করছেন। শ্রীযুক্ত মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব নিয়ে দেশের নানা স্থানে সফর করছেন। দেশের বিশেষ অবস্থা বিচার করে নীতি-নির্ধারণের জন্য কংগ্রেসের যে আসন্ন অধিবেশন, তারই তোড়জোড় চলছে তখন কলকাতায়। অধিবেশনে সভাপতি হবেন লালা লাজপৎ রায়। কিছুদিন আগে সদ্য আমেরিকা থেকে ফিরেছেন তিনি।

রাজনীতির মধ্যে সাগ্রহে এগিয়ে গিয়ে ঝাঁপ দেবার মনোভাব আমার কোন দিনই জাগেনি। কিছুদিন আগে যে উত্তেজনার উত্তাপে জ্বলে উঠেছিলাম, তা ঝিমিয়ে এসেছে, কারণ আমার তখনকার জীবনের পরিবেশ রাজনৈতিক আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার অনুকূল ছিল না। কিন্তু তা বলে সচেতন সজীব নাগরিক হিসাবে জাতীয় জীবন ও সমাজ-জীবনের প্রতিক্রিয়া এড়িয়ে চলবার চেষ্টাই বা আমি করব কেন? আমার দেশের প্রতিটি তন্ত্রী যেখানে চঞ্চল হয়ে উঠেছে, সেই চাঞ্চল্য আমাকেও উদ্দীপিত করল।

গান্ধীজীর অসহযোগ প্রস্তাব কংগ্রেসে তখনও গৃহীত হয়নি এবং কংগ্রেসকে নিয়ে মাথা ঘামানো জনসাধারণের মধ্যে শুরু হয়নি, বরং কংগ্রেসের বাইরের নেতৃবৃন্দ—তিলক ও গান্ধীকেই জনসাধারণ স্বীকার করে নিয়েছে। তিলকের মৃত্যুর পর গান্ধীই তখন জন-গন মনের অবিসম্বাদী অধিনায়ক। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে লোকে তাঁকে মহাত্মা আখ্যা দিয়েছে। কংগ্রেসকে জাতীয় সংগঠন বলে লোকে সেইদিনই স্বীকার করল যেদিন গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের আহ্বান সমগ্র জাতির অন্তরকে নাড়া দিয়েছে দেখে কংগ্রেস তা স্বীকার করে নিল।

কংগ্রেসের অধিবেশন উপলক্ষ্যে গরমপন্থী নেতাদের কলকাতায় উপস্থিতিকে সেদিনের বিদগ্ধ ও অভিজাত সমাজ কোন বিশেষ ঘটনা বলে গ্রহণ করেননি বটে, কিন্তু আপামর জনসাধারণের মধ্যে গান্ধী-মালব্য-লাজপৎ-প্রমুখের উপস্থিতি কলকাতার জীবনে এক নতুন ভাবের প্রেরণা জাগিয়েছিল। কেমন করে এঁদের কাছে ঘেঁষা সম্ভব হবে তা কোনমতেই ভেবে পাইনি। এমন সময় এক অঘটন ঘটে গেল।

রবিবার সকালে যথারীতি চৌধুরী মহাশয়ের কাছে হাজিরা দিয়েছি, এমন সময় সেখানে ঘটল শ্রীযুক্তা সরলা দেবী চৌধুরানীর আবির্ভাব। তিনি সাধারণত কলকাতায় বসবাস করলেও মাঝে মাঝেই পাঞ্জাব যান এবং পাঞ্জাবের নতুন রাজনীতিক পরিস্থিতিতে তাঁর স্বামী পাঞ্জাবের অন্যতম জননেতা রামভুজ দত্ত চৌধুরীর পাশেই ছিলেন। কংগ্রেসের অধিবেশন উপলক্ষ্যেই এই সময় তাঁর কলকাতায় আগমন।

চৌধুরী মহাশয়ের সানিপার্কের বাসার পাশেই মা স্বর্ণকুমারী দেবীর বাড়ীতে আছেন সরলা দেবী। গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করতে যাবেন, সেজন্য চৌধুরী মহাশয়ের মোটর গাড়ীখানা পেতে পারেন কি-না—এই প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন তিনি। সে যুগে ইচ্ছে করলেই প্রয়োজন মত যেখানে সেখানে ট্যাক্সি পাওয়া এত সহজ ছিল না।

তা নিয়ে যাও গাড়ী, মাখনকে বলে দিচ্ছি, বললেন চৌধুরী মহাশয়।

সঙ্গে যদি কোন লোক দিতে পারেন তাহলে বড় ভাল হয়, বললেন সরলা দেবী।

চৌধুরী মহাশয় বললেন, লোক আর এখন কোথায় পাব, যদি পবিত্র যেতে পারে—

এ বাড়ীর আশ্রিত কর্মচারী হিসেবে সরলা দেবী আমাকে চিনতেন এবং 'ভারতী'র আড্ডায় আমার যাতায়াত ছিল এ খবরও রাখতেন, কিন্তু প্রত্যক্ষ আলাপ কোন দিন হয়নি। তবু বললেন, তা পবিত্র গেলে ত ভালই হয়।

যে ভাবে আমার দিকে তাকিয়ে চৌধুরী মহাশয় জিজ্ঞাসা করলেন, ওঁর সঙ্গে গেলে তোমার কি খুব অসুবিধা হবে পবিত্র? চৌধুরী মহাশয়ের বাক্‌ভঙ্গীতে অভ্যস্ত আমার কাছে তা নেহাতই দুর্লঙ্ঘ্য হুকুম বলে মনে হল। সহজেই সম্মতি জানালাম, কিন্তু গান্ধীজীকে দেখবার জন্য আমার নিজের আগ্রহও যে অপরিসীম তা প্রকাশ করলাম না।

পোলক স্ট্রীটে গান্ধীজী উঠেছেন, যাওয়ার পথে গাড়ীর মধ্যে সরলা দেবী আমার সম্বন্ধে দু-একটি মৌখিক প্রশ্ন করে প্রত্যক্ষ পরিচয় প্রতিষ্ঠা করলেন। তারপরই বললেন, গান্ধীজীর সামনে দাঁড়াতে পারাও জীবনের একটা পরম মুহূর্ত। মহাতীর্থে পৌঁছে প্রকৃত ভক্ত যে পুলক ও বিস্ময় অনুভব করে সেই বিস্ময়-মিশ্রিত পরমানন্দ অভিভূত করে দেয় গান্ধীজীর

সামনে যে-কোনও লোককে। আমার কথা যে কত বড় সত্য তা তুমি নিজেই বুঝতে পারবে।

আমি বললাম, 'ভারতী'তে আপনার লেখা গান্ধীজীর আফ্রিকা-আন্দোলন' প্রবন্ধ ছাড়া গান্ধীজী সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছুই জানবার সুযোগ পাই নি। কিন্তু ভারতবর্ষে তিনি ফিরে আসার পর থেকে তাঁর কার্য-কলাপের যে বর্ণনা এবং ব্যক্তিত্বের যে পরিচয় খবরের কাগজের মারফতে পেয়েছি তা বিস্ময় সৃষ্টি করার মত নিশ্চয়ই।

একটা কথা ভুলে যেয়ো না পবিত্র, সরলা দেবী বেশ জোরের সঙ্গেই বললেন, একটি মাত্র লোকের ডাকে সারা ভারতের যুগ যুগান্তের নিদ্রা ভেঙেছে। এমনটি বুদ্ধ-চৈতন্যের পর আর ঘটেছে কি-না সন্দেহ। সে মানুষ যে কত বড় তা কি মুখে বলে শেষ করা যায়? তুমি দেখে নিয়ো পবিত্র, এ শুধু শুরু। ইংরেজের সিংহাসনের ভিত পর্যন্ত ধসে পড়বে।

আমি বললাম, সাধারণ মানুষের মধ্যে এই কলকাতা শহরেই যে জাগরণের সাড়া দেখতে পাচ্ছি তা ইতিপূর্বে কল্পনাও করতে পারি নি।

তার মূলেও একটি মানুষ, তা যে যা-ই বলুক না কেন, বললেন সরলা দেবী।

পোলক স্ট্রীটের সরু গলির মধ্যে সরলা দেবীর পিছন পিছন গাড়ী থেকে নামলাম। ফটক থেকে তিন তলায় ওঠা পর্যন্ত ভলান্টিয়ারদের চঞ্চল গতায়াত চোখে পড়ল। কিন্তু কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে না। তিন তলায় উঠে সরলা দেবী দরজার পাশের ভলান্টিয়ারটিকে প্রশ্ন করলেন গান্ধীজী ভিতরে আছেন কি না?

ভলান্টিয়ার উত্তরে জী বলতেই তিনি ভিতরে ঢুকে পড়লেন। আমিও পশ্চাদনুসরণ করছিলাম, কিন্তু ভলান্টিয়ার বাধা দিলে, জুতি ছোড়কে অন্দর যাইয়ে।

দেখলাম, সত্যি দরজার সামনে অনেক জুতো। বুঝলাম, জুতো খুলেই ভিতরে যাওয়ার ব্যবস্থা, কিন্তু আমি যাঁর সঙ্গে এসেছি, তিনি সোজা জুতো পরে চলে গেলেন, কেউ কোন বাধা দিলে না, আর আমার বেলায় জুতো খোলার নির্দেশ অসহ্য মনে হল, বিশেষ করে দুজনেরই পায়ে একই ধরনের জুতো,—লাল পাঞ্জাবী নাগরাই। নারীর

চরণকমলে তা পবিত্র পদশোভা, আর আমার পায়ে উঠেছে বলেই তা বর্জনীয় জুতি—এ আমি স্বীকার করতে রাজী হলাম না।

সরলা দেবী ভিতরে চলে গিয়েছিলেন। আমাকে না দেখতে পেয়ে ফিরে এলেন ব্যাপার কি দেখবার জন্য। আমি বললাম, জুতো খুলে আমি যাব না। গান্ধীজীর মন্দিরে জুতো যদি বর্জনীয় হয়, তা হলে তা সবার জন্যই হবে।

তা, জুতো খুলেই ত সবাই গেছে দেখছি, বললেন সরলা দেবী, নিজের পায়ের জুতো সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনবহিত হয়ে।

থাক, আমি বাইরেই দাঁড়াচ্ছি, আমি বললাম।

এতদূর এসে গান্ধীজীকে দেখবে না! বিস্মিত হয়ে বললেন সরলা দেবী।

কি করব, বরাতে না থাকলে হবে না। আমি বাঙালের গোঁ নিয়ে বারান্দার রেলিং এ ঝুঁকে রইলাম।

সরলা দেবী ভিতরে চলে গেলেন। একটু পরেই দেখি পর্বতের মহম্মদের নিকট আবির্ভাব। শীর্ণকায় শুভ্রহাস্য লোকটি, পরনে পা-জামা ও শার্ট, মাথায় টুপি। আমাকে এসে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, ক্যা হুয়া ভাই?

জুতো খুলে ভিতরে ঢুকতে রাজী নই বুঝিয়ে দিলেন সরলা দেবী।

আমাকে বগল-দাবা করে ভিতরে টেনে নিয়ে গিয়ে গান্ধীজী বললেন, দিল যব্ চাহ্‌তা, ত জুতি পহ্‌নকেই চলা আনা। সরলা দেবীর পায়ের দিকে তাকিয়ে হেসে যা বললেন তার অর্থ হল, নিজে জুতো না-ছেড়ে অন্যকে ছাড়তে বললে কোন দিনই কেউ কথা শুনবে না।

সপ্রতিভ হয়ে সরলা দেবী বললেন, ও, আমি জুতো ছাড়ি নি! বড় অন্যায় হয়ে গেছে! তিনি জুতো ছাড়লেন, আমিও ছাড়লাম। তারপর দুজনকে নিয়ে গান্ধীজী বারান্দায় এলেন। বললেন, strong protest against discriminatory arrangements is the spirit which must be roused in the people. Isn't it? (বিভেদসূচক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে

তীব্র প্রতিবাদের মনোভাবই জাগিয়ে তুলতে হবে লোকের মধ্যে।) বলেই আমাদের দুজনের দিকে চেয়ে হেসে ফেললেন।

গান্ধীজীর পিছন পিছন দক্ষিণের প্রশস্ত বারান্দায় এসে ঢুকলাম। ফরাসের উপর বহু গণ্যমান্য ভারিক্কিগোছের লোক বসে আছেন। একপাশে গান্ধীজী এসে বসলেন ডান হাঁটু পিছন দিকে মুড়ে অতিপরিচিত ভঙ্গীতে। আমাদেরও বসতে বললেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে এবং কি কর?

প্রমথ চৌধুরীর কথা শুনে এক মিনিট ভেবে নিয়ে গান্ধীজী আবার জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি অক্সফোর্ডে ছিলেন কিনা। তারপর বললেন, মৌলানা মোহাম্মদ আলির কাছে তিনি অক্সফোর্ডে তার সহপাঠী প্রমথ চৌধুরীর কথা শুনেছেন। মৌলানা সাহেব গল্প-প্রসঙ্গে নাকি গান্ধীজীকে বলেছেন যে, যুবক প্রমথ চৌধুরীর মত স্বচ্ছ মননশক্তি ও বিদগ্ধ বাক্‌চাতুর্য সচরাচর দেখা যায় না।

তিনি বাঙলা সাহিত্যে যুগ-প্রবর্তনের চেষ্টা করছেন এবং সার্থক বলে স্বীকৃতি লাভও করেছেন, সরলা দেবীর কাছে একথা শুনে প্রসন্ন হলেন গান্ধীজী। বললেন, রবীন্দ্রনাথ কবি এবং সাহিত্যিক হয়েও জাতীয় আন্দোলনে নানা ভাবে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করেছেন। বাঙলা দেশে স্বরাজ আন্দোলন সৃষ্টির কাজে সাহিত্যিকদের সহায়তা পাবার ভরসা তিনি রাখেন। চৌধুরী মহাশয়ের সঙ্গে সুযোগ মত তিনি যোগসূত্র স্থাপনের চেষ্টা করবেন, এমন ইচ্ছাও প্রকাশ করলেন।

সরলা দেবী বললেন, নব্যন্যায়ের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণমূলক মননশক্তি নিয়ে প্রমথ চৌধুরী উত্তেজনা-প্রধান রাজনৈতিক আন্দোলনকে তীব্র শ্লেষ করে থাকেন। তাঁর কাছে কালচার এবং মননশক্তির মূল্যই সবচেয়ে বেশী। জনসাধারণের অন্নবস্ত্রের সমস্যা অস্বীকার না করলেও সেটাকেই তিনি সমাজ-জীবনের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন বলে মানতে রাজী নন। কাজেই স্বরাজ-আন্দোলনে তাঁর প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ত দূরের কথা, লেখনীর সাহায্য কতটা পাওয়া যাবে সে বিষয়েও সন্দেহ আছে বলেই জানালেন সরলা দেবী।

গান্ধীজী হেসে প্রশ্ন করলেন, অস্পৃশ্যতা, অশিক্ষা প্রভৃতি সমাজের যে সব গ্লানি আছে সেগুলির বিরুদ্ধে কলম ধরতেও কি তিনি নারাজ?

সেগুলির বিরুদ্ধে, তাঁর কলম চলছেই, বললেন সরলা দেবী। তবে তা

কলম নয়, ছুরির মত ধারালো। প্রতিটি শব্দ প্রতিটি বাক্য কেটে কেটে বসে।

তাতেই আমার কাজের সহায়তা হচ্ছে, দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ হচ্ছে, বললেন গান্ধীজী। সবাইকেই একভাবে দেশসেবা করতে হবে এমন গোঁড়ামি আমার নেই।

একটু চুপ করে থেকে তিনি আবার সরলা দেবীকে বললেন, গত আটত্রিশ বছর ধরে যে সংগঠন জাতির রাজনৈতিক চেতনার নেতৃত্ব গ্রহণ করেছে, নতুন পরিবেশে নতুন আশা-আকাঙ্ক্ষা, উদ্দেশ্য এবং নতুন কর্মপন্থা—সব কিছু সেই সংগঠনের ভিতর দিয়ে প্রচার করলে, তাকে কেন্দ্র করেই জাতীয় সংহতি ও সংগ্রাম সার্থক হতে পারে।

সরলা দেবী বললেন, কংগ্রেস যদি আপনার মতবাদ গ্রহণ না করে?

গান্ধীজী হেসে বললেন, আমার মতবাদে যদি কিছু সত্য থাকে, জনসাধারণের মনে যদি তা কোন সাড়া জাগিয়ে থাকে, তাহলে কংগ্রেস তা গ্রহণ করবেই—এ বিশ্বাস আমার আছে। হয় ত কেউ কেউ আমার মত পছন্দ করবেন না। তাঁদের আমার মত গ্রহণ করাতে সময় লাগবে, তার জন্য আমি নিরাশ হব না।

যতদূর দেখা যাচ্ছে, বললেন সরলা দেবী, আসমুদ্রহিমাচল আপনার ডাকে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ যদি জনসাধারণের মনোভাবকে স্বীকার করে নিতে চান, তাহলে আপনার নীতি গ্রহণ করতে তাঁরা দ্বিধা করবেন না।

গান্ধীজী বললেন, নেতারা যেমন জনসাধারণকে চালিত করেন, আবার জাগ্রত জনসাধারণের মনোভাব নিয়েই তাঁদের কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে হবে। নইলে ব্যর্থতা অনিবার্য।

আরো যাঁরা উপস্থিত ছিলেন সেখানে, তাঁদের মধ্যে অনেকেই গান্ধীজীর কথায় সায় দিলেন। একজন জিজ্ঞাসা করলেন, কংগ্রেস যদি আপনার অসহযোগ নীতি গ্রহণ না করে তাহলে আপনি কি করবেন?

কি আর করব, স্বভাবসিদ্ধ হাসি হেসে বললেন গান্ধীজী, পরবর্তী অধিবেশনে যাতে গ্রহণ করে তার জন্য কাজ করে যাব। আর গ্রামে গ্রামে ঘুরে সাধারণ মানুষের মধ্যে চেতনাসৃষ্টি ও চরকা প্রচার করব।

যতদূর জেনেছি, বললেন সরলা দেবী, লালাজী, পণ্ডিতজী, বাংলার

সি. আর. দাশ ও চক্রবর্তী—এঁরা অসহযোগ আন্দোলন প্রস্তাবের বিরোধিতা করবেন।

গান্ধীজী বললেন, তাঁদের বিরোধিতা অসহযোগ-প্রসঙ্গে ততটা নয় যতটা অসহযোগের উদ্দেশ্য নিয়ে। আসবার পথে ট্রেনেই প্রস্তাবের খসড়া তৈরী করে আমি মৌলানা সৌকত আলিকে দিয়েছিলাম। আমার প্রস্তাব ছিল, খিলাফত ও পাঞ্জাবের অন্যায়ের প্রতিবাদে অসহযোগ। কিন্তু মিসেস বেসান্ত, বিজয়রাঘব আচারি, এমন কি, মতিলালজীও এর প্রতিবাদ করেছেন। বলেছেন, অসহযোগ যদি করতেই হয়, তবে বিশেষ নির্দিষ্ট একটা অন্যায়ের জন্য কেন করা হবে? স্বরাজের অভাব সব চেয়ে বড় অন্যায়। অসহযোগ যদি করতেই হয়, তা হলে তা হবে স্বরাজের দাবিতে।

কিন্তু এঁরা সকলে যদি আপনাকে সমর্থন না করেন? মন্তব্য করলেন সরলা দেবী।

গান্ধীজী বললেন, ওঁদের ইচ্ছামত স্বরাজের দাবি আমি প্রস্তাবের ভিতর যোগ করে দেব ঠিক করেছি। এখানে ওখানে কিছু শব্দ পরিবর্তন করে দিলে প্রস্তাব অনেকেরই গ্রহণীয় হবে বলে আমার বিশ্বাস। মিঃ দাশ বলেছেন, অসহযোগের প্রতি হৃদয়ের সম্পূর্ণ সম্মতি আছে, কিন্তু তাঁর বুদ্ধি বলছে, লোকে অসহযোগ গ্রহণ করতে পারবে না। তবে আলি ভাইয়েরা আমাকে সম্পূর্ণ সমর্থন করবেন।

হ্যাঁ, খিলাফতের ব্যাপারে সমগ্র মুসলমান সমাজই ত ইংরেজের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে আছে, বললেন সরলা দেবী।

উপস্থিত অন্য ভদ্রলোকদের মধ্যে একজন মন্তব্য করলেন, অসহযোগে বাস্তবিক পক্ষে মুসলমানরাই পথ দেখিয়েছে বলা যেতে পারে। ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার পর থেকে বহুদিন পর্যন্ত রাজশক্তির সঙ্গে সম্পূর্ণ অসহযোগ চালিয়েছিল তারা।

গান্ধীজী বললেন, তারা এবারকার অসহযোগ আন্দোলনেও যোগ দেবে—এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তাদের পক্ষে গ্রহণীয় হওয়ার জন্য মৌলানা আজাদের কাছ থেকে আমি 'বা-অমন' ও তর্কে 'মওয়ালাৎ' শব্দ দুটি পেয়েছি। হিন্দু মুসলমানের সম্মিলিত অসহযোগের শক্তি প্রবল হবে, তাই মুসলমান সাধারণের সহযোগিতার জন্য খিলাফত আন্দোলনকে আমি গ্রহণ করেছি। আশা করি, কংগ্রেসও গ্রহণ করবে।

অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলন গ্রহণের জন্ম স্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রিকায় আপনাকে কি তীব্র ও অভদ্র ভাষায় গালাগালি করেছে তা দেখেছেন? জিজ্ঞাসা করলেন সরলা দেবী।

অত্যন্ত শান্ত স্বরে মৃদুহাস্তে জবাব করলেন গান্ধীজী, স্বাধীনতা আন্দোলনকে কোন সাম্রাজ্যবাদী ব্যক্তিই জামাই আদর করে না। তাদের অধিকার যতই অন্যায় হোক, তা ব্যাহত হতে দেখলে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে যায়। তবে ইংরেজের ন্যায়বোধের উপর আমার গভীর শ্রদ্ধা ছিল, জালিয়ানওআলাবাগের ঘটনা এবং তারপর ইংরেজেরা যে মনোভাব দেখিয়েছে, তাতে আমার শ্রদ্ধার আসন গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেছে। সামান্য ভদ্রতার জ্ঞানটুকুও হারিয়েছে ওরা। মহৎ প্রাণ তিলক সম্বন্ধে তাঁর মৃত্যুর পরেও যে উক্তি করেছে স্টেট্‌স্‌ম্যান, তাতে ভদ্রতার চিরাচরিত সাধারণ রীতিটুকু পর্যন্ত রক্ষা করে নি।

লোকমান্যের অভাব এই অধিবেশনে বিশেষ অনুভূত হবে, মন্তব্য করলেন উপস্থিত একজন।

গান্ধীজী বললেন, আজকের দিনে তাঁর অনুপস্থিতিই সব চেয়ে দুঃখের। আমার বিশ্বাস, তিনি জীবিত থাকলে, অসহযোগ প্রস্তাবকে নিশ্চয়ই আশীর্বাদ করতেন। আর যদি বিরোধিতাও করতেন, তা থেকেও আমি অনেক শিক্ষা পেতে পারতাম। অনেক সময়ই তাঁর সঙ্গে আমার মতভেদ হয়েছে, কিন্তু তার মধ্যেও সম্পর্কের মধুরতা ফুটে উঠেছে।

অসহযোগ প্রস্তাব সম্বন্ধে আপনি তা হলে যথেষ্ট আশা রাখেন? প্রশ্ন করলেন সরলা দেবী।

কংগ্রেসকে প্রস্তাব গ্রহণ করানোই শেষ কথা নয়, আসল কাজ হবে দেশের লোককে সে আন্দোলনে নামানো, বললেন গান্ধীজী। তার জন্য আমার প্রধান হাতিয়ার চরকা, অথচ কোনমতেই চরকা সংগ্রহ করতে পারছি না। আমার দেশের চিরদিনের চরকা হারিয়ে গেছে বিলিতি কাপড়ের বন্যায়।

মাফ করবেন গান্ধীজী, বললেন সরলা দেবী, চরকাপ্রবর্তন কার্যকরী হবে, কিংবা তার কোন সার্থকতা আছে, আমার মন কিন্তু এখনো তা গ্রহণ করতে পারছে না।

চরকার দুটো দিক আছে, বললেন গান্ধীজী, বিলিতি কাপড় বর্জন করতে

পারলে ইংরেজ সবচেয়ে বিব্রত হবে। ম্যাঞ্চেস্টারের বাজার হিসেবেই ভারত সাম্রাজ্য তাদের কাছে দামী। আর দেশের লোকের স্বাবলম্বন শিক্ষার জন্য চরকাই আমার প্রধান হাতিয়ার।

সরলা দেবী উত্তর করলেন, বিলিতি বর্জনের জন্য ও জাতীয় স্বাবলম্বন প্রতিষ্ঠার জন্য দেশী কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠা বোধ হয় অধিকতর কার্যকরী হবে, অন্তত আমার তা-ই মনে হয়।

কল বসাতে হলে, গান্ধীজী বললেন, সে কলও কিনতে হবে ইংরেজের কাছ থেকে। আর কলে লাভবান হবে কারা? মুষ্টিমেয় মালিক সম্প্রদায়। দেশের গরীব সাধারণ—তিন মাসের বেশী চাষের কাজের সংস্থানও যাদের নেই—কারখানায় এসে মজুর হয়ে তাদের কোন সুরাহা হবে না। কিন্তু গ্রামে বসে চরকা কাটতে পারলে নিজের কাপড়ের সংস্থান ত হবেই, অন্ন-সংস্থানও হবে তা দিয়ে। আরও একটা কথা আছে, আন্দোলন হিসেবে চরকাকে গ্রহণ করলে, তার সংঘাত বিলিতি কাপড়কে যত সহজে ধাক্কা দেবে, খদ্দরের চাহিদা বাড়িয়ে গরীব কাটুনিদের যে ভাবে সাহায্য করবে, তাতে গণ-আন্দোলন অনেকখানি এগিয়ে যাবে বলে আমার বিশ্বাস। ভারতের আত্মাকে আবিষ্কার করতে, চিনতে ও জানতে পারবে লোকে ওই চরকার ভিতর দিয়ে। আত্মবিস্মৃতি দূর হয়ে যাবে।

সরলা দেবী অনুগত ছাত্রীর মত গভীর অভিনিবেশে কথাগুলি শুনে গেলেন, শেষ কালে বললেন, আপনার যুক্তি ভেবে দেখবার মত। সকলকেই ভাবিয়ে তুলবে এবং শেষ পর্যন্ত গ্রহণ করবে না, এমন কথাও বলতে পারছি না।

আমি খোলা ও সাদা মন নিয়ে গিয়েছিলাম, গান্ধীজীর কথাগুলো শুনে ভারতের এক নতুন মূর্তি আমার চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। রাজনৈতিক মুক্তি চরকায় আসবে কিনা, তা না বুঝতে পারলেও চরকার ঘর্ঘর সারা ভারতের গ্রামে গ্রামে মুখরিত হয়ে উঠলে তাতে যে মরা প্রাণ জেগে উঠবে এ যেন আমি স্পষ্ট অনুভব করলাম।

আরো দু-চার কথার পর সরলা দেবী উঠে এলেন। গান্ধীজী বললেন সেশনে আসবেন নিশ্চয়ই, সরে থাকার সময় এখন নয়। আমাকে দেখিয়ে বললেন, এরকম জেদ-ওয়ালা ছেলের দল যদি যোগাড় করতে পারেন, তাদের দিয়ে অনেক কাজ হবে।

গান্ধী-সন্দর্শন করে মেসে ফিরে এলাম অনেকখানি গর্ববোধ নিয়ে। গান্ধীজী আমার জেদকে তারিফ করেছেন বলে নয়, নবভারতের জাগ্রত আত্মাকে প্রত্যক্ষ করার গর্ব আমার মনকে অভিভূত করে দিয়েছে।

আপামর সাধারণ, বিশেষ করে, কলকাতার হিন্দুস্থানী সমাজ তখন "গান্ধী মহারাজ কি জয়" ধ্বনিতে মুখরিত। কিন্তু মধ্যবিত্ত বুদ্ধিপন্থী বাঙালী সমাজ গান্ধী ও তাঁর কর্মপন্থা, ইংরেজ-বাঙালী সম্পর্ক, মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কার, তা গ্রহণ করার যৌক্তিকতা ও অযৌক্তিকতা—এই সব চুল চেরা বিচার-বিতর্কে বৈঠকখানায় সিগারেটের ধোঁয়ার ঘনঘটা ও চায়ের কাপের তুফান তুলছে।

আমি যে গান্ধী দর্শন করে এসেছি একথা প্রকাশ করতে একটুও বিলম্ব করলাম না। হরেকেষ্ট মন্তব্য করলে, 'সুরেন বাঁড়ুজ্যে রসাতলে গেল, এখন গান্ধী হল নেতা!'

সন্ধ্যার পর গোলদীঘির আড্ডা সরগরম হয়ে উঠল। দুদিন আগে মুসলমানরা যখন কচুকাটা করছিল, বললে মনিশঙ্কর বাগচী, তখন ইংরেজের পুলিশ ও গোরা-পল্টনই আমাদের বাঁচিয়েছিল। আর সেই মুসলমানদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে দুশমনি করতে হবে, নেমকহারাম আর কাকে বলে!

প্রিয়লাল বললে, একটা কথা বুঝতে পারি না ভাই, তোমাদের গান্ধীর। তুর্কীর খলিফা থাকল, কি, না থাকল, তাতে কি গেল এল আমাদের, যে, তার জন্য মুসলমানদের লড়াইয়ে আমরা যোগ দেবো!

নরেন রায় আইনের ছাত্র, সে বললে, ঝগড়া করব বললেই ত ঝগড়া করা হয় না। ইংরেজ আমাদের শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতি সব কিছু দিয়েছে—একথা অস্বীকার করে লাভ নেই। আজ স্বায়ত্তশাসন দেবারও প্রস্তাব করছে মণ্ট-ফোর্ড রিপোর্টে। সুরেন বাঁড়ুজ্যে ও শ্রীনিবাস শাস্ত্রীর মত নেতাও ঘোষণা করেছেন যে, এই সংস্কারকে কাজে লাগিয়েই

আমাদের জাতীয় উন্নতি সম্ভব। অমৃতসরে কংগ্রেসও সেই কথাই বলেছে। আর আজ সব কিছু ছেড়ে গান্ধীর কথা শুনতে হবে—স্বরাজ চাই! ওরে বাপু, স্বরাজ কি, তাই ত তিনি বোঝাতে পারলেন না। ইংরেজকে তাড়ালেও আমাদের চলবে না। এক থাবায় আর কেউ কেড়ে নেবে ভারতবর্ষ। স্বাধীন থাকার যোগ্যতা আছে আমাদের?

কিন্তু জালিয়ানওআলাবাগে যে কাণ্ড করেছে ইংরেজ—

আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললে মণিশঙ্কর, তার জন্য দায়ী পাঞ্জাবীদের গোঁয়ার্তুমি। খুশী হয়েই ওরা আমাদের খানিকটা স্বায়ত্ত-শাসন দিচ্ছে, তারই সাহায্যে আমরা আরো কিছু পাওয়ার পথ প্রশস্ত করতে পারি। আরে বাবা, অর্ধেক দুনিয়া ইংরেজের, আমরা ঢাল-তলোয়ারহীন নিধিরাম সর্দারের দল গান্ধীর কথায় নাচানাচি করলে চলবে কেন?

ত্যাখো, ইংরেজ আমাদের কতখানি সভ্য করেছে তার হিসেবের দরকার নেই, বললে হরিশ সরকার, good government is no substitute for self-government. দেশ স্বাধীন হোক, এই স্বপ্ন দেখে ক্ষুদিরাম প্রফুল্ল চাকী থেকে অনেক শহীদ প্রাণ দিয়েছে। আজ মণ্টেগু সাহেবের দেওয়া মাকাল ফল দেখে আমরা ভুলে যাব—এ কোন কাজের কথা নয়।

ভুলে ত যাবে না, বললে নরেন, কিন্তু লড়াইটা হবে কি করে, বলতে পার? চরকা নিয়ে? আরে ছোঃ! ওসব খোট্টাই বুদ্ধিতে জাহান্নামে যাবে। যুদ্ধের বাজারে বাঘা যতীনের দল তবু একটা কার্যকরী পন্থা নিয়েছিল। এখন 'গান্ধী মহারাজ' বলে নাচানাচি করে আমরা শুধু দুনিয়ার কাছে হাস্যাস্পদই হব, আর কিছু হবে না।

দেখা যাক গান্ধীর দৌড় কতদূর, বললে হরেকেষ্ট, কংগ্রেসে ত সবাই থাকবেন, সি. আর. দাশ, ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, বিপিন পাল। বাঙলার নেতারাই ত অমৃতসরে মণ্টেগু সংস্কার গ্রহণের বিরুদ্ধে মত দিয়েছিলেন।

আর গান্ধী দিয়েছিলেন গ্রহণের পক্ষে, বললে প্রিয়লাল, আজ গান্ধী মত বদলালেও বাঙলার নেতারা এত শীগগির ডিগবাজী খাবেন না।

কিন্তু পথ ত তাদের কিছু নেই, মণিশঙ্কর টিপ্পনি কাটল, ছোট্ট

ছেলের মত অভিমান ভরে মুখ বেঁকিয়ে নেব না বললেই বড় মোয়াটা হাতে তুলে দেবে না।

অতএব লক্ষ্মী ছেলের মতন যা পাচ্ছ তাই হাসিমুখে তুলে নিয়ে সোনামুখে খাও! কণ্ঠস্বরে বললে হরিশ সরকার। ইংরেজ কোলে বসিয়ে আদর করবে! পরাধীন জাতির মধ্যে চেতনা সঞ্চার সবচেয়ে আগে প্রয়োজন, স্বাধীনতার পথ পরে খুঁজে নেওয়া যাবে।

বলিহারি তোমার বুদ্ধি, বললে বাগচী, কি ভাবে স্বাধীন হবে, স্বাধীন হয়ে সে স্বাধীনতা কি করে রক্ষা করবে তার কোন হদিস নেই, আগে থেকেই ইংরেজকে চটিয়ে বসে থাক। তারা যে কি করতে পারে তার নমুনা ত পাঞ্জাবে দেখেছ। নেতাদের নাচানিতে সাধারণ লোকের জান-প্রাণ নাজেহাল হল, নেতাদের কি, তারা বাহবা কুড়িয়েই খালাস।

নরেন বললে, স্বরাজ এমনি আসে না। ম্যাড়াকান্ত জাত, স্বাস্থ্য নেই, শিক্ষা নেই, চরিত্রবল নেই, তাদের হবে স্বরাজ! একটা কথা এরা ভুলে যায়, First deserve then desire.

স্বরাজ কি, কোন্ পথে আসবে, সংস্কার গ্রহণে কি সুবিধা হবে আমাদের এসব বিচার আমি কোনদিন করিনি। তবু, আমি দেখে এসেছি গান্ধীজীর চোখের স্বপ্ন, তাঁর প্রতিটি কথায় পেয়েছি অনমনীয় দৃঢ়তা। একান্ত বুদ্ধিজীবী পরিবেশে বাস করেও বন্ধুদের এই অর্থহীন নেতিবাদ আমার মনকে ক্লিষ্ট করে তুলল। আমি উঠে পড়লাম। হরেকেষ্ট জিজ্ঞাসা করল, চলে যাচ্ছ যে? আমি জবাব করলাম, দেশের ভাল-মন্দের ভার তোমাদের উপর রইল; যা সিদ্ধান্ত কর, নেতাদের জানিয়ে দিও। তাঁদের কর্মপন্থা নির্ধারণে সহায়তা হবে।

ওয়েলিংটন স্কোয়ারে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন। ভিতরে প্রবেশের ব্যবস্থা সীমাবদ্ধ, মাইকের যুগ তখনও আসে নি, তাই আশপাশে ঘোরাঘুরি করেও বক্তৃতা শুনবার সুযোগ তখন ছিল না। তবু সমগ্র

পরিবেশের গাম্ভীর্য এবং অধিবেশনের গুরুত্ব প্রচুর জনতা আকর্ষণ করেছিল বাইরে।

সরলা দেবীর অনুরোধ এবং আমন্ত্রণ সত্ত্বেও চৌধুরী মহাশয় কংগ্রেসের অধিবেশনে যান নি। কিন্তু কংগ্রেস ও গান্ধীজী সম্বন্ধে অপরিসীম আগ্রহে তিনি সরলা দেবীকে ডেকে কংগ্রেসের গল্প শুনেছেন। আমিও কংগ্রেসের মণ্ডপের ভিতর ঢুকবার চেষ্টা করিনি। সরলা দেবীকে ধরে বা ভলান্টিয়ার হয়ে ভিতরে যেতে পারতাম না, তা নয়। সারাটা জীবন উপগ্রহবৃত্তি করেই কেটেছে, এ কথাও সত্য। তবু তল্পিবাহক হয়ে কংগ্রেস দেখতে ঢোকা আমার মোটেই মনে ধরে নি। সেই জন্যই, আমিও চৌধুরী মহাশয়ের বৈঠকে সরলা দেবীর রিপোর্ট শুনতে হাজির হয়েছি।

বিস্তৃত, গম্ভীর ও তুমুল বিতর্কের পর অসহযোগ প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। প্রস্তাব উত্থাপন করে গান্ধীজী যে বক্তৃতা করেছিলেন, এমন মনে প্রাণে রোমাঞ্চ সৃষ্টি করা বক্তৃতা আর কখনও শোনেন নি, মহা উচ্ছ্বাসে এই কথা ঘোষণা করলেন সরলা দেবী। বললেন, লোককে উত্তেজিত করার চেষ্টা নেই, বক্তার বাক্‌চাতুরী নেই, নেই স্বরের ওঠানামা, হাত নাড়া, কিংবা দেহ সঞ্চালন। অনায়াসগতিতে প্রাণের ভিতর থেকে কথা বেরিয়ে আসছে। সেই নিরাভরণ বাক্‌স্রোতে সমস্ত প্রগল্‌ভতা ধুয়ে মুছে শুচি-শুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে—বক্তা, শ্রোতা ও সকলের অন্তর। বক্তৃতা শেষ হওয়ার পর যে জয়ধ্বনি উঠল সমগ্র ভারতের মাটি কাঁপিয়ে, তার রেশ সাত সমুদ্রের ওপারে গিয়ে পৌঁছয়নি এমন কথা জোর করে বলা যায় না।

নেতাদের মধ্যে কেউ কেউ অসহযোগকে পুরোপুরি মেনে নিতে তখনও 'কিন্তু' করছিলেন, কিন্তু সাধারণ জীবনে কত হাজার হাজার লোকের জীবনের মোড় ঘুরে গেল সেদিন। অতীতের সব খেয়াল ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে অতি সহজ মনেই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কত লোককে দেখেছি যৌবনের রঙীন্ স্বপ্ন হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে তারা নেমে পড়েছে পথে—একমাত্র গান্ধীজী কি জয় সম্বল করে।

একথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে, গান্ধীজীর সামনে উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্য সত্ত্বেও মনের কোণে ছোট্ট একটু অহমিকা আমাকে প্রত্যক্ষ আন্দোলনে নামতে বাধা দিয়েছিল। কিন্তু নিষ্ঠাবান গান্ধীবাদী

যাঁরা জীবনের প্রচুর সম্ভাবনা বিসর্জন দিয়ে গান্ধীজীর আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন, তাঁদের সামনে দাঁড়িয়ে সেদিন নিজেকে বড় ছোট মনে হয়েছে। তাঁদের মনের ও চোখের স্বপ্ন আবেশের মধ্যে যে বিরাট সমুদ্রের কলকল্লোল শুনেছি তাতে ক্ষুদ্র স্বার্থের পঙ্কল পঙ্কে আবদ্ধ নিজেকে মাঝে মাঝে হতভাগ্যই মনে হয়েছে।

জলধরদার আড্ডায় একাধিকবার ফণী পাল তাঁর 'যমুনা' কার্যালয়ে আসবার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

এই ত ঘরের কাছে, বিকেল পাঁচটা নাগাদ চলে আসুন। অনেকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হবে।

অনেকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ের উৎসাহের চেয়েও 'যমুনা' কার্যালয়ে ঘনিষ্ঠ হবার শখ আমার বেশী, যে 'যমুনা' সর্বপ্রথম ব্যাপকভাবে শরৎ-সাহিত্য পরিবেশন করেছে, অনিলা দেবীর ছদ্মনামে লিখিত 'নারীর মূল্য' থেকে শুরু করে 'চরিত্রহীন' পর্যন্ত 'যমুনা'তেই পড়েছি। গল্পকার হেমেন্দ্রকুমার রায়ের সম্যক পরিচয়ও 'যমুনা'র মারফতেই পেয়েছি। কাজেই প্রগতিশীল সাহিত্য-পত্রিকা হিসেবে 'যমুনা' সম্পর্কে বরাবরই আগ্রহ বোধ করেছি।

একদিন এমনি বিকেল বেলা ত্রিশ নম্বর কর্ণওআলিশ স্ট্রীটে ভোলা-নাথ লাইব্রেরীতে 'যমুনা' কার্যালয়ের সন্ধান করলাম। কাউন্টারের বাইরে চেয়ারে বসেছিলেন এক দীর্ঘকায় গৌরবর্ণ তরুণ। আমার প্রশ্নের তিনিই জবাব দিলেন—হঁ্যা, 'যমুনা' কার্যালয় এটাই। এখনি আসবেন ফণীবাবু। সময় হয়ে গেছে। বসুন না এসে।

ভিতরে ঢুকে বসলাম। একটুকাল চুপচাপ বসে থাকার পর তরুণই কথা পাড়লেন, ফণীবাবুর সঙ্গে আপনার ব্যক্তিগত প্রয়োজন?

বললাম, প্রয়োজন কিছু নেই। সাহিত্য ও সাময়িক পত্রের আড্ডার প্রতি আমার সহজাত আকর্ষণেই এসেছি; অবশ্য ফণীবাবুর আহ্বান আছে।

কিছু মনে করবেন না, বললে যুবক, আপনার পরিচয় জানতে পারলে খুশী হব।

দেবার মত পরিচয় আমার কিছু নেই, আমি জবাবে বললাম। সাহিত্যিকদের চারপাশে উপগ্রহের মত ঘুরে বেড়াই।

উপগ্রহের ত তবু একটু ধার করা রোশনাই থাকে, আমার ত তাও নেই, মন্তব্য করলে যুবক। আমার দৌড় এই পর্যন্ত।

এমন সময় তালতলার চটিপায়ে অর্ধদগ্ধ বর্মা চুরুট হাতে, ফণীবাবু এসে হাজির। দরজায় পা দিয়েই বললেন, আরে পবিত্রবাবু যে! কতক্ষণ?

সেই তরুণ ভদ্রলোক বললেন, উনি ত 'যমুনা' আপিস খুঁজে না পেয়ে চলেই যাচ্ছিলেন, আমিই বসিয়ে রেখেছি আপনি আসছেন এই আশ্বাস দিয়ে।

তা আপনি হলেন, দেবেনবাবু, পুরাতন পাপী, বললেন ফণীবাবু, আপনি নতুন শিকার গাঁথবেন না ত গাঁথবে কে!

আমি বললাম, শিকার হিসেবে আমি কতটুকু লোভনীয় জানি না, তবে আমাকে গাঁথবার জন্যে অন্য টোপের দরকার ছিল না। আসবার জন্য আমি তৈরী হয়েই ছিলাম, আপনার মুখের কথার শুধু অপেক্ষা ছিল। আর তা ছাড়া, 'যমুনা'র সঙ্গে সম্পর্ক আমার বহু দিনের, অবশ্য পাঠক হিসেব।

সব পাঠকই যদি সেই সম্পর্ক নিয়ে এখানে এসে জমায়েত হত, তা হলে ত আপিস তুলে নিয়ে যেতে হত গড়ের মাঠে, বললেন দেবেন-বাবু।

এটি আপনার ঠিক কথা হল না ভাই, বললেন ফণীবাবু, আপনি যে অধিকারে আমাদের একজন, পবিত্রবাবুরও অধিকার তার চেয়ে কম নয়। তিনি সাহিত্য-জগতের একনম্বর হাইফেন। শিবপুরে আর বালিগঞ্জে তিনি যোগসূত্র স্থাপন করেছেন! আর শিবপুরকে বাদ দিয়ে আজকের বাঙলা সাহিত্য অচল।

কিন্তু 'যমুনা'কে ত ছেড়েছেন শরৎবাবু, বললেন দেবেনবাবু।

ফণীবাবু মন্তব্য করলেন, প্রত্যেকটা মিলনেরই একটা উদ্দেশ্য থাকে। শরৎ-যমুনা মিলনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। এখন যদি মথুরার রাজ-সিংহাসনের আহ্বান পেয়ে তিনি ব্রজধাম ত্যাগ করে থাকেন, তাতে ব্রজবাসীরা মর্মান্তিক বেদনা পেলেও অভিযোগ করার কিছু নেই।

কিন্তু শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয়তার ভিত্‌ যমুনাই পাকা করে দিয়েছে—একথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না, বললেন দেবেন মিত্র।

তা বলে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের অর্থ-সামর্থ্যের কাছে 'যমুনা' পেরে উঠবে কেমন করে? একটু ক্ষোভের সুরেই ফণীবাবু বললেন, 'ভারতবর্ষ' তাঁকে কিনে নিয়ে গিয়েছে, 'যমুনা' সে মূল্য দিতে পারে না, তার জন্যে ক্ষোভ করার কি অধিকার আছে তার?

শরৎদাকে আপনি ভুল বুঝবেন না, ফণীবাবু, আমি বললাম, অভিমান আপনার অযৌক্তিক নয়, কিন্তু চাকরি ছেড়ে তিনি বাঙলা দেশে এসেছেন লেখাকে সম্বল করে। বাঁচবার প্রয়োজনেই তাঁকে নিজেকে বিক্রী করতে হয়েছে। অবশ্য অনেক দুস্থ লেখকের মতই তাঁর বিবেক এবং কলমের স্বাধীনতা বিক্রী হয়নি।

অভিমান আমি এতটুকুও করিনি, ফণীবাবু জবাব করলেন। শরৎবাবুর লেখা ছাপাবার অধিকার না থাকলেও 'যমুনা' তাঁকে তাদেরই একজন বলে ভাবে।

ব্যক্তিগতভাবে আপনার দুঃসাহসের দুশো তারিফ শরৎদার মুখে একাধিকবার শুনেছি, আমি বললাম। যে চরিত্রহীন সুরেশ সমাজপতির মত সাহিত্য সমাজপতি প্রকাশ করতে সাহস পাননি, লেখকের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেও, সেই চরিত্রহীন 'যমুনা'র পৃষ্ঠায় স্থান পেয়েই সমাজে ও সাহিত্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল।

এমন সময় ফিনফিনে আদ্দির জামা ও পেটেণ্ট পাম্পসু পরে একটি প্রিয়দর্শনবাবু এসে ঢুকলেন, সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠলেন ফণীবাবু, আরে এসো এসো ধীরেন। পবিত্রবাবু এসেছেন 'যমুনা'র সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হতে। তিনি ত আর জানেন না যে, 'যমুনা' মানেই আজকে তুমি। আমি ফণী পাল শুধু সম্পাদক। তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, 'যমুনা'কে চিনতে হয় ত এই কবি-নাট্যকার ধীরেন মুখুজ্যেকে চিনে রাখুন। ওঁর কর্মশক্তি না থাকলে 'যমুনা' এতদিনে ক্ষীণতোয়া হয়ে যেত, ত্রিবেনীর যমুনার মত মজে গেলেও বিস্মিত হওয়ার কিছু ছিল না।

আপনার সঙ্গে এই-প্রথম পরিচয়, বললেন ধীরেনবাবু, তাই তর্কের প্রয়াস পাব না। কিন্তু জানেন, ফণীদাকে আমি একথাটা কিছুতেই

বুঝিয়ে উঠতে পারছি না যে, 'যমুনা' চলছে নিজের প্রাণের বেগে, বহু কবি সাহিত্যিকের দানে 'যমুনা' আজ পুষ্ট, উচ্ছ্বসিত। আমাদের কাজ খালি লক্ষ্য রাখা, কোথাও চড়া না পড়ে। আজ 'যমুনা'র যে সব অখ্যাত সাহিত্যিকের রচনা প্রকাশিত হচ্ছে তাঁরাই একদিন সাহিত্য-রথী হবেন না, একথা কেন বলব?

ইয়েস, দাস্ স্পোকেথ্ জেরাথুস্ত্র, মন্তব্য প্রকাশ করে ঘরে এসে ঢুকলেন আমার প্রায় সমবয়সী এক যুবক, তাঁর গায়ে চাদর, হাতের ছড়িতে একটা প্রবীণত্বের ভাব পরিস্ফুট।

চরম লক্ষ্য স্থির করে নেবার সময় এসে গেছে, মহত্তম আশার বীজ বপন করতে হবে—এই জেরাথুস্ত্রের মত। বলতে বলতে তিনি আসন গ্রহণ করলেন। হাতের সিগারেটটায় একটা টান দিয়ে বলে চললেন, কিন্তু আমার মত যারা অতীতকে গ্রহণ করতে পারছে না, পুরোনো ভগবান যাদের মরে গেছে, নতুন ভগবানও ম্যাঞ্জার আলো করে আবির্ভূত হন নি, তারা কি করবে বলতে পারেন ফণীবাবু?

মারা গেছেন খৃষ্টানদের ভগবান, বললেন ফণীবাবু। মানুষের দুঃখে ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে প্রাণ দিয়েছেন, আমাদের ভগবান অজ এবং অব্যয়।

আমার ভগবান, সত্যেন্দ্রনাথ বললেন, মরেছে দুঃখে নয়, মানুষের মূর্খতা দেখে—হাসতে হাসতে।

এটাও কি সতুদা, জেরাথুস্ত্রের মত? জিজ্ঞাসা করলেন ধীরেনবাবু।

হ্যাঁ, মাথা নেড়ে সত্যেনবাবু বললেন, হ্যাঁ, তবে সে বাণী তিনি স্বপ্নে নীৎশের মারফৎ পাঠিয়ে দিয়েছেন আমাদের কাছে। কিন্তু তোমরা ত তা মানবে না, তোমাদের পুরোনো দেবতারা ত অটুট আছেনই, তার উপর নতুন দেবতাকে আসনে ওঠাতে একটুও সময় লাগে না।

আপনার বক্তব্যের আর একটু স্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রয়োজন সত্যেনবাবু, বললেন ফণী পাল।

ব্যাখ্যা করার কিছু নেই, বলে চললেন সত্যেন্দ্রনাথ, আপনারা দুঃখে মরে যাচ্ছেন, আপনাদের নতুন সাহিত্য-দেবতা 'যমুনা' ছেড়ে অন্য মন্দিরে ঘাঁটি করেছেন। কিন্তু আমি তাঁকে দেবতা বলে মানতে পারি নি। অন্তত তাঁর 'চরিত্রহীন' যে সত্যিই চরিত্রহীনের মেলা, একথা আমি জোর গলায়ই বলব। সমাজ বিরোধিতা করবে, কিন্তু তার জন্য

যে মেরুদণ্ডের জোর চাই, তা নেই কারুর। সাবিত্রীকে যতই সার্টিফিকেট দেওয়া হোক, সে যে কোন মতেই সতী নয়, আর কিরণময়ী যে বিনোদিনীর বটতলা সংস্করণ, একথা আমি জোর গলায়ই বলব।

ফণীবাবু বললেন, শরৎবাবুর একজন অন্তরঙ্গ অনুচর এখানে উপস্থিত, বলে আমার দিকে দৃষ্টি ফেরালেন, তারপর সত্যেনবাবুর জিজ্ঞাসু দৃষ্টির জবাবে বললেন, ইনি পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়।

সিগারেটটা নামিয়ে রেখে ছড়িশুদ্ধ দু-হাত তুলে নমস্কার করে সত্যেনবাবু বললেন, দেখুন, দেবতা মেনে চলা আমার স্বভাব নয়। শরৎবাবু শক্তিশালী লেখক, হয়ত একদিন তাঁর কাছ থেকে বাঙলা সাহিত্য অনেক কিছু পাবে, কিন্তু তাই বলে তাঁকে দেবত্বের পর্যায়ে তুলে পরম ভক্তের মত নীরবে তাঁর আশীর্বাদ এবং অভিশাপ বিনীত মস্তকে হজম করতে হবে—এ আমি স্বীকার করি না। যাই হোক, আপনার সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রটাই বরং ঝালিয়ে নেওয়া যাক।

ফণীবাবুর এতক্ষণে খেয়াল হল, বললেন, ও এঁদের কারুর সঙ্গেই ত পবিত্রবাবুর পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়নি। ইনি সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, হিন্দুস্থান ইনস্যুরেন্সের কর্মচারী এবং 'যমুনা'র অন্যতম লেখক। ইনি ধীরেন মুখার্জী, আর উনি দেবেন মিত্র—বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, আর পবিত্রবাবু 'সবুজ পত্র'-এর সহকারী হয়েও পাংক্তেয় অপাংক্তেয় সকল সাহিত্যিক গোষ্ঠীতেই সমানভাবে ঘনিষ্ঠতা করে থাকেন। এমন কি ইনি সাহিত্য পরিষদেরও অন্যতম কর্মী।

আমার দিকে চেয়ে সত্যেনবাবু বললেন, আপনাকে তাহলে কোন্ পর্যায়ে ফেলা যায়? সাহিত্যের বাহ্য আবরণ যদি থাকে, তা হলেই আপনি তাদের দলে ভিড়তে রাজী আছেন, তাই কি?

যাঁরা নিষ্ঠা নিয়ে সাহিত্যের সাধনা করেন, আমি তাঁদেরই দলে। মানুষের প্রতি যাঁদের দরদ, তাঁদের সাহিত্য সৃষ্টিকেই আমি শ্রদ্ধা করি।

দরদ! ব্যঙ্গের সুরে বললেন সত্যেন্দ্রনাথ, সে ত এক মনোবিলাস, মানুষকে পঙ্গু করে দেয় শুধু। যাদের বুদ্ধিহীনতা, ক্লীবতা, পাপ-প্রবণতা ব্যাধি ও পঙ্গুতা কোন দিন কোন মতে দূর হওয়ার নয়, তার প্রতি অকারণ করুণার অপচয়—তাকেই আপনারা বলেন দরদ। এই দরদের অজুহাতেই অন্যের জীবনে অনাহূত ও অভদ্রভাবে আপনারা অনধিকার

প্রবেশ করতে চান। একজন রুগ্ন লোককে দেখতে যাওয়াতে যে নিজের সুস্থতার জন্ম আত্মপরিতুষ্টিই বিকৃত রূপ নিয়ে দেখা দেয়—সে কথা দরদ বিলাসীরা কোনদিন উপলব্ধি করেন কি? Live dangerously, বলেছিলেন নিৎশের জেরাথুস্ত্র, Erect your cities beside Vesuvius. Send out your ships to unexplored seas. Live in a state of war—এই বাণীই মানুষকে সচল ও সজীব রাখতে পারে। দরদ দিয়ে আর যাই হোক, গড্ডালিকা জীবনপ্রবাহে প্রাণবন্যা সৃষ্টি করা যায় না।

তা হলে আপনার মতে সাহিত্যিকদের কর্তব্য কি? জিজ্ঞাসা করলেন দেবেনবাবু।

মানুষকে মহত্বে ও বীরত্বে উদ্বুদ্ধ করতে না পারলে সে সাহিত্যের কি মূল্য আছে? প্রশ্ন করে সত্যেনবাবু বলে চলেলন, মতবাদ প্রচারের স্পর্ধা আমি রাখি না, কিন্তু আমার নিজের বিশ্বাস দৃঢ়। জাতির জীবনে যখন ঘুণ ধরে, থেমে যায় প্রাণস্রোত, তখনই সেখানে শুরু হয় দর্শন ন্যায় ও তত্ত্বের চুলচেরা বিচার। প্রাণবন্ত-জাতি মহাকাব্য রচনা করে।

জাতির জীবনে যদি সত্যি সত্যি ঘুণ ধরেই থাকে, আমি বললাম, অপ্রত্যাশিতভাবে আবির্ভূত হয়ে কোন মহাকবি মহাকাব্য প্রচার করলেও সে শক্তির অপচয় হবে। জাতির জীবনের বাস্তবকে স্বীকার না করে সাহিত্যিক পণ্ডশ্রম করবে কেন?

সত্যেনবাবু জবাব করলেন, জীবনের বিরাট সম্ভাবনা সাহিত্যিককে প্রকাশ করতেই হয়। গ্রীক জাতির জীবনস্রোত যখন থেমে গিয়েছিল, অ্যারিস্টট্ল্ সাবধানী মধ্যপন্থার জয়গান গেয়েছিলেন। বর্তমানের মধ্যবিত্ত যুগে সাবধানে ও সবিনয়ে মধ্যপথ অবলম্বন করে নিরাপদে দিন গুজরান করা পরম ধর্মে পরিণত হয়েছে। জীবনের অতিশয়তা মানুষ ত ভুলেছেই, সাহিত্যিকেরাও তাদের ভোলবার ব্রত গ্রহণ করেছে।

এটা হয় ত সভ্যতারই অভিশাপ, আমি বললাম, বিচারশক্তি যত বিকশিত হয়, ততই বন্য প্রাণস্রোত থিতিয়ে আসতে থাকে।

সত্যিকার কবি যাঁরা তাঁরা সূক্ষ্মতম বিচারশক্তি প্রচার করেও জৈব-জীবনের জয়গান করেছেন:

'পরিতাপ জর্জর পরানে
বৃথা ক্ষোভে নাহি চায় অতীতের পানে

ভবিষ্যৎ নাহি হেরে মিথ্যা দুরাশায়,
বর্তমান তরঙ্গের চূড়ায় চূড়ায়
নৃত্য করে চলে যায় আবেগে উল্লসি—
উচ্ছৃঙ্খল সে জীবন সেও ভালবাসি।'

রবীন্দ্রনাথের কথা ছেড়ে দিন, বললেন ফণীবাবু, তিনি ত নীৎশে-শেক্সপীয়ার-গ্যেটে-কালিদাস-বেদ-উপনিষদ—একাধারে সব।

তাই ত তাঁকে বলব সত্যদ্রষ্টা ঋষি, বললেন সত্যেন্দ্রনাথ।

আমি বললাম, যে প্রাক-সভ্যতা যুগের বন্য মানুষ সভ্য মানুষের মনের নিচে নিজেকে গোপন রেখেছে, সে হঠাৎ কখনো মাথা উঁচু করে বলতে পারে:

'অরুগ্ন বলিষ্ঠ হিংস্র নগ্ন বর্বরতা—
নাহি কোন ধর্মাধর্ম নাহি কোন প্রথা,
নাহি কোন বাধাবন্ধ;'

কিন্তু যে-কোন সমাজের পক্ষে তা অসহনীয় মানসিক বিলাস। রবীন্দ্রনাথের মুখে চমৎকার শোনায়, কিন্তু সাধারণ লোকের জীবনে তাই হয়ে দাঁড়ায় ফাঁসির যোগ্য অপরাধ।

সত্যেনবাবু উষ্মাভরে বলে উঠলেন, আপনাদের সাহিত্যসম্রাট-চিত্রিত চরিত্রগুলিরও বাধাবন্ধ নেই। শুধু অরুগ্ন বলিষ্ঠতারই যা অভাব। তার বদলে তাদের চরিত্রে আছে রুগ্ন ক্লিন্ন দুর্বলতা।

হ্যাঁ, 'চরিত্রহীন'-এর উপর আপনি খড়্গহস্ত, সে খবর আমি জানি, আমি বললাম, কিন্তু একথা বলতে আমি বাধ্য যে, আপনি আগে থেকেই বিদ্বেষ নিয়ে বইখানি পড়েছেন, তাই সাবিত্রী ও কিরণময়ীর চরিত্রের ভাল দিকটা আপনার চোখে পড়েনি।

ভাল দিক আবার কি? রুখে উঠলেন সত্যেন্দ্রনাথ, মেসের ঝি সাবিত্রী মনে মনে বহুর প্রতি আকর্ষণ পুষে রাখলেও, আর বাবুদের সঙ্গে ফষ্টি নষ্টি করলেও তিনি যখন নিরামিষ্যি স্বপাক খান আর নিয়মমত ব্রত-পার্বণ করেন, তখন তিনি সতী। সতীত্বের এই মার্কা যার কাছ থেকেই আসুক না কেন, তা কোন মতেই গ্রহণযোগ্য নয়।

এ বিষয়ে আমার একটা বক্তব্য আছে, সত্যেনবাবু, বললেন ফণী পাল। বাঙালীর মেয়ে আচার ও সংস্কার থেকে সহজে মুক্ত হতে পারে না, তা

বলে তার মন শাস্ত্রের বাঁধা অনুশাসন মেনে চলতে গিয়ে যদি কখনো একটু এদিক ওদিক হয়ে যায়, তা হলেই সে অসতী—এ জুলুমই-বা কত দিন সহ্য করা হবে!

ধীরেন মুখুজ্যে মন্তব্য করলেন, শাস্ত্র ও লোকাচারের জুলুম মেয়েদের মনকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছে। তবুও অবস্থার ফেরে পড়ে কখনো কখনো মন বেয়াড়াপনা করে এবং তারই জন্য সে ধিক্কারের যোগ্য নয়—এই কথাই শরৎচন্দ্র বলতে চেয়েছেন।

বেয়াড়াপনা করলেই তাকে নাই দিতে হবে? প্রশ্ন করলেন সত্যেন-বাবু, হয় সমাজের আদর্শ মানো, নয় তাকে ভাঙো। ডুডুও খাবো, টামুকও খাবো—এ চলবে না। তা ছাড়া কিরণময়ী! আপনাদের দরদী সাহিত্যিক ত তার জন্য কেঁদে বুক ভাসিয়েছেন, অথচ মেয়েটা আগাগোড়া নচ্ছার।

আপনার বিনোদিনীও সতী নয়, আমি বললাম, তবে সে অভিজাত রুচিবাগীশ সমাজের লোক। কিরণময়ীকে আপনি বটতলার বিনোদিনী বলেছেন। যে অবস্থায় অভিজাত উচ্চ শিক্ষিত পরিবারের লোক যা করে, সাধারণ গৃহস্থ পরিবারে মেয়ে বা বউ একই অবস্থায় একই পথ নেবে, তা ত হয় না। আর সংসারে হারান-কিরণময়ীদের সংখ্যাই বেশী।

বেশী কি-না, আমি জানি না, বললেন সত্যেন্দ্রনাথ, তবে রুগ্ন মরণোন্মুখ স্বামী যার ঘরে, সে তার বন্ধুর প্রতি প্রেম মনে পুরে ডাক্তারের সঙ্গে ছেনালী করবে, এমন সম্ভাবনা শরৎচন্দ্রের উদ্ভট কল্পনা ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না। অথচ পুরুষকে তিনি ভেড়া করে তৈরী করেন—'কাঁচপোকা যেমন করিয়া তেলাপোকাকে টানে তেমনি করিয়া' কিরণময়ী দিবাকরকে টেনে বার করল। চমৎকার বর্ণনা, হো হো করে হেসে উঠলেন সত্যেন্দ্রনাথ।

দিবাকরই 'চরিত্রহীন'-এর একমাত্র পুরুষ চরিত্র নয়, বললেন ফণীবাবু। ধীর গম্ভীর সর্বজন শ্রদ্ধেয় উপীনদা, তিনিও ভুল করেন, কিন্তু সবার ধিক্কৃত সতীশ, সে ত বলিষ্ঠতার প্রতিমূর্তি।

সেও মেসের ঝির সঙ্গে ফষ্টি নষ্টি করে, আমি বললাম, দিনে রাতে যখন খুশি সাবিত্রীর বাড়ী যায়, কিন্তু সেটা সত্যেনবাবুর চোখে লাগে নি। পুরুষ কি-না!

আরে, তার চরিত্রের মধ্যে যত দোষই থাক না কেন, বললেন সত্যেনবাবু, তার বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব তাকে সব চরিত্রহীনতা থেকে উর্ধ্বে তুলে রেখেছে।

দিবাকরকে নিয়ে যখন কিরণময়ী আরাকান পাড়ি দিয়েছিল, আমি বললাম, তখন তার মধ্যে বলিষ্ঠতা বা ব্যক্তিত্ব কম ছিল না, কিন্তু নারী বলেই তার পক্ষে সেটা ছিল অপরাধ।

একশো বার, বললেন সত্যেনবাবু, নারীর বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব যখন পাপের পথে যায়, তখন সে একা ডোবে না, আরও অনেককে সঙ্গে নিয়ে ডোবে।

এ কথাটা আপনার ঠিক হল না, সত্যেনবাবু, বললেন ফণী পাল, পুরুষের চরিত্রের বলিষ্ঠতা তাকে রাখে চরিত্রহীনতার উর্ধ্বে, আর মেয়েদের বলিষ্ঠ চরিত্র ডোবে ও ডোবায়—এ আমি কোন মতেই মানতে পারি না।

আপনি না মানলেও তা সত্যি, বললেন সত্যেনবাবু। অথরিটি কোট করা আমার নীতিবিরুদ্ধ, তবুও বলছি, ধর্মগুরু ও শাস্ত্রকাররা যে নারীকে পাপের দ্বার বলে অভিহিত করেছেন, তাঁদের অনেক মিথ্যা ও বুজরুকির মধ্যে ওই একটি সত্য ভাষণের জন্য আমি তাঁদের শ্রদ্ধা করি।

আপনাকে রীতিমত নারী-বিদ্বেষী মনে হচ্ছে, বললে ধীরেন।

হয়ত তাই। সত্যেনবাবু জবাব করলেন। কিন্তু সেই বিদ্বেষ সহজাতও নয়, গোঁয়ার্তুমিও নয়। বিচারবুদ্ধিপ্রণোদিত ও অভিজ্ঞতাপ্রসূত।

এই বয়সেই সবকিছু জেনে বুঝে একেবারে শেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছেন। বললেন ফণীবাবু। জানা এবং বোঝা ফুরিয়ে গেলে জীবনের আনন্দেই ভাঁটা পড়ে যায়।

সত্যেনবাবু জবাব করলেন, তা বলে নকল আনন্দের নেশায় চোখ বুজে থাকবো, চোখের সামনে যা দেখছি তাকে অস্বীকার করব, আমি সে দলের নই। কোন অবস্থাতেই আমি ইগনোরেন্সকে (ignorance) ব্লিস (bliss) মনে করতে পারি না।

আমি বললাম, নারী যে পাপের দ্বার—এ সত্যটি আপনি হঠাৎ আবিষ্কার করলেন কোথায়?

হঠাৎ আবিষ্কার করব কেন? হাত ও মাথা নেড়ে বললেন সত্যেনবাবু। ইতিহাসের পাতায় পাতায় তা লেখা আছে, দৈনন্দিন জীবনে ঘরে ঘরে তা ঘটছে। দুনিয়ার যত পাপ, যত অন্যায়, তার পিছনে আছে হয় নারীর

প্রত্যক্ষ উস্কানি, নয় পরোক্ষ প্রভাব। অর্থাৎ নারীর মোহে পড়ে, তারই মনস্তুষ্টির জন্য মানুষ যত পাপ করে, এত আর কোন লোভেই করে না।

এই মনোভাব নিয়ে বিবাহিত জীবনে কি সুখী হতে পারবেন? প্রশ্ন করলেন ফণীবাবু।

আরে বিবাহিত জীবনের সুখ ত নিছক কল্পনার ব্যাপার, বললেন সত্যেনবাবু। কবি বলছেন, অর্ধেক মানবী তুমি অর্ধেক কল্পনা। কল্পনা-বিলাসী আমি নই। কাজেই অর্ধেক মানবী নিয়ে আমার কোন দিনই পোষাবে না।

ইজ ইট এ ভাউ সত্যেনবাবু? আমি শুধোলাম।

ভাউ আবার কি! নাক মুখ কুঞ্চিত করে বললেন সত্যেন্দ্রনাথ, ব্যাপারটা মনে হতেই আমার গা রি রি করে ওঠে। এক-গাদা কেঁচোর মধ্যে বাস করতে পারি, কিন্তু একটা নারী অধিকার দাবি নিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকবে—অসহ্য।

আমি জবাব করলাম, সত্যেনবাবু কেন শরৎদাকে সহ্য করতে পারেন না, তা এখন জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেল। তিনি ত আপনাদের মত মহাপুরুষদের নিয়ে সাহিত্য রচনা করেন না, পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ, একটি নারীকে ঘিরে যাদের সুখ-দুঃখ আশা-কল্পনা জীবনকে রঙীন করে তোলে, তাদের নিয়ে, তাদেরই জন্য শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-সৃষ্টি।

শরৎবাবু আপনাকে পাবলিসিটি অফিসার বেছেছেন ভাল, হেসে বললেন সত্যেনবাবু।

ফণীবাবু মন্তব্য করলেন, এতে আমাদের যথেষ্ট আপত্তি আছে। শরৎ-চন্দ্রের প্রচারে আমাদের অংশটা আপনি বেমালুম অস্বীকার করলেন!

আপনারা ত শুধু প্রচার করেছেন, বললেন সত্যেনবাবু, তার পক্ষে বিরুদ্ধ দলের সঙ্গে এতখানি ওকালতি করেছেন কোন দিন? বলেই হো হো করে হেসে উঠলেন। আরও বললেন, লোকটি জুটিয়েছেন ভাল, তর্ক করে সুখ আছে ওঁর সঙ্গে। আমাকে উদ্দেশ করে বললেন, আসবেন মশাই, মাঝে মাঝে। বাঙালীর ছেলে বৃহৎ ব্যাপার নিয়ে চুল চেরা তর্কের আসর মাঝে মাঝে না জমালে ভাতই হজম হয় না।

মিরজাপুরের মেসের এক দলের সঙ্গে বাসাবদল করে আমি এসে উঠলাম সিমলা মধু রায় গলিতে। এখানেও সেই গতানুগতিক মেস-জীবন, একই পরিবেশ। যারা অফিসে চলে যায় তাদের বাড়তি একটু কিছু আমি পেয়ে থাকি : সারা দুপুর কাঁসারী পাড়ার কাঁসা পেটার খন-খনে আওয়াজ দুপুরের স্তব্ধতা ভঙ্গ করে। কিন্তু মাঝরাতে যদি কোন দিন ঘুম ভেঙে যায় তখন জাগে আর এক অপূর্ব আমেজ। নীরন্ধ্র নিস্তব্ধতা ভেদ করে সেতারের সুর-মূর্ছনা কোথা থেকে ভেসে আসে বাতাস কাঁপিয়ে।

শ্রীমানী বাজারের কোণে কর্নওয়ালিস স্ট্রীট ও তদানীন্তন বারাণসী ঘোষ স্ট্রীটের মোড়ে হঠাৎ একদিন সকালে শৈলজানন্দের সঙ্গে দেখা, দোকান থেকে বিড়ি কিনে নিয়ে কৌটায় ভরছে। আমাকে দেখেই জিজ্ঞাসা করলে, এখানে কোথায় এসেছিস? 'ভারতী'তে?

বাসা বেঁধেছি এ পাড়াতে, আমি জবাব করলাম।

কোথায়?

এই বাহান্ন নম্বর মধু রায় লেনে আমাদের মেস। চল্ না।

কৌটা থেকে একটা বিড়ি বার করে ধরাতে ধরাতে শৈলজানন্দ বললে, চল্, তোর মেসটা চিনেই আসি।

মেসটা চিনে নিতে যতক্ষণ সময় লাগে, তার বেশী বসল না শৈলজা। বললে, আমায় একটু এগিয়ে দে এবার।

আবার সেই পথে ফিরে এসে দুজনে ঢুকলাম সুকিয়া স্ট্রীটে (কৈলাস বোস স্ট্রীটে)। মদন মিত্র লেনের মোড়ে আসতেই শৈলজা বললে, চল্ একটু চা খেয়ে নি।

এখানে কোথায়? আমি প্রশ্ন করলাম।

আরে, আমাদের গৌরবাবুর এ চায়ের দোকানই হল এ তল্লাটে প্যারিসের কফিখানা। রসের মধুচক্র। বলতে বলতে শৈলজা যেখানে ঢুকে পড়েছে তা একখানি সরু ফালি ঘর। লম্বা কাঠের টেবিলের দু পাশে সরু বেঞ্চি পাতা। চার পাঁচ জন সেখানে বসে বিশ্বের সব সমস্যার সমাধান করছে। আমাদের বসতে দেখেই কোণের ছোট্ট টেবিলের সামনে থেকে ফতুয়া গায় ভদ্রলোকটি উঠে এলেন, সহাস্যে প্রশ্ন করলেন, চা দেবো ত?

চায়ের দোকানে এসে লোকে কি আর হুইস্কি চায় গৌরবাবু? জবাব করলে শৈলজানন্দ।

এখনই দিচ্ছি, এ কথার উত্তরে শৈলজা জিজ্ঞাসা করলে, কেন, ছোকরাটা গেল কোথায়?

একটু বাইরে গেছে। আমি দিচ্ছি চা।

শৈলজা বললে, আমাদের কোন রাজকাজ বয়ে যাচ্ছে না, চায়ের কাপ নিয়ে যতক্ষণ বসে থাকব, তার কিছুটা সময় না হয় চা পাওয়ার প্রত্যাশায় আগেই বসলাম। এত তাড়া কিসের, আসুক না ছোকরা।

আপনাদেরই দোকান, যা বলবেন তাই হবে, হেসে মন্তব্য করলেন গৌরবাবু।

শুধু বিনা পয়সায় চা খাওয়া যাবে না—এই যা, আমি বললাম।

তাও খাবেন, বললেন গৌরবাবু, যদি নিজের মনে করে খেতে পারেন। নিজের ব্যবসাও ত ব্যবসা, তাতে বরং মুশকিল বেশী, জানেনই ত, ময়রা সন্দেশ খেতে পায় না।

একটু ভুল করলেন গৌরবাবু, বললে শৈলজা, আমরা ব্যবসা বুদ্ধির লোক নই, একেবারে বাউণ্ডুলে। রাতের বিছানা বেচে সকালে যারা নেশা করে, সেই জাতের। আমাদের দোকান, এইটে বুঝিয়েছেন ত দোকান ফেল না পড়া পর্যন্ত আমরা মুফতে নিজেরা ত চা খেয়ে চলবই, দলবল ডেকে নিয়ে এসে কাপ্তেনি করব।

তা করবেন, শুষ্ক হাসি হেসে চুপ করলেন গৌরবাবু।

গৌরবাবু রণে ভঙ্গ দিলেন দেখছি, মন্তব্য করলে উপস্থিত যুবকদের মধ্যে একজন।

ভঙ্গ না দিয়েই বা উপায় কি ছিল, আমি বললাম।

উনি ব্যবসাদায় লোক, বললে শৈলজা, আমাদের সুখ-সুবিধাটাই ওঁর ধর্ম। কিন্তু আমরা ত আর ব্যবসাদার নই যে ওঁর সুখ-সুবিধা দেখতে যাব!

দেখি না, তাই বা বলবেন কেমন করে? বললে আর এক যুবক। এই যে এক কাপ চা খাওয়ার নাম করে তিন-চার ঘণ্টা আড্ডা সরগম রাখি, তাতে দোকানের গুডউইল কতটা বাড়ে বলুন ত!

আরে মাছ দিয়েই মাছ ধরা হয়, বললে শৈলজা, এই যে পবিত্র এল আমার সঙ্গে, ওকে ত আবার ফিরে ফিরে আসতে হবে, এটাই ত ওর আর আমার ডেরায় যাতায়াতের পথ।

আপনি বুঝি কাছাকাছি থাকেন? প্রশ্ন করলে প্রথম যুবক।

থাকি না, আপাতত আছি। আমি বললাম।

তার মানে? দ্বিতীয় যুবকের চোখে মুখে প্রশ্ন।

আমি বললাম, আপাতত আছি, কারণ মেস-বদলানো আমার যেন একটা স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তোর 'সবুজপত্র' চলছে কেমন? জিজ্ঞাসা করলে শৈলজা।

আমার 'সবুজপত্র'! জুতো মারবার আর কি বাকি রইল! তুই ত জানিস যে নিজের ইচ্ছায় নজরুলের কবিতাটাও সেখানে ছাপাতে পারি নি। 'প্রবাসী'তে গিয়ে চারুদার কাছে ধরনা দিতে হয়েছিল।

তবু চালাতে হয় ত তোকেই, বলল শৈলজা।

হ্যাঁ, ইঞ্জিনের ফায়ারম্যান যদি বলে, আমি বললাম, আমিই রেল চালাই, তা হলে তাতে কি হাস্যোদ্রেক করে না?

শৈলজা বললে, রেলগাড়ী জীবনে যারা দেখেইনি কোনদিন, তাদের কাছে ফায়ারম্যান একটা কেউ কেটা ব্যক্তি। আমি ত আজতক কোন পত্রিকায় ঘেঁষতেই পারলাম না।

তবু ত লিখছিস তুই, আমি বললাম। খাতার পর খাতা ভরে তুলছিস কবিতা লিখে। আর আমি 'সবুজপত্র'-এর লেখা আনার বেয়ারা, কম্বলের লোম বাছার ওস্তাদ।

সঙ্গগুণ যাবে কোথায় বন্ধু! রাজা-উজির মার, বড় বড় সমাজে মেলামেশা কর, কোথায় সাহিত্য-পরিষদ, কোথায় শরৎ চাটুজ্যে—সব তোমার সাকরেদ।

কি যে বলিস তুই, শরৎদা স্নেহভরে পায়ের কাছে বসতে দেন।

যুবকের দল মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছিল। দ্বিতীয় যুবক জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা, শরৎ চাটুজ্যে কোথায় থাকেন?

জেনে লাভ নেই, ভাই, বললে শৈলজা, সে বড় কঠিন ঠাঁই। বিশেষ করে হিরো-ওয়ারশিপারদের তিনি শত হস্ত দূরে রাখেন।

আমি তাঁর হিরো-ওয়ারশিপারদের দলের নই, বললেন যুবক, এক্সপেরিমেণ্টাল সাইকলজির ছাত্র আমি, শরৎবাবুর গল্প উপন্যাসে সে সাইকলজির বিকাশ আছে সে সম্বন্ধে কয়েকটা প্রশ্ন নিরসন করবার জন্য দেখা করতাম।

সে বিষয়ের কোন প্রশ্নের জবাব তিনি দিতে চান না, আমি বললাম, বলেন, যা ভাল বুঝেছি, লিখেছি, পণ্ডিতদের পাণ্ডিত্যের সঙ্গে তার বিরোধ থাকলে তাঁরা আমার লেখা আঁস্তাকুড়ে ফেলে দিতে পারেন।

প্রথম যুবক বললে, বড় তেড়িয়া মেজাজ ত!

অপর যুবক জবাব করে, আপনি ভুল করছেন অনিলবাবু, সাইকলজি ত পড়েন নি, বোধশক্তির উপর ইঙ্গিত করলে সাধারণ লোকেরই মেজাজ খচে যায়, আর শরৎবাবুর মত সাহিত্যিকের একদিকে আছে ভক্তদের জ্বালাতন, আর একদিকে আছে বিরূপ সমালোচকদের বিষোদ্গার। সব কিছু ইতিহাস দিয়ে বিচার করবেন না। রাজতক্ত নিয়ে মারামারি ছাড়াও সংসারে অনেক জিনিস আছে।

আপনি বুঝি ইতিহাসের ছাত্র? আমি প্রশ্ন করলাম অনিলকে।

সম্মতি জানিয়ে অনিল বললে, হরিপ্রসাদবাবু মনস্তত্ত্ব-বিশারদ কি-না, তাই ইতিহাসকে স্বীকার করতে চান না। জানেন ত আপনি, আমি যা করব, বলব, এঁরা তার নীচে অবচেতন মনের বিপরীত ক্রিয়া-কর্ম আবিষ্কার করবেন।

সত্যিই তো, বললে শৈলজা, ওঁদের দর্শন বলেছে যা ঘটে তা-ই সত্য নয়, যা ঘটেনি, ঘটতে পারত, সামাজিক পরিবেশের শাসনে নিরস্ত রয়েছে—তাও সত্য, হয়ত বৃহত্তর সত্য। উনি ত স্বভাবতই আপনার ঐতিহাসিক দৃষ্টির বিরোধিতা করবেন।

মানুষের মনকে, বললে হরিপ্রসাদ, চিরদিন কঠোর শাসনে রেখে এসেছে সমাজপতিদের তৈরী ন্যায়-নীতি ও শৃঙ্খলার বিধান। কিন্তু সেই বিধান মানতে বাধ্য করলেও, মানুষের মন তার সত্যকে অস্বীকার করবে কেমন করে?

দীর্ঘদিনের শিক্ষায়, অভ্যাসে ও শৃঙ্খলায়। বললে অনিল।

একথা আজ আর অস্বীকার করা যায় না, অনিলবাবু, আমি বললাম।

মাঝখানে বাধা দিয়ে শৈলজা হেঁকে উঠল, গৌরবাবু, আমাদের চা কি হল, ছোকরা ফিরেছে?

যুবকদের মধ্যে তৃতীয় একজন হেসে মন্তব্য করলে, অবচেতন মনে চায়ের আধ কাপ শেষ করেছেন, আর সামনে রাখা বাকি আধ কাপ দৃষ্টি থেকে বিলুপ্ত হয়েছে

শৈলজা হো হো করে হেসে উঠল। গৌরবাবুকে বললে, তা হলে একটু গরম লিকার ঢেলে কাপ দুটো আর একবার ভর্তি করে দিন।

আমার দিকে তাকিয়ে বললে অনিল, আপনি যেন কি বলছিলেন?

আমি বলছিলাম, বলে চললাম আমি, যে হাজার হাজার বছরের কঠোর শাসনের বিরুদ্ধে মানুষের মন যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে, অবচেতনের গুহা থেকে মাথা ঠেলে আত্মপ্রকাশ করতে চাইছে, তা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে আজকের উপন্যাসগুলিতে। হয়ত এ দেশে তার ঢেউ আসতে এখনো অনেক দেরি হবে, কিন্তু কন্টিনেণ্টাল ঔপন্যাসিকেরা আজকে মনের সত্যকে নগ্ন করে প্রকাশ করারই পক্ষপাতী। বলছেন, মনের সত্যের জন্য সমাজের কাছ থেকে স্বীকৃতি আদায় করে নিতে হবে। চিরকালের গোঁড়া রক্ষণশীল ইংরেজী সাহিত্যের মধ্যে পর্যন্ত তার ছোঁয়া লেগেছে।

তা বলে বাংলা দেশে ওই ধরনের উপন্যাস লিখলে লেখকের ধোপানাপিত বন্ধ হয়ে যাবে, হেসে বলল শৈলজা, দেখছিস না, শরৎবাবুকে কি নাকালটাই না হতে হচ্ছে।

নাকাল হওয়াটাই দেখলি তুই, আমি বললাম, স্বীকৃতিটা চোখে পড়ল না! প্রমথ চৌধুরী পর্যন্ত শরৎদাকে বই উৎসর্গ করেছেন, এর পর স্বীকৃতির আর বাকী থাকে কি? আর ধোপা-নাপিত আজ আর বন্ধ করে কে? এটা লণ্ড্রী ও সেলুনের যুগ। আয় না দু-একখানা কন্টিনেণ্টাল বিপ্লবী উপন্যাস বাংলায় অনুবাদ করি। দেখা যাক না, ফল কি হয়।

শৈলজা বললে, অনুবাদ হয়ত করতে পারবি, ছাপাতে পারবি কি? আর ছাপলেই কিনছে কে? কেউ কিনবে না বা পড়বে না, এই যা রক্ষা, নইলে মাথা কাটা যেত। আর আমায় বলছিস? আমি কিসসু পড়িনি।

এমন সময় আর একটি তরুণ এসে ঢুকল, বয়সে ওদের চেয়ে কম। হাতে একখানা খাতা, পকেট থেকে স্টেথিসকোপ উঁকি মারছে।

অনিল জিজ্ঞাসা করলে, কি হে রবি, কলেজ চলছ?

আপনাদের জাঁকালো আড্ডা দেখে ঢুকে পড়লাম, বললে রবি।

গৌরবাবুর দোকানের জাঁকালো আড্ডার টান লাগলে কলেজে আর যাওয়া হবে না, হয়ত কোনদিনই নয়, বললে শৈলজা।

এর জবাবে হরিপ্রসাদ বললে, আমরা কলেজ ছেড়েছিলাম অসহযোগ আন্দোলন করে, গান্ধীজীর ডাকে—

মুখের কথা লুফে নিল শৈলজা, অথবা আড্ডার ডাকে, তা হয়ত কোন দিন প্রমাণ হবে না।

সেই জন্যই ত আড্ডার একটা পাকাপাকি বন্দোবস্ত করছি আমরা, বললে অনিল।

আপনারা জমলে, তারপর আমরা এসে জমব, আমি বললাম।

হরিপ্রসাদ মন্তব্য করলে, সবই ত ঠিক আছে, তবে আড্ডার মাঝখানে বসবার জন্য একজন দাদা খুঁজছি খালি। কি বলিস রবি, তুই সন্ধান পেলি কারো?

শৈলজা বললে, সে সমস্যার সমাধান আমি এখনই করে দিতে পারি!

উৎসুক দৃষ্টিতে তাকাল ওরা তিনজন। শৈলজা বলে চলল, এতক্ষণে বোধ হয় কিছুটা আঁচ পেয়েছেন আমার পাশের এই নিরীহ লোকটি সম্বন্ধে। রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, শরৎ চাটুজ্যে, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সাহিত্য-পরিষদ, মায় আশু মুখুজ্যে পর্যন্ত—সর্বত্র এর অবাধ গতায়াত। এমন কি, উঠতি কবি নজরুল ইসলাম—তারও মাতব্বর উনি।

রবি বললে, তাহলে অনিলবাবু, আমার খোঁজার শেষ। এইবার লেগে যাও হরিপ্রসাদ।

ঠিক আছে, বললে হরিপ্রসাদ, তুমি আর কলেজে দেরি করে আমাদের বদনাম করো না।

বেরিয়ে যাবার উদ্যোগ করে আমার দিকে ফিরে রবি বললে, পাচ্ছি ত আপনাকে?

আমার মতামতের অপেক্ষা না রেখেই ত আপনারা সব ঠিক আছে বলে ফেললেন, এর পরেও আর আমার মতামত দেবার অবকাশ কোথায়! অবশ্য দর বাড়াবার প্রয়োজনে যদি বাহানা না করি।

রবি চলে গেল, শৈলজা বললে, তুই দরবারী লোক, একটু দর বাড়াবার চেষ্টা করা মানাত তোকে।

দর একটু বাড়ল বৈ-কি, বললাম আমি, এখানে ওখানে দু-একজনের মাতব্বরী করছি বটে, আর দরবারে যাতায়াত যেটুকু করি তাত পরিষদ হিসেবে। এঁরা আমাকে একেবারে বিক্রমাদিত্যের আসন দিচ্ছেন।

শুধু তাই নয়, বললে অনিল, নবরত্নে ঘিরিয়ে দেবো।

কবি কালিদাসটি কে হবে শুনি? বললে শৈলজা।

কেন? আপনি? বললে হরিপ্রসাদ। খাতার পর খাতা কবিতায় ভরে ফেলছেন, সে কথাও ত আমাদের কানে গিয়েছে।

বৈঠকের নাম কি হবে শুনি? শৈলজা প্রশ্ন করলে, ক্ষণজন্মা সমাবেশ? তাতে কিন্তু নিজেদের প্রতি শ্লেষ করা হয়। বললে হরিপ্রসাদ, তার চেয়ে আমরা বলি, বিপ্লবী-চক্র। গতানুগতিকতার সংস্কারকে অস্বীকার করেই চলব আমরা।

আমি বললাম, বিপ্লব-টিপ্লব বড ভারী কথা, রাজনৈতিক দলের নাম হলে মানায় ভাল। না-মানার সঙ্গে একটা বৈঠকী হালকা ভাব থাকলে নামটা ভাল হবে।

হরিপ্রসাদ বললে, নামের সমস্যা সমাধান পরে করা যাবে। আপাতত আপনার মেসের ঠিকানাটা দিয়ে রাখুন।

প্রায় হালকা মেঘের মত ভেসে বেড়াতে বেড়াতে ঢুকে পড়লাম কান্তি ঘোষের বাড়ীতে। ওমর-খৈয়াম-এর কবি কান্তি ঘোষ তখন রীতিমত প্রখ্যাত ব্যক্তি। ব্যবহারের ও পরিবেশের স্বাভাবিক পারিপাট্য নিয়েই তিনি আমাকে অভ্যর্থনা করলেন। নানা আলোচনার মধ্যে প্রস্তাব করলেন, আমাদের ক্লাবে একদিন চলুন পবিত্রবাবু।

কোথায় এবং কিসের ক্লাব? প্রশ্ন করলাম।

ক্লাব ভবানীপুরে, শিল্প-আলোচনার বৈঠক। জাত-শিল্পী মহিলারাও সেখানে আসেন। নামকরণই হয়েছে ফোর আর্টস্ ক্লাব।

আপনি আমন্ত্রণ করছেন, আমি বললাম, অস্বীকার করা আমার পক্ষে অশোভন। বিদগ্ধ অভিজাত এবং সম্পন্ন সমাজের বৈঠকে আমাকে একটু বেখাপ্পা ঠেকাবে। বাঙাল দেশের লোক, মেসে থাকি, 'ফোর আর্টস্ ক্লাব'-এর মার্জিত আর্টিস্টিক রুচির সঙ্গে হয়ত সঙ্গতি রাখতে পারব না।

মিথ্যা বিনয় করছেন পবিত্রবাবু, বললেন কান্তি ঘোষ। অভিজাত বিদগ্ধ ও সম্পন্ন সমাজে যেন আপনি মেশেননি কোন দিন। আর মার্জিত ব্যবহারের কথা বলছেন? সে ভরসা আমার না থাকলে আমি আপনাকে আমন্ত্রণ জানাতাম না।

চারটি আর্টস্ সেখানে কি কি? আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

গান, সাহিত্য, চিত্রশিল্প ও সূচীশিল্প। বললেন কান্তিবাবু।

তাহলে ত মেয়েরা সেখানে আসবেই, বললাম আমি, অন্যান্য শিল্পে মহিলা ও পুরুষের মধ্যে ক্ষেত্র ভাগ লোপ পেয়ে থাকলেও সূচীশিল্প আজও মহিলাদের স্বাধিকার ক্ষেত্র।

কান্তি ঘোষ বললেন, কিন্তু সূচীশিল্পকে একেবারে স্বাধীন শিল্প বলে ধরা চলে না। চিত্রশিল্পের সঙ্গে তার সম্পর্ক নিবিড়, রেখা ও বর্ণের সমাবেশ দু-ক্ষেত্রেই প্রধান।

যাওয়ার লোভ হচ্ছে, অস্বীকার করব না, বললাম আমি, কিন্তু অসঙ্কোচে যাব—এমন কথাও বলতে পারছি না।

সঙ্কোচ নিয়েই না হয় চলুন একদিন, কান্তি ঘোষ হেসে বললেন, সঙ্কোচ কেটে যাবে। না কাটে, কেউ আপনাকে বেঁধে রাখবে না।

যাব ত নিশ্চয়ই, জবাব দিলাম আমি।

রোববার রোববার বৈঠক বসে, বললেন কান্তিবাবু। সামনের রোববারে গোটা চারেকের সময় আমার এখানে আসুন।

ঠিক চারটের সময়ই এসে হাজির হলাম। এস্প্লানেডে ট্রাম বদল করে দুজনে এসে নামলাম হাজরা রোডের মোড়ে। তারপর পূর্ব মুখে পদচারণা করে যথাস্থানে এসে পৌছলাম।

দরজা খোলা, সামনের ঘরে দেখলাম, বৈঠকের আয়োজন। সব কিছু শিল্পশ্রীমণ্ডিত। মেজেতে ফরাস পাতা, মাঝখানে আলপনা-কাটা ছোট একখানি জলচৌকির উপর ফুলদানিতে রজনীগন্ধার গুচ্ছ। ধূপদানিতে সুগন্ধি ধূপকাঠি জলছে, পিলসুজের উপর তেলের প্রদীপ জ্বেলে দিচ্ছেন একটি মহিলা। মাথার উপর বিজলী বাতি ও পাখা, ফরাসের উপর জন চার-পাঁচ উপবিষ্ট।

ঘরে ঢুকে কান্তিবাবু সকলকে অভিবাদন করে আসন গ্রহণ করলেন। আমিও তাঁর অনুকরণ করলাম। আমাকে উপস্থিতদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন কান্তিবাবু। গৃহকর্তা সুকুমার দাশগুপ্ত, ক্লাবের সম্পাদক দীনেশরঞ্জন দাশ, চিত্রশিল্পী গোকুল নাগ প্রভৃতি সকলেই আমাকে সহৃদয় ভাবে গ্রহণ করলেন।

স্বল্পভাষী গৃহকর্তার মৃদুহাস্যে তাঁর সহৃদয় মন স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায়।

পত্নী নিরুপমা দেবী ও পত্নী-অগ্রজ দীনেশরঞ্জনের আগ্রহে স্থাপিত 'ফোর আর্টস্ ক্লাব'কে বাধ্য হয়েই যে তিনি সহ্য করছেন, তা নয়, শিল্প-চর্চার উদ্দেশ্যে এতগুলি সুধীজন যে তাঁর গৃহে নিয়মিত জমায়েত হন, এর জন্য একটা প্রসন্নতা ধরা পড়ে তাঁর চোখের দৃষ্টিতে, মুখের ভাবে এবং সাধারণ ব্যবহারে।

গৃহকর্ত্রী নিরুপমা দেবীর উৎসাহই শুনলাম অপরিসীম এবং সেই উৎসাহ সঞ্চারিত হয়েছে তাঁর ছোট জা উমা দেবীর মধ্যে। ঘরে যখন ঢুকি তখন তিনিই প্রদীপ জ্বেলে দিচ্ছিলেন। কবি হিসেবে ইতিপূর্বে তাঁর পরিচিতি হয়েছে। তাঁর রোমান্স-ধর্মী কবিতার পরিস্ফুটন রয়েছে তাঁর সর্ব অবয়বে, তাঁর চোখের দৃষ্টিতে। প্রথম পরিচয়ে যে মধুর হাসি হেসে আমাকে অভিবাদন করলেন, তার মধ্যে একটা বিষাদের আভাস যেন তাঁর কাব্যের রোমান্সকেই প্রতিফলিত করছিল।

সম্পাদক দীনেশরঞ্জন প্রথম পরিচয়েই আমার সঙ্গে গল্প জুড়ে দিলেন। দোহারা মানুষটি, বয়সে ত্রিশ-বত্রিশের উপর না হলেও মাথায় টাকের আভাস দেখা দিয়েছে। গায়ের পাঞ্জাবিটা তৈরীর মধ্যে পর্যন্ত একটা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সহকর্মীদের মধ্যে মাঝে মাঝে মেলামেশার আনন্দের ভিতর দিয়েই হৃদয়বত্তা ও মনের আনন্দরূপ বিকশিত হয় এবং তা বাইরে প্রকাশ করার সুযোগ মেলে—এই দৃঢ় বিশ্বাস থেকে তিনি 'ফোর আর্টস্ ক্লাব' প্রতিষ্ঠা করেছেন। এবং তারই প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টা 'ঝড়ের দোলা' গল্পগ্রন্থ। আমাকে একখানা বই উপহার দিয়ে হেসে বললেন, গ্রন্থ বলা উচিত নয়, গুচ্ছও নয়, চারজনের মনের চারটি ফুল।

'ঝড়ের দোলা' নামের সার্থকতা জিজ্ঞাসা করলাম আমি। বললেন, 'সদানন্দময়তা সত্ত্বেও আমাদের মনে এক অতৃপ্তির তুফান বইছে—কি যে ঠিক চাই, জানিনা। এখনো ধরতে পারিনি। কিন্তু কিছু যে পেতেই হবে, সেই চেষ্টাতেই অশান্ত আবেগে আমাদের মন ছুটাছুটি করছে। দোলা লেগেছে ঝড়ের।

লেখক চতুষ্টয়ের মধ্যে মনীন্দ্রলাল আমার পূর্ব পরিচিত। একজন লেখক উপহার দাতা স্বয়ং, অপর দুজনও সেখানে উপস্থিত।

দীনেশরঞ্জনই আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন, ইনি সুনীতি দেবী। সাহিত্য এবং রস ইনি উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছেন, ইনি মনীষী

বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের কন্যা, শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের দৌহিত্র-বধূ। তাঁর ব্যবহারের মধ্যেও সবিশেষ শালীনতা এবং মর্যাদাবোধ চোখে পড়ল।

কিন্তু ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই যাকে আমার চোখে পড়েছিল সব চেয়ে বেশী তার সঙ্গে পরিচয় হল অনেক পরে। শীর্ণদেহে একটা চাবুকের তীব্রতা, এক মাথা রেশমগুচ্ছের মত কেশদাম ঘাড় পর্যন্ত পড়েছে। শীর্ণমুখে কালো ফ্রেমের চশমার ভিতর দিয়ে বড় বড় চোখ দুটোয় যেন অনন্ত জিজ্ঞাসার প্রকাশ।

পরিচয় করিয়ে দিয়ে দীনেশরঞ্জন বললেন, ফুল নিয়ে এর বেসাতি, দুনিয়ার জানোয়ার নিয়ে এর বসবাস। হৃদয় তাই ফুলের মত কোমল, মনটি তেমনি সুন্দর, আর শীর্ণদেহেও পশুজগতের প্রাণপ্রাচুর্য। অথচ মনের মধ্যে মানব-মনের অনন্ত জিজ্ঞাসা। তা ছাড়া, ইনি চিত্রশিল্পী। আর যে অশান্তির ঝড় মানুষকে আদিম অবস্থা থেকে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে দর্শন-কাব্য-বিজ্ঞানের জিজ্ঞাসার ভিতর দিয়ে, সেই অশান্তিই ওর মনে নিরন্তর দোলা দিচ্ছে। ও বলে, যে তরুণের মনে ঝড়ের দোলা নেই, সে ত বুড়িয়ে গেছে, হয়ে গেছে স্থবির স্থাবর। ওর অন্তরস্থ প্রভঞ্জন মূর্ত হয় ওর মুখে বাঁশের বাঁশিতে, হাতের তুলি ও রঙে।

আমি বললাম, বাঁশি বাজান, ছবি আকেন, গল্প লেখেন, অশেষ গুণী ইনি, একথা ত বুঝতে পারলাম, চিত্রশিল্পী হিসেবে কিছুটা খ্যাতিও আমি শুনেছি। লেখা গল্প ত আমার হাতেই রয়েছে। বাঁশিও শুনব হয়ত আজই। কিন্তু ফুল নিয়ে বেসাতি, আর জানোয়ার নিয়ে বাস—একথাগুলো একেবারেই হেঁয়ালি লাগছে।

যাঁকে নিয়ে এত কথা, তিনি-ই এবার মুখ খুললেন, বললেন, হেঁয়ালি এর মধ্যে কিছু নেই। ডি. আর. যে ভাষায় ইউফিমিজ্‌ম্‌ দিয়ে কথা বলতে ওস্তাদ, তারই প্রমাণ দিচ্ছে।

হেঁয়ালিটা ভেঙেই দিন না, আমি বললাম।

নিউ মার্কেটে ফুলের দোকানদারি করি' আর থাকি জু-গার্ডেনে, মামার কোয়ার্টারে, বললেন যুবক।

দীনেশরঞ্জন বললেন, গোকুল যা বলেছে তা সত্যি, কিন্তু আমি যা বলেছি তারও একবর্ণ মিথ্যে নয়। বৃত্তি এবং আবাসের পরিবেশ হয়

ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করে, না হয় দেয় তাঁকে আত্ম-বিকাশের সুবিধা। ফুলের সুকুমারত্ব আর জৈবজীবনের প্রাণপ্রাচুর্য—এই দুয়ের সঙ্গে গোকুলের অন্তরের যোগ আছে বলেই ও এ দুটির সঙ্গে মিশেছে। আর না হয়, অবস্থার বশে ভিড়ে যাওয়ার পরে তারই ভিতর দিয়ে অন্তরকে বিকশিত করছে।

কিন্তু যে দুটি প্রবৃত্তির কথা বললেন, বললাম আমি, দু-ই প্রাকৃত জীবনের অংশ; কিন্তু তাদের মধ্যে কি স্বতোবিরোধ নেই?

থাকা উচিত নয়, বললেন গোকুল, বর্তমান সমাজ-পরিবেশে এই দুটি স্বগোত্রের প্রবৃত্তিকে বিরোধী বলে মনে হয়, এবং তাই জীবনের একটা মস্ত বড় দুঃখ। দুটাকে মেলাতে আমাদের প্রাণান্ত হয়।

ক্রমে ক্রমে আরো অনেকে এসে পড়লেন। পরিচয়ে জানলাম এঁদের মধ্যে আছেন দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, অতুল বসু, যামিনী রায়, সুধীর চৌধুরী, মায়া ব্যানার্জী এবং আরো অনেকে। গোকুলের পরেই সবচেয়ে বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন দেবীপ্রসাদ। গ্রীক ভাস্করের গঠিত মূর্তির মত দেহ, পৌরুষ-সৌন্দর্যের মূর্ত প্রতীক। গোকুলের উক্তির মর্মকথা অতি সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয়ে গেল। প্রকৃতির দুই বিপরীত দিকের প্রতি আমাদের অন্তরের সমান আকর্ষণ, নইলে গোকুল ও দেবীপ্রসাদ—এই দুই বিপরীতধর্মী মূর্তিই আমাকে আকৃষ্ট করল কেন?

পরিবেশের বৈশিষ্ট্যও মনের মধ্যে জাগাল বিপরীত অনুভূতি। ঠিক এই ধরনের মিশ্র ও মার্জিত সমাবেশে যথেষ্ট অস্বস্তি বোধ করছিলাম সন্দেহ নেই, কিন্তু এই অনভ্যস্ত পরিবেশেও যে নতুন মানুষগুলিকে দেখলাম তাঁদের মধ্যে অনেকেই গভীরভাবে আমার হৃদয় স্পর্শ করলেন।

সেদিনকার বৈঠকে, যতদূর মনে পড়ে, উমা দেবীর স্বপ্ন শীর্ষক কবিতা ও সুনীতি দেবীর নিবন্ধ পঠিত হয়েছিল।

যাবার আগে যে সঙ্কোচবোধ করছিলাম, ফিরে এসেও সে সঙ্কোচ কাটে নি, মনের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলেছে—আবার যাব কি না। কিন্তু সাপ্তাহিক বৈঠকের দিনটি এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে কান্তি ঘোষের বাড়ীতে চড়াও হয়েছি। এমনি করে কয়েক সপ্তাহের শেষে নিজেই সদস্য হবার প্রস্তাব জানালাম কান্তিবাবুর কাছে। তিনি হেসে মন্তব্য করলেন, সম্পাদকের সঙ্গে ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতা ছাড়াও আপনার সেখানে অনেকের সঙ্গে সৌহার্দ্য জন্মে গেছে।

এরপর আর সসঙ্কোচে আমাকে অনুরোধ করছেন কেন? সম্পাদকের কাছে খোঁজ নিয়ে দেখুন, মেম্বার হওয়া বোধ হয় আপনার বাকী নেই।

ঘুরতে ঘুরতে একদিন সকালে এসে গজেনদার বাড়ী হাজির হলাম। বাড়ী ঢুকবার আগেই রোয়াকে দেখলাম আসর জমার উদ্যোগ—গজেনদা ও সত্যেন্দ্রনাথ বসে গল্প করছেন। আমি এসে সোজাসুজি একপাশে বসে পড়লাম।

সত্যেন্দ্রনাথ সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন করলেন, কই পবিত্র, তোমার শাতিল-আরব-এর কবি কোথায়? আমি নিয়মিত 'মোসলেম ভারত' পড়ি, ওঁরা ভালবেসে কাগজ পাঠান বলেই নয়, কাজী নজরুল ইসলামের কবিতাগুলো আমায় টানে। কি অনবদ্য মিল ও ছন্দ, অথচ কত আরবী পারশি শব্দ নিয়ে সে ছন্দমিলকে গাঁথতে হয়েছে। গজেনদার দিকে ফিরে বললেন, বুঝলেন গজেনদা, অদ্ভুত ক্ষমতা ছোকরার। আর কি জোরালো দৃষ্টিভঙ্গি! আমি ত 'মোসলেম ভারত'-এর পথ চেয়ে বসে থাকি ওর কবিতা পড়বার আশায়।

নিয়মিতই এখন ওর কবিতা পড়তে পারবেন, আমি বললাম, কবিতার জোয়ার জেগেছে এখন ওর মনে।

তুমি বড় স্বার্থপর লোক ত! বললেন সত্যেন্দ্রনাথ, পূর্ণ জোয়ারে অবগাহন করবে তোমরা, ঘিরে রাখবে তাকে, আর আমাদের জন্য মাসে মাসে কখনো-সখনো একটা ধারা খুলে দেবে শুধু! কেন, আমরা কি তার কাছাকাছি আসতে পারি না!

সে কি কথা সত্যেনদা, আমি উত্তর করলাম, আপনি যখন বলবেন তখনই আমি তাকে আপনার কাছে নিয়ে আসব। আপনার ব্যক্তিগত স্নেহ লাভ করতে পারা ত নজরুলের ভাগ্যের কথা!

অত মিষ্টি কথায় কাজ নেই ভাই, কবে নিয়ে আসবে, তাই বল।

আপনি যেদিন আসবেন।

আমার আবার কবে কি? কাল বল, কালই আসব।

সন্ধের সময় নজরুলকে গিয়ে বললাম, কবি সত্যেন দত্ত তোর সঙ্গে আলাপ করতে চেয়েছেন।

ওরে বাপরে! তোরা আমাকে মহাপুরুষ বানিয়ে ছাড়বি! বলেই যেমন হারমোনিয়াম পোঁ পোঁ করছিল তাই করতে থাকে।

কাল সন্ধেয় এসে নিয়ে যাব, তৈরি থাকিস।

আমার আবার তৈরী কিরে? চুল বেঁধে সিঁদুর দিয়ে নিতে হবে, না, বড় সাহেবের মত চোস্ত করে সাজতে হবে! তুই যদি বলিস, এখনই এই অবস্থায় যে-কোন জায়গায় যেতে পারি। জিজ্ঞাসাও করব না, বেহেস্তে কি জাহান্নামে নিয়ে যাচ্ছিস।

পরদিন সন্ধ্যার সময় যখন গজেনদার ঘরে এসে ঢুকলাম, তখন ঘরে আর কেউ নেই। তা বলে ঘর দখল করতে নোটিশ বা আর্গুমেণ্ট দরকার হয় না আমাদের, আমরাই ত ঘরের মালিক। আর পাঁচজনের মত গজেনদাও যথাসময়ে আসবেন! তবে একটু বেশী অধিকার তাঁর ছিল, সেটা আমাদের চা-পান-তামাক দেবার অধিকার।

তক্তাপোশে বসলাম দুজনে। সঙ্গে সঙ্গেই কাজীর দৃষ্টি পড়ল ঘরের কোণে, অমনি উঠে গেল, তারপর টেবিলটার উপর থেকে ছেঁড়া বই-খাতা-খবরের কাগজের স্তূপ তক্তাপোশে নামিয়ে রাখতে লাগল। যুগান্তের পুঞ্জীভূত ধুলো উড়তে লাগল হাওয়ায়।

এ আবার তোর কি পাগলামি শুরু হল? আমি প্রশ্ন করলাম।

রোস সখা, ছেলেবেলায় "সদ্ভাবশতক" পড়েছিলে? পাঠশালায় গুরুমশায় অন্য ছেলেকে দিয়ে কান মলিয়ে মুখস্থ করিয়েছেন আমাকে:

'যেখানে দেখিবে ছাই
উড়াইয়া দেখো তাই,
পেলেও পাইতে পারো
অমূল্য রতন।'

বাজে কথা রাখ্, কি অমূল্য রতনটি আছে ওখানে শুনি?

এই সঙ্গীতময় যন্ত্রটি যে অবহেলায় এখানে পড়ে রয়েছে, বললে নজরুল, যে-কোন রসিক চিত্তই তাতে ব্যথিত হবে। আমি তাই অহল্যা উদ্ধার করছি।

অহল্যা উদ্ধার কি রে? আমি বিস্ময়ে প্রশ্ন করলাম। ওই জঞ্জালে ঢাকা টেবিলটা দিনের পর দিন আমরা দেখে আসছি, ওটা যে একটা অর্গান, একথা ঘুণাক্ষরেও আমার কোনদিন মনে হয় নি।

নজরুল বললে, এর কোমল হৃদয় পাষাণ হয়ে গেছে, রীডগুলো পর্যন্ত টিপলে নামে না। পেডালটাও গেছে এঁটে। এই পাষাণীর মধ্যে প্রাণসঞ্চার করতে হবে।

যাই করিস, ভাঙিস না যন্তরটা, আমি বললাম।

যদি ভাঙি, বললে নজরুল, অন্যায় করব না। সুরহীন সুরযন্ত্রের অস্তিত্বের অধিকার নেই। বলেই ও যেমন সেটা নাড়াচাড়া করছিল, নিবিষ্ট মনে তাই করতে লাগল।

এমন সময় লাঠিতে ভর দিয়ে মন্থর পদে গজেনদার প্রবেশ। আমায় দেখেই বললেন, কতক্ষণ এসেছিস? খবর দিস্ নি যে! তারপর ঘরের কোণে দৃষ্টি পড়তেই বললেন, ও আবার কে? আর ওখানে কি করছেন উনি?

আমি বললাম, সত্যেনদাকে কাল কথা দিয়েছিলাম, আপনার মনে আছে—এক কবিকে নিয়ে আসব, এই সেই কবি।

তা কবি, ওখানে কি করছে? গজেনদা প্রশ্ন করলেন।

অর্গানটা দেখে বাজাবার লোভ সামলাতে পারেনি।

ও যে অনেকদিন বোবা হয়ে গেছে, ওকে টিপে পিটিয়ে কোন লাভ নেই ভায়া।

পিছন না ফিরেই নজরুল বললে, কি করব, গুরুর হুকুম। এই সব মূঢ় ম্লানমূক মুখে দিতে হবে ভাষা।

হো হো করে হাসিতে ফেটে পড়লেন গজেনদা। কাজীর কাণ্ড দেখে আমিও হাসি চাপতে পারলাম না। কাজী কিন্তু গম্ভীর নীরবে একাগ্রচিত্তে অর্গানটা নিয়ে নাড়াচাড়া করেই চলল।

একটু সামলে নিয়ে বললেন গজেনদা, কিছু ফয়দা হবে না ভাই, ধুলো ঘেঁটে মরবে শুধু।

কোন জবাব করলে না নজরুল। আমি বললাম, ছেড়ে দিন দাদা, পাগলকে। ধুলো খাওয়া বরাতে আছে আমাদের।

তুমি না বললে ও কবি? বললেন গজেনদা, গানের ঝোঁক আছে বুঝি?

তা ত আছেই, আমি বললাম, আরো আছে এক সৃষ্টিছাড়া ভাব। নইলে আমাদের চোখে পড়ল না কোনদিন আপনার ঘরের অর্গ্যান! যাক গজেনদা, আজ আর কে কে আসছেন?

সত্যেনবাবু ত আসবেন, বলে গিয়েছেন। আর জানই ত নিয়ম করে নোটিশ দিয়ে কেউ আসে না আমার এখানে। যার যখন খুশি।

একটু পরেই প্যাঁ করে একটা আওয়াজ বেজে উঠল। ফিরে তাকিয়েই দেখি নজরুল অর্গানের রীডগুলোর এক একটা টিপে ধরছে, আর নানা গ্রামের আওয়াজ উঠছে বেজে।

আরে, সত্যি, আওয়াজ বের করেছে! গজেনদার কণ্ঠস্বরে পরম বিস্ময়।

নজরুল তখনো নির্বিকার। নানা খুনসুটি করছে অর্গানটা নিয়ে।

বেশী দেরী হল না, হঠাৎ এক সময় বেজে উঠল সুর। আমার আর গজেনদার বিস্ময়কে ছাপিয়ে উঠল নজরুলের উল্লাস। এবার তক্তাপোশে বসে পড়ে স্বভাবসিদ্ধ মাথানাড়া ভঙ্গিতে বাজানো শুরু করল।

গজেনদার ঘরে গান-বাজনা জমল কবে থেকে? বলতে বলতে ঘরে এসে ঢুকলেন প্রেমাঙ্কুর আতর্থী।

গড়গড়ার নলটা মুখ থেকে নামিয়ে গজেনদা জবাব করলেন, ঠিক এই মুহূর্ত থেকে। ভাঙা অর্গানটার হারিয়ে যাওয়া বাকশক্তি ফিরিয়ে আনার মত জাদুকর এসেছে, তাকে ঘিরেই জমবে আসর। বলেই হাতের নলটা এগিয়ে দিলেন বুড়োদার হাতে।

প্রেমাঙ্কুর বললেন, অর্গান! তোমার আবার অর্গান ছিল কোথায়? হেঁয়ালি রাখ।

ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করলাম আমি। বললাম, বই-খবরের কাগজের আবর্জনায় ঢাকা ওই কোণের টেবিলটা যে একটা অর্গান, সে খবর কি আমরাই জানতাম!

কোন্ প্রত্নতাত্ত্বিক তাহলে সেটি আবিষ্কার করলেন? তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হেনে শ্লেষের সুরে মন্তব্য করলেন প্রেমাঙ্কুর।

পবিত্র সঙ্গে করে এনেছে, গজেনদা বললেন। কবি কাজী নজরুল ইসলাম।

কবি! বটে! বুড়োদা একবার ফিরে তাকালেন কাজীর দিকে। তারপর বললেন, উনি ত তাহলে মহামনীষী। একে কবি, তায় প্রত্নতাত্ত্বিক। পবিত্রর বন্ধু, হবেই ত।

কাজীর কিন্তু এদিকে খেয়াল নেই। সে ততক্ষণে গান শুরু করে দিয়েছে। প্রথমে গুনগুন করে, তারপর গলা ছেড়ে মাথা নেড়ে লম্বা চুলে ঝাঁকানি দিয়ে :

'সে কোন্ বনের হরিণ ছিল আমার মনে
কে তারে বাঁধল অকারণে—'

গজেনদা অর্ধনিমিলিত চোখে স্থির হয়ে বসে শোনেন, শুধু বাঁ হাতখানা তালে তালে একটু দোলে।

বুড়োদার চোখেও বিস্ময়, তিনিও চুপ করে গেছেন। গান শেষ হলে পর আমার দিকে চেয়ে বললেন, তুমি বলছ কবি, ওর কবিতার খবর আমি জানি না। তবে গানে দরদ আছে—একথা স্বীকার না করে পারি না।

গজেনদা বললেন, থামলে কেন ভাই?

নজরুল থামে নি, দম নিচ্ছিল শুধু! আবার গান শুরু করে দেয়। এমন সময়ে ধীর পায়ে এসে ঘরে ঢোকেন সত্যেন্দ্রনাথ। নজরুলের দিকে তাকিয়ে একটু থামেন, তারপর উঠে বসলেন তক্তাপোশের উপর।

আমার দিকে তাকাতে আমি চোখ ইসারা করে চাপা গলায় বললাম, নজরুল!

আর একবার ফিরে তাকিয়ে দেখলেন শুধু সত্যেন দত্ত।

এবার গান থামতেই নজরুলকে আমি কাছে ডাকলাম, বললাম ঢের হয়েছে, এদিকে এসে আলাপ-পরিচয় কর।

লক্ষীছেলের মত এগিয়ে এল কাজী। বললাম, এই কবি সত্যেন দত্ত, ইনি প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, আমাদের বুড়োদা, আর লাস্ট্ বাট্ নট্ দি লীস্ট—ইনি আমাদের সকলের গজেনদা, গৃহস্বামী—যদিও এই গৃহটা আসলে ওঁর না আমাদের, সে খবর কারোর জানা নেই।

নজরুলের চোখ মুখ উচ্ছ্বসিত, সত্যেনদার পায়ের কাছে মাথা নীচু করে হাত বাড়িয়ে দেয়, পায়ে হাত দেবার আগেই সত্যেনদা জড়িয়ে ধরেন কাজীকে, বলেন, তুমি ভাই, নতুন ঢেউ এনেছ। আমরা ত নগণ্য, গুরুদেবকে পর্যন্ত বিস্মিত করেছ তুমি।

গুরুদেব আমার কোন লেখা পড়েছেন নাকি? বিহ্বল হয়ে প্রশ্ন করে কাজী।

সত্যি বলতে কি, বললেন সত্যেনদা, গুরুদেবই আমাকে একদিন নিজে থেকে প্রশ্ন করলেন, কাজী নজরুল ইসলামের কোন কবিতা পড়েছি কি-না। তাঁর মতে ভাবের সংস্কৃতি-সমন্বয়ের সাধনায় এই এক নতুন অবদান আনছ তুমি।

গুরুদেব বলেছেন! আনন্দের আতিশয্যে মুখের কথা শেষ করতে পারে না নজরুল, আমার দিকে তাকিয়ে 'পবিত্র' বলে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে থাকে শুধু।

কোথায় লিখেছেন ইনি? চোখ তুলে প্রশ্ন করলেন বুড়োদা।

'মোসলেম ভারত', সত্যেন্দ্রনাথ জবাব করলেন। দেখোনি তুমি?

আফজল সাহেব পাঠান বটে, কিন্তু পড়া হয়ে ওঠে না।

গুরুদেব কিন্তু নিয়মিত পড়েন, বললেন সত্যেন্দ্রনাথ।

গজেনদা বললেন, ওই সমন্বয় আর অবদান আমি বুঝিনে। কিন্তু যিনি এমন প্রাণ খুলে গান গাইতে পারেন তাঁকে পেয়ে আমার যে আনন্দের খোরাক বেড়ে গেল, এইটেই আমার মস্ত লাভ। একটা অর্গানও লাভ হয়ে গেল—একথাও মনে করতে পারি। ওটা ত বাতিলের মধ্যেই ছিল।

গানটা আমার বাতিক, বললে নজরুল। কেমন গাই সেকথা না ভেবে গলা ছেড়ে দিই।

লেটুর দলে গান গেয়েছিলি কোন দিন? আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

সে আবার কি? জিজ্ঞাসা করলেন সত্যেনদা।

গজেনদা বুড়োদাও জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন আমার দিকে।

নজরুল বললে, বীরভূম বর্ধমানের পাড়াগাঁয়ে কবি গানেরই এক রকম-ফের লেটু। তাদের কাছে ঘেঁষেছিলাম ছেলেবেলায় গান গাওয়ার শখে, কিন্তু গাওয়ার চেয়ে গান লেখাই হল আমার সেখানে বড় কাজ। আজ সেই লেটু দলের গান লিখিয়ের কবিতাই কবি-গুরু পড়ছেন—এরই নাম বরাত। শেষের কথাগুলি বলতে বলতে উদ্বেল হয়ে ওঠে কাজী।

বস্তু আছে বলেই না, বললেন সত্যেন্দ্রনাথ, বাজে জিনিসকে মূল্য দেন না গুরুদেব।

আমরাও জানি, গুরুদেবের হৃদয় মহাসমুদ্রের মত উদার, মন্তব্য করলেন আতর্থী, ভাল-মন্দ, সৎ-অসৎ বিচারের অপেক্ষা না রেখেই নির্বিচারে তিনি স্নেহ বর্ষণ করেন।

যাবার আগে নিজে থেকেই আর একখানা গান গাইল নজরুল। গজেনদা বললেন, আমাকে মাঝে মাঝে গান শোনাবার ব্যবস্থাটা কিন্তু পাকাপাকি হয়ে রইল ভায়া;

আমি কিন্তু তোমার কাছে আরো কবিতা চাইব, যা লিখেছ তার চেয়ে অনেক ভাল। এবং তুমি তা পারবে।

ঢাকা থেকে প্রথম যখন কলকাতায় আসি তখন বন্ধুবর কবি পরিমল ঘোষের দেওয়া দুখানা পরিচয়-পত্রের একখানি ব্যবহার করেছিলাম। নাটোরাধিপ জগদিন্দ্রনাথ রায়ের কাছে চিঠি নিয়ে আর যাওয়া হয়নি। তার অনেক দিন পরে চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ীতে এসেছিলেন মহারাজ, সেখানে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়। এবং দুঃখ করে তিনি বললেন, পরিমলবাবু আমাকে লিখেছিলেন তোমার কথা। কিন্তু কই, তুমি ত এলে না।-

কেন যাই নি তার জবাব সেদিন দিতে পারিনি। তবে মহারাজ যখন বললেন, এবার যাবে ত? তখন যাব বলে স্বীকার করতেই হয়েছিল।

বয়োজ্যেষ্ঠদের কাছে কলকাতার সমাজে তুই-তোকারি পাই নি কখনো, তার জন্য তখনকার মত মনটা ক্ষুণ্ণ হল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সত্যি একদিন যখন তাঁর বাড়ী গিয়ে হাজির হলাম, তখন তাঁর আন্তরিকতায়, তাঁর কাছে 'তুই' হতে পেরে আনন্দ বোধ করেছিলাম। তিনি ছিলেন সেই শ্রেণীর মানুষ যিনি বুকে টেনে নিচ্ছেন এই সম্পর্কটা প্রকাশ করেন 'তুই' ভাষণ দিয়ে।

মহারাজের কাছে তারপর অনেকবার গিয়েছি। এই রসিক-পণ্ডিত-সাহিত্যিক মহারাজকে ঘিরে সেখানে প্রায় আড্ডা বসত। সে আড্ডায় আমাকে সস্নেহেই স্থান দিয়েছেন। এখানে যাঁদের সঙ্গে আমি পরিচিত হই, কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী তাঁদের অন্যতম। তিনি যেদিন আমাকে তাঁর বাড়ী আসতে বললেন, তাতে যা খুশী হয়েছিলাম তার চেয়েও বেশী আনন্দ পেলাম, তিনি যখন তাঁর নতুন বাড়ীর ঠিকানা দিলেন আমাকে—১০।১ আরপুলি লেন। বললেন, রাস্তার নামটা তোমার ভুলে যাওয়ার কথা নয়, আর বাড়ীর নম্বর?—জানই ত আমি দশজনের একজন। বলেই তিনি হেসে ফেললেন।

তারপর যতীনদার বাড়ীতে অনেকবার গিয়েছি, কখনো নিমন্ত্রিত হয়ে, কখনো বিনা নিমন্ত্রণে। জাঁকিয়ে বসে কবিতা শুনিয়েছেন, ভাববিহ্বল আবৃত্তিতে মুগ্ধ করেছেন, কিন্তু তাঁর আর একটা বিশেষ অনুরাগ ছিল

সঙ্গীতে। গানের আসর প্রায়ই বসাতেন। ভরপুর জমজমাট আসর চলত অনেক রাত পর্যন্ত, আর অভ্যাগতদের অমুদার ভোজ্য পরিবেশনে আপ্যায়িত করা হত। ছোট জমিদার হলেও দিলদরিয়া জমিদারী মেজাজের কিছু কমতি ছিল না তাঁর।

নজরুলের কবিতা পাঠে মুগ্ধ হয়ে যতীনদা যেদিন তার প্রসঙ্গ পাড়লেন আমার কাছে, নজরুলের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কটুকু জাহির করে আত্মপ্রসাদ লাভের লোভটুকু আমি সম্বরণ করতে পারলাম না। ফলে আদেশ জারি হয়ে গেল, অবিলম্বে তাকে একদিন নিয়ে যেতে হবে তাঁর বাড়ীতে।

নজরুলের কিছুতেই কিন্তু নেই, বললে, যেতে হবে, চল্।

গিয়েছিল কবিতা শোনাতে ও গল্প করতে। যিনি ডেকেছিলেন, তিনি গাইয়ে নজরুলের খবর জানতেন না। না জানলে কি হবে, নজরুলের ভিতরকার গাইয়ে তখন নিজেকে ধরে রাখতে পারছে না—প্রকাশের জন্য সব সময় আকু-পাকু করছে। সেই নজরুল যখন যতীনদার বৈঠকখানায় গান-বাজনার সরঞ্জাম দেখতে পেল তখন ওর হাবভাব দেখে যতীনদার বুঝতে বাকী রইল না। বললেন, আসেটাসে না কি?

নজরুল বললে, এত আসে যে ধরে রাখতে পারি না। তবে তা গান হয় কি-না, আর সমঝদারের ভাল লাগে কি-না, সেটুকু জানি না আমি।

আমি বললাম, আর তার ধারও ত ধারিস না। মন চায়, গেয়ে যাস। দে না শুরু করে।

আমার প্রস্তাব সাগ্রহে অনুমোদন করলেন যতীনদা। হার্মোনিয়ম টেনে নিয়ে নজরুল শুরু করে দিল—

'এতদিন যে বসেছিলেম পথ চেয়ে আর কালগুণে'—ঝাঁকড়া চুলে ভরা মাথাটা নেড়ে নেড়ে নজরুল যখন গলা ছেড়ে গাইছে, 'বালক-বীরের বেশে তুমি করলে বিশ্বজয়, এ কি গো বিস্ময়', যতীনদা তখন চোখ বুজে সর্ব অঙ্গ দুলিয়ে তাল দিচ্ছেন।

গাইয়ে নিজে এবং গৃহস্বামী দুজনেই এতখানি মশগুল হয়ে গিয়েছেন যে, ঘড়ির কাঁটার গতির কথা-সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছেন দুজনে, আমাকেই আসর ভাঙতে হল শেষ পর্যন্ত। অবশ্য যতীনদার বাড়ীতে নিয়মিত

গানের আসর জমাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তবেই আমি ও নজরুল সেদিন-কার মত ছাড়া পেয়েছিলাম।

এরপর থেকে যতীনদার বাড়ীতে নজরুলকে নিয়ে আসর জমানো প্রায় নিয়মিত হয়ে গেল। আর যাঁরা এসে আসর জাঁকাতে লাগলেন তাঁদের মধ্যে আফজল ত আমাদের নিয়মিত সঙ্গী ছিলই, আরো এলেন হেমেন্দ্রকুমার, প্রেমাঙ্কুর, মণিলাল, গিরিজাদা, এক-আধদিন সত্যেন দত্তও এসে পড়েছেন। এ হেন আড্ডায় একজন নতুন গাইয়ের আবির্ভাব আমাদের আগে থেকেই নোটিশ দিয়ে জানানো হয়। তিনি নাকি কীর্তন গাইবেন। আমরা ত্রিমূর্তি এসে পৌঁছতেই যতীন দা আলাপ করিয়ে দিলেন—ইনি নলিনীকান্ত সরকার, আমাদের কীর্তন পরিবেশন করবেন।

আমি চেয়ে দেখলাম, অতি-পরিচিত মুখ। বললাম, কি দাদা, চিনতে পারেন?

ওরে বাপরে, চিনতে পারব না, বললেম নলিনীকান্ত, যে ভাবে গোয়েন্দার মত প্রশ্ন করে করে আমাকে জেরবার করেছিলেন সেদিন, আপনি যে টিকটিকি নন, সে সংশয় মন থেকে মুছে ফেলতে পারিনি অনেক দিন।

আজ হঠাৎ সে সংশয় কেটে গেছে কি করে? আমি প্রশ্ন করলাম।

আজ আর ভয়-সংশয়ের কোন দরকার নেই ভাই, বললেন নলিনীদা, এখন বৃদ্ধ বেশ্যা তপস্বিনী। সুর করে জুড়ে দিলেন, ভবনদীর পারে গিয়ে বেরাল বসেছে আহ্নিকে।

সব কয় জোড়া চোখ বিস্ময়ে নিবিষ্ট হল তাঁর দিকে। নজরুল আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, কেমন যেন হেঁয়ালি হেঁয়ালি ঠেকছে!

কথাটা কানে যেতেই নলিনীদা বুঝিয়ে দিলেন, হেঁয়ালি কিছুই নেই হাবিলদার সাহেব। হেঁয়ালি ছিল সেদিন যেদিন অমূল্যবাবুর ঘরে একটি দিনের আশ্রয় ছেড়ে পালাতে হয়েছিল ওঁরই জেরার ভয়ে। তখন পুলিশ আমার পিছনে, আমি নাকি বিপ্লবী, সাংঘাতিক লোক। তাই তখন নিজের চার দিকে হেঁয়ালি ঘিরে নানা ছলনায় আত্মপরিচয় গোপন করে পালিয়ে বেড়াতে হয়েছে।

আজ আর আমাকে ভয় করেন না? আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

আমাকে যারা ভয় করে বীরপুরুষ বানিয়ে রেখেছিল তারাই যে আজ আবিষ্কার করে ফেলেছে যে, আমি নখদন্তহীন নেহাৎ নির্জীব প্রাণী। তারা তাই আমার পিছনে ধাওয়া করার পণ্ডশ্রম ত্যাগ করেছে। আমিও নিঃসংশয়ে ভাল মানুষের মত সমাজে ফিরে এসেছি,—গান গাই, আর বিড়ি ফুঁকি। কোন ঝঞ্ঝাটের ধার ধারি না।

আপনাকে তাহলে এখন আমরা আমাদের মধ্যে পাব এটুকু ধরে নিতে পারি! বলেই আমি নজরুলের দিকে তাকিয়ে বললাম, এবার দু'গাইয়েতে আঁতাত হোক।

দে গরুর গা ধুইয়ে, বলে কাজী সামনের রেকাব থেকে একমুঠো পান মুখে পুরে দিল।

নলিনীদাই আগে গান ধরলেন, 'বঁধু, কি আর বলিব আমি! জীবনে মরণে জনমে জনমে প্রাণনাথ হয়ো তুমি।' প্রত্যেকটি পদ স্পষ্ট উচ্চারণ করে মাথা নেড়ে অপাঙ্গ দৃষ্টিতে নজরুলের মুখের কাছে মুখখানি এগিয়ে নিয়ে আসেন।

আমি বললাম, সে কি দাদা, এই লডিয়ে ছোকরাটা হল আপনার বঁধু!

নলিনীদা থামেন না, গানের মধ্যে আখর দিয়ে বলেন, আহা এমন কানু কোথায় পাব?

গান শেষ হলে সকলে মিলে হো হো করে হেসে ওঠে। আমি বলি, ওরে কাজী, দাদার কাছে ঘেঁষে বোস্, কীর্তনের শেষে যুগল মিলন না হলে কিছুই হল না।

কাজী বললে, 'তোমারি গরবে, গরবিনী আমি, রূপসী তোমারি রূপে।' কীর্তন যদি না শিখলাম তবে গান গাওয়াই আমার ব্যর্থ হয়ে গেল।

নলিনীদা বললেন, আসলে মনে ভক্তি, তারপর কণ্ঠ থাকলে কীর্তন শিখতে কতক্ষণ?

এতক্ষণ যতীনদা বসে বসে মুচকি হাসছিলেন শুধু, এবার মুখ খুললেন। বললেন, বংশী শিক্ষার ছবিখানি দেখেছো নিশ্চয়, সেই নকলে কীর্তন শিক্ষার পালা শুরু করা যাক।

আমি বললাম, নলিনীদা আরো দু-চারখানা গেয়ে আমাদের শোনান, আর তাতেই ও শিখে যাবে যদি অন্তরে পিরিতি থাকে।

নলিনীদা আবার গান ধরলেন, 'পিরিতি পিরিতি না জানি কি রীতি।'

যতীনদার বাড়ীর এমনি এক গানের আসর শেষ করে একদিন রাত সাড়ে দশটার পরে বেরিয়েছি আমরা তিনজন, আমি, নজরুল আর আফজল।

দু-পা এগোতে না এগোতেই পিছন থেকে কে যেন ডাকলে, শুনছেন!

আমি পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখি একটি আঠার-উনিশ বছর বয়সের সুদর্শন তরুণ। বললাম, আমাদের ডাকছেন আপনি?

তরুণ বললে, এ বাড়ীতে কাজী নজরুল ইসলাম প্রায়ই আসেন শুনেছি। তিনি কি ভিতরে আছেন?

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কেন বলুন ত?

তরুণ বললে, তাঁকে শুধু একবার দেখব। সেই সন্ধে থেকে আমি দাঁড়িয়ে আছি এখানে।

নজরুল ও আফজল ততক্ষণে ক'কদম এগিয়ে গেছে। আমি ডাকলাম, এই নূরু দাঁড়া। তারপর তরুণটিকে বললাম, ওই আগে, ঝাঁকড়া চুল, উনিই নজরুল।

ওরা দাঁড়িয়ে গেল, আমরা দুজনে এগিয়ে তাদের কাছে গেলাম। নজরুলের সামনে গিয়ে যুবক বললেন, আপনি নজরুল ইসলাম? বলেই হাঁ করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

ছেলেটিও চলল আমাদের সঙ্গে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, নজরুল এখানে আসে, আপনি জানলেন কেমন করে?

বাগচী মশাইর বাড়ীর উল্টো দিকে যে সরকারদের বাড়ী, সেখানে আমি টিউশনি করতে আসি সন্ধের সময়। সেখানেই শুনেছি।

আপনি কি কলেজে পড়েন? আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

হাঁ, সিটি কলেজে।

বত্রিশ নম্বর কলেজ স্ট্রীটের দরজায় এসে আমরা থামতেই তরুণ জিজ্ঞাসা করলেন, এখানে—?

আমি বললাম, নজরুল ও আফজল এখানেই থাকে।

দরজা থেকেই বিদায় নিয়ে চলে গেলাম। ওরা তিনজন তখনো দাঁড়িয়ে।

পরদিন আফজলের কাছে শুনলাম, সেই ছেলেটির সঙ্গে নজরুল অনেক রাত পর্যন্ত পথে পায়চারি করেছে। যে-কোন সময় এসে হাজির হবার

অনুমতিও দিয়ে রেখেছে নজরুল। ছেলেটির নাম নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।

যথারীতি রবিবার সকালে চৌধুরী মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছি। দেখি সিগারেট হাতে সোডার গ্লাসের বুদ্বুদের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে আছেন। মুখের ভাব রীতিমত বিমর্ষ। আমি কোন কথা বলতে পারলাম না, চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

প্রায় মিনিটখানেক পরে চোখ তুলে তাকালেন আমার দিকে, বললেন, পবিত্র, আজ যেন আরো জোর করেই মনে চেপে বসেছে—অল্ ইজ ভ্যানিটি। মোহভঙ্গের সময় এসে গেছে।

একথা বলছেন কেন হঠাৎ?

হঠাৎ নয়, পবিত্র, দিন দিন বুঝতে পারছি, আর লিখতে পারছি না। মগজের ভিতরকার বুদ্বুদগুলি মিলিয়ে জল হয়ে গেছে যেন। সোডার গ্লাসটার দিকে তাকিয়ে সেই কথাই ভাবছিলাম।

আপনি বরং দিন কয়েক বিশ্রাম নিন, অন্য লেখকদের লেখা দিয়ে দু-এক সংখ্যা পত্রিকা চালিয়ে নেওয়া যাবে। তা ছাড়া, কবির লেখা ত কিছু কিছু পাওয়া যাবেই।

কোন দিকেই কোন আশা নেই পবিত্র, সিগারেটে একটা দীর্ঘ টান দিয়ে বললেন চৌধুরী মহাশয়, কবিও ঠিক ওই কথাই জানিয়েছেন—তাঁরও লেখা আসছে না। আর পাঁচ জনের কথা যে তুমি বলছ, সে পাঁচ জনই বা কোথায়?

কেন, নতুন পুরাতন অনেক লেখকই লেখা পাঠাচ্ছেন, আর নতুনদের মধ্যেও ভাল ভাল লেখকের সন্ধান পেয়েছেন আপনি।

কিন্তু প্রাণের সাড়া আর পাচ্ছি না পবিত্র। আগে যাঁরা মনে প্রাণে 'সবুজ পত্র'-কে ভালবেসে তার চারপাশে গুঞ্জন করতেন, এখন তাঁরা কালেভদ্রে আসেন। লেখা হয়ত পাঠান কিন্তু অন্য ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ে 'সবুজ পত্র'-এর জন্য ভাববার অবকাশ পান না। নতুন নতুন

চিন্তার বাহন না হতে পারলে শুধু টিকে থাকার মধ্যে 'সবুজ পত্র'-এর সার্থকতা কোথায়!

একটু কাল চুপ করে থেকে আমি বললাম, যোগ্য লেখকের অভাব 'সবুজ পত্র'-এর কোন দিন হবে না—এ বিশ্বাস আমার আছে।

আমি কিন্তু আজ আর আশাবাদী হতে পারছি না পবিত্র, বললেন চৌধুরী মহাশয়। 'সবুজ পত্র'-এর যোগ্য লেখক অনেক থাকলেও 'সবুজ পত্র'-এর যোগ্য লেখা লিখতে তাঁরা আজ অনেকেই আলস্য বোধ করছেন। হয় ত তাঁদের পক্ষে যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত কারণও আছে—আর পাঁচজনকে অপরাধী মনে করবার আগে নিজেকেই ত অপরাধী করতে হয় সবচেয়ে বেশী।

দেখলাম চৌধুরী মহাশয়ের হতাশা গভীর, যুক্তিতর্কে তাঁকে ভরসা দেব, এমন চিন্তাও আমার কাছে ধৃষ্টতা মনে হল। বললাম, আর বছর যখন কাগজ বন্ধ করে দেবার প্রস্তাব করেছিলেন, তখন কবি স্বয়ং প্রবল বাধা দিয়েছিলেন।

উদাস দৃষ্টিতে সামনের দিকে চোখ মেলে বললেন চৌধুরী মহাশয়, তিনি আজ বাধা দিলেও ত ভরসা পেতাম। নিরর্থক বাধা তিনি দেন না। তাঁর মধ্যে প্রেরণার বাণী থাকে, থাকে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস। আজ তিনি উদাসীন।

আপনি কবিকে আপনার সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন কি? আমি প্রশ্ন করলাম।

জানিয়েছি বই-কি। কবি লিখেছেন তাঁর মধ্যেও অবসাদ এসেছে, বিশেষ করে বয়স হয়েছে তাঁর, আগের মত আর লিখতে পারছেন না। তাই লিখেছেন, ভরসা দিই কেমন করে?

কবির অবসাদ সাময়িক। একথা কিছুতেই স্বীকার করে নেওয়া যায় না যে, কেশে পাক ধরেছে বলেই তার দিকে নজর দিয়ে তিনি নিরস্ত হবেন।

একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে জবাব দিলেন চৌধুরী মহাশয়, অবসাদ সাময়িক হলেও তা মারাত্মক। সময় মত রসসিঞ্চন না হলে 'সবুজ পত্র' ঝলসে যায়, তারপর যতই জল ঢাল, যতই সার লাগাও সবুজের সে তেজ আর ফিরে আসে না।

আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। চৌধুরী মহাশয়ের হাতের সিগারেটটা পুড়ে ছাই হয়ে যেতে লাগল। কিছুক্ষণ বাদে বললেন, তোমার কথা ভাবছি পবিত্র। একটা রুজি-রোজগার ত দরকার। ইম্‌প্রুভ্‌মেন্ট ট্রাস্টের চাকরিটাও ত বুঝি ছেড়ে দিয়েছ।

আমি বললাম, এতখানি যোগ্যতা আমার নেই যে আপনার নিরুৎসাহ মনে আশা যোগাব, অন্তত সাময়িক ভাবেও 'সবুজ পত্র'-এর সম্পূর্ণ দায়িত্ব তুলে নেবো নিজের হাতে। তা বলে নিজের পেটটা চালিয়ে নিতে পারব আপনার আশীর্বাদে।

নিজের পেট কাক-পক্ষীও চালাতে পারে, কিন্তু তুমি সংসারী লোক, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চৌধুরী মহাশয় বললেন।

সে যাহোক করে চলে যাবে, কিন্তু 'সবুজ পত্র' উঠে যাওয়া সমগ্র বাঙলা দেশের ও সাহিত্যের দুর্ভাগ্য। তার তুলনায় আমার নিজের ক্ষতি কতটুকু! অর্থ ক্ষতিটা ধরিই না 'সবুজ পত্র'-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আমি, স্বয়ং প্রমথ চৌধুরী আমার পৃষ্ঠপোষক, এই জোরে আমি কলকাতার সমগ্র কেউ-কেটা সমাজে মাথা উঁচু করে চলি। সেই আশ্রয় যদি আজ আমার ভেঙে যায়, তবে আমি কে? লক্ষ লক্ষ অতি সাধারণ নগণ্যদেরই একজন।

প্রমথ চৌধুরীর পৃষ্ঠপোষকতার যদি এতখানি মূল্য থাকে, ম্লান হাসি হেসে বললেন চৌধুরী সাহেব, সে পৃষ্ঠপোষন থেকে তুমি বঞ্চিত হবে না কোনদিনই। কিন্তু এই মুহূর্তে যে লোকসানটাই তোমার বড় মনে হোক পবিত্র, চাকরি তোমাকে এখন যোগাড় করে নিতেই হবে এবং সেইটেই সব চেয়ে বড় এবং আগে দরকার। আমাকে দিয়ে যদি কোন সাহায্য হয়, নিঃসঙ্কোচে এসে আমাকে বলো। আপাতত তিন মাসের মাইনে তোমায় দিয়ে দি—যাতে তুমি একেবারে বিপন্ন না হয়ে পড়।

চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাবে আমার কৃতজ্ঞতা ছাপিয়ে উঠল সঙ্কোচ। একটু ইতস্তত করে বলে ফেললাম, আপনি দেবেন, আমি না বলতে পারি না, কিন্তু যে কাজ করব না, তার জন্য মজুরী নিতে আমার 'কিন্তু' বোধ হয়। সংগ্রাম করে অনেকেই ত বেঁচে থাকে সংসারে।

সে কথা ঠিক, বললেন চৌধুরী মহাশয়। কিন্তু রসদের উপর সংগ্রামের জয়-পরাজয় নির্ভর করে। সংগ্রামেই ত ঠেলে দিচ্ছি তোমাকে, জয়যুক্ত হও—এই রইল আমার অন্তরের আশীর্বাদ।

এইটেই সংগ্রামে বড় রসদ হবে, আমি বললাম।

হোয়াট টু ইজ এ ভ্যানিটি, জগৎটা বস্তুময়। সবুজ পত্র থেকে গ্র্যাচুইটি তুমি নিশ্চয়ই দাবি করতে পার? এ তিন মাসের টাকা যেটা দিচ্ছি এটা' তার পার্ট-পেমেণ্ট। এর মধ্যে চাকরি-বাকরি কিছু না জুটলে আবার এসে টাকা নিয়ে যাবে—এই রইল আমার নির্দেশ। আর চাকরি জোটানোর ব্যাপারে আমি বলে দিলে যদি কোথাও সুবিধে হয় মনে কর, আমাকে অবশ্য এসে বলবে।

পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেল যেন। রোজগার বন্ধ হল বলে নয়, 'সবুজ পত্র'-এর পবিত্র গাঙ্গুলী অধুনালুপ্ত 'সবুজ পত্র'-এর ভূতপূর্ব হয়ে গেল বলে।

ন'মার কাছে বিদায় নিতে গেলাম। তিনি বললেন, ব্যাপার ত সবই জানি, কিন্তু রবিকাকার কাছ থেকেও কোন ভরসা না পেয়ে উনি একেবারে মুষড়ে পড়েছেন। আমি হয়ত কখনো সখনো লিখি, কিন্তু ওঁদের কলম বন্ধ হলে শুধু আমার লেখায় 'সবুজ পত্র' চলে না।

আমি বললাম, সাহেব যখন নিজেই আর ভরসা পাচ্ছেন না তখন আমারও আর কিছু বলবার থাকতে পারে না। আপনাদের আশ্রয় ছেড়ে গিয়েও আপনাদের স্নেহ আমি নিরবচ্ছিন্ন ভাবেই পেয়ে এসেছি। আজ সম্পর্কের সূত্র কেটে গেল, আশঙ্কা হচ্ছে, সেই ধারায়ও কখন ছেদ পড়ে যায়।

প্রয়োজনের তাগিদে মানুষ চলে, বললেন ন'মা, একথাও যেমন সত্য, প্রয়োজন ছাপিয়েও মানুষে মানুষে অচ্ছেদ্য সম্পর্ক গড়ে ওঠে—একথাও তেমনি সত্য, পবিত্র। নিয়মিত যাওয়া-আসা বন্ধ হয়ে গেলেই ত আর তুমি আমাদের পর মনে করতে পারবে না।

আপনাদের পর মনে করলে কি সম্পদ নিয়ে চলব সংসারে? সচেতন প্রচেষ্টা সত্ত্বেও চোখের পাতা ভিজে উঠেছে তা আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম। সাধ্যমত গলা সামলে নিয়ে বললাম, আপনাদের স্নেহের মূলধন নিয়েই আমাকে কারবার করতে হবে। সাহেব বলেছেন, চাকরি-বাকরির ব্যাপারে দরকার হলেই তিনি সুপারিশ করে দেবেন, আর যতদিন চাকরি না হয় ততদিন আমার চলার ভারও তিনিই নিয়েছেন।

তোমার সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করবেন, সে কথা আমাকে আগেই বলেছেন তিনি। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে, 'সবুজ পত্র' উঠে গেলে ওঁর মনের হতাশা

আরও বেড়ে যাবে, তখন হয়ত জীবনকেই মনে করবেন দুর্বহ। যত শীগগির সম্ভব আমি এ সম্বন্ধে রবিকাকার সঙ্গে পরামর্শ করব। আর দেখ, আমারই বা কি অবস্থা! একদিন বাড়ী ছিল জমজমাট, আজ সব খালি। মঞ্জু-জয়া চলে গেছে তাদের মায়ের কাছে, বীরেন আর নগেনও চলে গেছে। 'সবুজ পত্র'-এর বৈঠকও আর বসছে না।

কিছুক্ষণ আমি আর কথা বলতে পারলাম না। ন'মাও চুপ করে রইলেন। অবশেষে আমি পায়ের ধুলো নিয়ে বললাম, আজ আসি। সময় পেলেই আসব। আপনি আশীর্বাদ করুন।

ন'মা বললেন, এখনই তোমার যাওয়া হতে পারে না পবিত্র। বেলা অনেক হয়ে গিয়েছে, খাওয়া-দাওয়া করেই যাও।

ননীকে ডাকলেন, বললেন, বাবুর স্নানের ব্যবস্থা করে দাও।

আমি বললাম, স্নান আমি সেরে এসেছি।

ননী, ঠাকুরকে বলে দাও পবিত্রবাবু এখানে খাবেন।

ননী চলে গেল, আমিও বারান্দায় এসে বসলাম।

কিছুক্ষণ বাদে বারান্দায় আমার চেয়ারের পাশে বেঞ্চের উপর বসে পড়ল ননী, হাতের ঝাড়নটা দিয়ে মুখের ঘাম মুছতে লাগল।

তোদের খবরাখবর কি রে ননী? আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

দীর্ঘ নিঃশ্বাস নিয়ে ননী বলল, অতবড় সাহেবের বাড়ীর বড় বড় খবর আমি কি জানি বাবু, আমি হলাম চাকর। আপনি সাহেবের বই লেখার সাকরেদ, খবরত আমি আপনার কাছেই শুনব।

আমি সাকরেদ নই ননী, তোমার সাহেবের সাকরেদ হতে অনেক বিদ্যা লাগে, সে বিদ্যা আমার নেই। বই লেখা বন্ধ হল, আমারও চাকরি গেল।

কেমন যেন এ বাড়ীর সব বিগড়ে গেল বাবু, বলে চলল ননী। আপনি চলে গেছেন, বীরেনবাবুও চলে গেলেন দেশে, নগেনবাবুও চলে গেলেন। দিদিমণিরা চলে গেলেন, সাহেব বাড়ী বেচে দিলেন। পুরানো ঠাকুরেরও জবাব হয়ে গেল, এল নতুন ঠাকুর। আগে কত বাবু সাহেব আসতেন সকালে বিকালে। চায়ের পর চা আনতাম আমি। এখন সব নিঝুম হয়ে গেছে। শুধু আমি সবকিছুর সাক্ষী হয়ে বসে আছি। আর আছেন বিনয়বাবু।

বিনয় আছে? আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

তিনি আছেন। সময়মত স্কুলে যান, বাড়ীতে যখন থাকেন বই নিয়েই নিজের ঘরে বসে থাকেন চুপচাপ। আছেন কি না-আছেন, বুঝবার জো নেই।

পিসিমার খবর কি ননী? আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

তিনি যেমন ছিলেন তেমনি আছেন, ননী জবাবে বলল, রোজ সকালে এখনো সব ভাইয়ের বাড়ীতে একবার করে তদারকী করে যান। তাঁকে আমি ভয় করি না বাবু। সাহেব আর মেমসাহেব সোনার মানুষ, বাইরের লোককে আমার ভয় কি? মেমসাহেবকে ত আপনি জানেন, আপন-পর নেই, সকলের সমান ব্যবস্থা। চাকর-বাকরও তাঁর কাছে ভদ্রলোক। শত অপরাধ করলেও চড়া স্বরে কথা বলেন না কোনদিন। সকলের সুখ সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখছেন। আর সাহেব ত মহাদেব, বই আর খবরের কাগজে ডুবে আছেন। দিনান্তে দু-একটা যা হুকুম করেন, তাও একবার বলেই খালাস। হল, না-হল সেদিকে খেয়াল নাই।

উঠে দাঁড়িয়ে বললে ননী, দেখি, আপনার খাবার জায়গা করে দি। সেদিন ত আর নেই, যখন ঘড়ি ধরে সারি দিয়ে আসন পাতা হত। বিনয়বাবু খেয়ে গেলে পর সেই দুপুর একটায় সাহেব-মেমসাহেব খান, ঠাকুর গদাইলস্করী চালে রয়ে বসে কাজ করে।

খাবার সময় ন'মা তাঁর অভ্যস্ত চেয়ারটিতে বসলেন, যদিও বাড়ী এবং খাবার জায়গা সবই বদল হয়ে গেছে। বাজারের হিসাবপত্র পরিদর্শনও নেই, হয়ত আগেই সেরে ফেলেছেন। মনে হল, আমার খাওয়ার যাতে অসুবিধা কিছু না হয়, তাই এসে বসেছেন।

অসুবিধা কিছু হল না, মেম-সাহেব যার খাওয়ার সামনে এসে বসেছেন, তাকে পরিপাটি করেই পরিবেশন করলে ঠাকুর।

খাওয়া-দাওয়া করে যখন রওনা হলাম, তখনও সাহেব বই নিয়ে বৈঠকখানায় বসে আছেন। প্রণাম করতেই বললেন, তুমি কিছু মনে করো না পবিত্র, নিরুপায় হয়েই, 'সবুজ পত্র' বন্ধ করে দিলাম।

সানিপার্ক থেকে বেরিয়ে উদ্দেশ্যহীন ভাবে উত্তর দিকে হাঁটতে শুরু করলাম। হঠাৎ এই অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে ভেবেই পেলাম না, কোথায়

যাব, কি করব। এর আগেও ঘাট থেকে ঘাট বদল করেছি, কিন্তু তার মধ্যে নিজের সচেষ্ট প্রচেষ্টা ছিল। কি করব, জেনে শুনে প্ল্যান করেই এক-একটা কাজ ছেড়ে এসেছি। এবার একেবারে আকস্মিক দুর্যোগ।

মেসের দিকেই ফিরব, কি, মাঝপথে কোথাও জমে যাব—এই কথা ভাবতে ভাবতে নোনাতলায় এসে ট্রাম ধরলাম, নামলাম এসে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের মোড়ে। ফুটপাতে দাঁড়িয়ে আছি রাস্তা পার হওয়ার প্রত্যাশায়, এমন সময় পিছন থেকে অনভ্যস্ত কণ্ঠের ডাক শুনলাম, পবিত্র!

ফিরে চেয়ে দেখি খদ্দরের ধুতি-পাঞ্জাবি-পরিহিত দীর্ঘাকৃতি কৃশতনু এক যুবক আমার দিকে চেয়ে হাসছে। বললে, চিনতে পারছ না নিশ্চয়ই।

একটু থতমত খেয়ে গেলাম। সত্যিই চিনতে অসুবিধা হচ্ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অসুবিধা রইল না। তার পোশাক বদলেছে, কিন্তু মুখের হাসিটি তেমনিই রয়েছে। বললাম, আরে ল্যারেন্স!

আমার হাতটাকে টেনে নিয়ে যুবক জবাব করলে, ভুল করলে দাদা, ল্যারেন্স কে? আমি শ্রীআশু বন্দ্যোপাধ্যায়—ল্যারেন্স এ. টি. ব্যানার্জি বলে যাকে জানতে, সে কোথায় হারিয়ে গেছে। আর কোনদিন তাকে খুঁজে পাবে না, মরেই গেছে বোধ হয়।

আমি বললাম, এটা বিপ্লবী পরিবর্তন নয়, নিছক বিবর্তন বন্ধু। কিন্তু ল্যারেন্সই যে ছিল ভাল, আর পাঁচ জন থেকে বৈশিষ্ট্য নিয়ে সে বাঁচত, নিজের মতন করে।

ওইখানে একটু ভুল হয়ে গেল দাদা। তার পরেই বললে, হাতে সময় আছে কিছু? তাহলে চল, পার্কে গিয়ে গল্প করি।

উদ্দেশ্যবিহীন হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি, কাজেই পার্কে বসে গল্প, সে ত স্বাগত প্রস্তাব। আমি বললাম, কতদিন পরে দেখা বন্ধু।

ওয়েলিংটন স্কোয়ারে ঢুকে কোন বেঞ্চিতে নয়, একটা পাম গাছের তলায় ঘাসের উপর দুজনে বসে পড়লাম।

ল্যারেন্স বললে, নিজের মত করে বাঁচার কথা বলছিলে না? তা আর কবে করেছি? তোমাদের পাঁচ জন থেকে কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল ঠিকই, কিন্তু অন্যের নকলনবিশী করতে গিয়ে সেই বাঁদর ব'নে গিয়েছিলাম, যে মানুষের নকল করতে গিয়ে বাঁদর সমাজ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে

গিয়েছিল, অথচ মানুষ তাকে বাঁদর ছাড়া আর কিছুই ভাবে নি। আমি যা তা-ই, ময়ূরপুচ্ছ পরলেই দাঁড়কাক ময়ূর হয় না।

যাক, চাকরি-বাকরি ঠিক আছে ত? আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

না ভাই, তাও ছেড়ে দিয়েছি। ইংরেজরা এদেশে বসে আমাদেরই শোষণ করছে, আর নিজেদের ফাঁপিয়ে তুলছে দিনে দিনে, সেই শোষণের সহায়তা করা আমার দ্বারা আর সম্ভব নয়। মহাত্মা গান্ধী বলেছেন, ভারতীয়েরা যদি সত্যিকার অসহযোগ করতে পারে, তাহলে দুদিনে ভেঙে পড়বে ইংরেজের রাজত্ব, ছিন্নভিন্ন হবে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা জাল।

গান্ধীজীর নাম উচ্চারণ করবার সময় হাত জোড় করে কপালে ঠেকাল ল্যারেন্স। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কি করছ তাহলে এখন?

কিছুই না, অত্যন্ত সহজভাবে উত্তর করে ল্যারেন্স। চরকা প্রচারের কাজে লাগব ভেবেছিলাম, কিন্তু যেটুকু ঘোরাফেরা করেছি তাতে উৎসাহ পাই নি। ব্যবসাই জাতির মেরুদণ্ড, তাই ব্যবসায় নামব ভাবছি।

কি ব্যবসা করবে তুমি? আমি প্রশ্ন করলাম।

বড় ব্যবসা করতে পারব না, বলে ল্যারেন্স, মূলধনের জোর নেই। সামান্য কিছু আছে, সংসার খরচ বাঁচিয়ে স্ত্রী যা সঞ্চয় করেছিল। বাঙালী মেয়েদের জান ত, যত টানাটানিই থাক সংসারে, তার ভিতর থেকে ঠিক কিছু উদ্বৃত্ত করে রাখবেই। সেই জমানো পয়সাকে মূলধন করে একটা সোডা-লেমনেড তৈরীর কারবার করব ভাবছি।

আমি হেসে বললাম, বন্ধু, গান্ধীজীর আদর্শে ও জিনিসটা ত একেবারে অবান্তরের মধ্যে পড়ে। জীবন-যাত্রাকে জটিল করার সহায়ক। দেশের লোককে সেই জিনিস সরবরাহ করে গঠনমূলক কোন্ কাজ হবে, আমার মন তাতে সায় দিচ্ছে না।

তোমার কথা আমি মানতে পারছি না, বললে ল্যারেন্স, কলকাতা শহরের নগরজীবন লোপ পেয়ে যাবে, এমন স্বপ্ন দেখা পাগলামি। আর সেখানে ঝরনার জল বা নদীর স্নিগ্ধ পানীয় কোন দিন পাবে না লোকে। স্বাস্থ্যকর খাঁটি সোডা-লেমনেড তাই অবান্তর জটিলতা বৃদ্ধি নয়, অপরিহার্য। সাহেবরা তাই বেচেই লাখ লাখ টাকা মেরে নিচ্ছে আমাদের পকেট থেকে।

তোমার পরিকল্পনায় আমি বাধা দিতে চাইনে, আমি বললাম, তবে কি জান, সদ্য বেকার হয়েছি, পয়সা দিয়ে জল কিনে খাবার সম্ভাবনায় আস্থা রাখতে পারছি না।

বেকার হয়েছ, কেন? সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে ল্যারেন্স। চৌধুরী মহাশয়—

ওর আরব্ধ বাক্য আমি শেষ করে দিলাম। বললাম, 'সবুজ পত্র' বন্ধ হয়ে গেল। আজই সকালে এই সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন আমাকে।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে ল্যারেন্স, 'সবুজ পত্র' বন্ধ হয়ে গেল, সত্যি এটা দেশের দুর্ভাগ্য। বীরেন অবশ্য 'সবুজ পত্র' নিয়ে মাঝে মাঝে অনেক ঠাট্টা-টিটকিরি করেছে। আমি ওর মুখের ওপর প্রতিবাদ করিনি, কিন্তু বুদ্ধিবিচারের যে প্রখর মাইক্রোস্কপিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সমাজ-সাহিত্য-রাজনৈতিক জীবন বিশ্লেষণ করেছে 'সবুজ পত্র', ভাষাকে করেছে সাবলীল, জাতীয় জীবনের নবজাগরণে তার প্রভাব অপরিমেয়।

কি করব বল ভাই, চৌধুরী মহাশয় নিজেই হতাশ হয়ে পড়েছেন। নিজে লিখতে পারছেন না, রবীন্দ্রনাথের লেখাও তেমন আসছে না, তাই জাত খুইয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে 'সবুজ পত্র'-এর মৃত্যু তিনি শ্রেয়ঃ বিবেচনা করেছেন।

তুমি তাহলে কি করবে এখন? আমার প্রশ্নই আমার প্রতি ছুঁড়ে মারল ল্যারেন্স।

আমার ত ভাই, মূলধন এক পয়সাও নেই, বললাম আমি। আর মূলধন থাকলেই ব্যবসার নামে তা খুইয়ে বসা ছাড়া ও দিকে আমার কোন যোগ্যতা নেই। জীবনে ভেসে চলায় আমার অভ্যেস আছে, অনিশ্চয়তার মধ্যে কিছুটা থ্রিল পাই না, একথাও বলব না। তাই এই অবস্থায় ভেসে চলার সম্ভাবনা ছাড়া, ঠিক এই মুহূর্তে আর কোন কিছুই চিন্তা করছি না।

বীরেনের খবর কিছু জান? ল্যারেন্স জিজ্ঞাসা করল।

কিছু না, বললাম আমি, দেশে চলে গেছে, এর বেশী আর কিছুই জানি না।

আমি কিন্তু আর একটু বেশী জানি, বললে ল্যারেন্স, বিয়ে করে

সম্পত্তি পেয়েছে কিছু, তাই ধনী ও প্রতিষ্ঠাবান আত্মীয়ের আশ্রয় ছেড়ে সে সম্পত্তির উপর নির্ভর করে গৃহবাসী হয়েছে।

পার্ক থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে বললে ল্যারেন্স, তুমি না ভাবলেও তোমার কথা ভেবে আমি একটু বিব্রত বোধ করছিলাম। তুমি হলে ফ্যামিলিম্যান, আমার কি, দুটো পেট, পরনের কাপড়টাও চরকায় সুতো কেটে বুনিয়ে নেবো ঠিক করেছি।

এ রকম দু-চারজন দরদী বন্ধু আমার যতক্ষণ আছে ততক্ষণ পরোয়া করি না।

ল্যারেন্স চলে গেল। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলাম এবার কোন্ দিকে পা বাড়াই। মনের মধ্যে অনেক নাড়াচাড়া করতে করতে মনে পড়ে গেল গোকুল নাগের ফুলের দোকানের কথা। সেই গোকুল নাগ, যার সব কিছুর মধ্যে প্রথম পরিচয়েই আমি এক অনির্বচনীয় রহস্যের সন্ধান পেয়েছিলাম।

হাঁটতে হাঁটতে মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে এসে ফুলের বাজারে ঢুকলাম। দোকান সন্ধান করতে কোন বেগ পেতে হল না। পশ্চিম থেকে পূব দিকে খানিকটা এগোতেই চোখে পড়ে গেল চেয়ার পেতে বসে আছে গোকুল। সামনা সামনি গিয়ে পড়তেই বললেন, এদিকে কি মনে করে?

আপনার সঙ্গেই দেখা করতে এলাম। আমার মুখের এই কথা শুনেই সহজ সুন্দর হাসিতে তার মুখখানি ভরে গেল, বললেন, সত্যি? এতদিনে মনে পড়ল তা হলে!

আসব আসব অনেক দিনই ভেবেছি, আমি বললাম, কিন্তু হয়ে ওঠে নি।

যে আভিজাত্যের খোলসের মধ্যে আপনার বাস, বলে চললেন গোকুল নাগ, তাকে ভেদ করে আমাদের মধ্যে এসে পড়তে, বাধো বাধো ঠেকবে বই-কি একটু।

কোন খোলসের মধ্যে আত্মরক্ষা করার অভিলাষ বা প্রয়োজন কোন দিনই বোধ করি নি, আমি জবাব করলাম। খোলস যেদিনই অস্বস্তিকর বোধ হয়েছিল, সেই দিনই প্রথম চৌধুরীর বাড়ী ছেড়ে নেমে এসে মেষের দলে ভিড়ে গিয়েছি।

মেসবাসীদের আপনি মেষ বলেন? গোকুল হেসে প্রশ্ন করলেন।

শুধু মেসবাসীকে কেন, আমি বললাম, দেশের লক্ষ লক্ষ মূক জনসাধারণ, তাদের জীবন মেষের জীবন ছাড়া আর কি!

আপনার ব্যঞ্জনায় যেন রাজনীতির গন্ধ পাচ্ছি।

রাজনীতির আমি বিশেষ ধার ধারি না। আমি যে অতি-সাধারণদেরই একজন একথাই বলতে চাই।

এতটা বিনয় না-ই বা করলেন। এ দেশের মুখর সমাজের সঙ্গে আপনার মেলামেশা, অর্থাৎ—যাঁরা কবি সাহিত্যিক বক্তা—আপনি ত তাঁদেরই দলে।

আর আপনি?

আমি নেহাৎ দোকানদার, বলেই হেসে উঠলেন গোকুল।

'ঝড়ের দোলা'র গল্পটা বোধ করি ব্যতিক্রম, আমি বললাম।

ঠিক তাই, বললেন গোকুল, সাহস হয় না মনের কথা বলতে। হয়ত অনেকেরই তা মনঃপূত হবে না। কারণ আমার না-আছে অভিজাত-সুলভ সংস্কৃতি, না আছে, আপনি যাকে বলবেন, মূক জনসাধারণের সঙ্গে একাত্ম-বোধ। গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার মনোভাব না থাকলে কিছুই করা যাবে না। আর বিদ্রোহের জন্য দল পাকাবার অনেক আগেই ক্ষেত্র তৈরী করতে হবে, বুদ্ধিমানদের বুদ্ধির গোড়ায় উস্কোনি দিয়ে।

বুদ্ধিতে উস্কোনি দেবার ভার নিয়েছিল 'সবুজ পত্র', কিন্তু তার জীবন হল স্বল্পস্থায়ী। হৃদয়কে অস্বীকার করে শুধু বুদ্ধির আবাদ করলে সে ফসলে পেট ভরতে পারে, কিন্তু প্রাণ ভরে না। যেমন প্রাচীনের দল, তেমনি নব অভিজাত সম্প্রদায়, নিজেদের স্বার্থকে সমাজের স্বার্থ আখ্যা দিয়ে হৃদয়বৃত্তিকে সম্পূর্ণ পিষে মেরেছে। এই কর্মব্যস্ত জীবনে হৃদয় নিয়ে বিলাস করার অবকাশ কোথায়? আমি বললাম।

হৃদয়কে যে কতখানি অবহেলা করেন, বললেন গোকুল, তার প্রমাণ ত আপনার কথায়। হৃদয়ের চাহিদাকে বিলাস বলে অবজ্ঞা করছেন, হৃদয়কে বাদ দিয়ে অনুভূতিতে বঞ্চিত হয়ে নিছক ছটা বিস্তার আর লাফালাফি—এতে কোন সুরাহা হবে কি কোন দিন?

এমন সময় দীনেশরঞ্জন এসে হাজির হলেন, হাতে সিগারেট জ্বলছে।

আমাকে দেখতে পেয়েই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন, আরে পবিত্রবাবু যে! একেবারে অপ্রত্যাশিত!

অপ্রত্যাশিত আপনিও আমার কাছে, আমি বললাম। আপনার সঙ্গে দেখা হওয়া আমার উপরি পাওনা।

না পেলেও ক্ষতি ছিল না, এই ত! বললেন দীনেশরঞ্জন, কিন্তু না দেখা হয়ে উপায়ও ছিল না, কারণ আফিস থেকে বেরিয়ে এখানেই আগে আসি আমি।

এমন মধুর পরিবেশে, আমি বললাম, চারদিকে ফোটা ফুলের সৌন্দর্যের মধ্যে সন্ধ্যেটা কাটানো—তার চেয়ে মধুর আর কি থাকতে পারে!

কিন্তু পবিত্রবাবু, বললেন গোকুল নাগ, আপনার যাঁরা বুদ্ধিজীবী বন্ধু তাঁদের কাছে ফুল ত একটা বোটানিকাল ইউনিট। বুদ্ধির তীক্ষ্ণ ফলায় সব কিছু চিরে দেখা যাঁদের অভ্যেস, আর সেটাকেই যাঁরা একমাত্র সুসঙ্গত দেখা মনে করেন, তাঁদের কাছে ফুল ত বোঁটা, রেণু আর পাপড়ির সমষ্টি ছাড়া আর কিছু নয়।

কিন্তু গোকুলবাবু, ফুলের যেখানে বাজার সেখানে আগন্তুকরা যা-ই মনে করুন না কেন, ফুল সেখানে কমার্শিয়াল ইউনিট ছাড়া আর কি বলুন!

পৃথিবীটাই যে আজ কমার্সের দিকে ঝুঁকে পড়েছে, বললেন দীনেশরঞ্জন।

তবু ফুলের বেসাতি করে একটা জিনিস আমরা শিখতে পারি, দুনিয়ার সবাইকে এক ছাঁচে ঢেলে এক জীবনযাত্রায় নিক্ষেপ করলে যারা মধুর, যারা সুন্দর তারা হয় কুৎসিতের সঙ্গে একাকার হয়ে যাবে, নয় যাবে মিলিয়ে।

চশমার ভিতর দিয়ে গোকুলের বড় বড় চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠল কথাগুলি বলতে বলতে। একটু থেমে বলে চললেন, যে ফুল যত সুন্দর, যত মধুর, তার জন্য তত যত্ন করতে হয়। চাই বিশেষ মাটি, বিশেষ সার, কারো চাই ছায়া, কারো বা আলো। কারোর জলেই পুষ্টি, কাউকে বা জল থেকে দূরে রেখে বাঁচাতে হয়। কিন্তু আধুনিক দুনিয়ার দিকে চেয়ে দেখুন, সব মানুষের জন্য ঢালাও ব্যবস্থা, বাঁচ—বাঁচ; মর—মর। সৌন্দর্য মাধুর্য—কোন কিছুর দাম দেবে না কেউ। অনুভূতিকে বলা হবে—বিলাস। মানুষকে কমার্শিয়াল ইউনিট বলে ব্যবহার করেও গোঁড়া নীতি ও দর্শনের রোলারে তার কমার্শিয়াল মূল্যই দেবে গুঁড়ো করে।

আমি জবাব করলাম, ইংরেজী প্রবাদ : A man is known by the company he keeps—এটা আংশিক সত্য। হয়ত বুদ্ধিসর্বস্ব মহলে আমার ঘোরাফেরার খবরটাই আপনারা পেয়েছেন, কিন্তু তাই বলে মানুষের হৃদয়-বৃত্তিকে আমি স্বীকার করি না, নীতি ও গোঁড়ামির গতানুগতিক ছাঁচে মানুষকে ঢালাই করার নীতিতে বিশ্বাস করি—আমার সম্বন্ধে এ অপবাদ দেওয়াটা একটু অবিচার হয়ে যাচ্ছে। আমি নিজেই এখনো বুঝতে পারিনি, কেমন করে নিজেকে প্রকাশ করব এবং কোনদিন তা পারব কি-না। যদি বলি র‍ঁলার মানসপুত্রের মত বেদনা ও অশান্তি আমার বুকে, তাহলে লোকে পাগল বলবে।

আমি কিন্তু বলব উল্টো, যারা তার জন্যে আপনাকে পাগল বলবে তারাই ত পাগল, গোকুল উত্তেজিত হয়ে জবাব দিলেন।

আমি বললাম, কিন্তু উপায় কি? পাগলের সমাজে বেশী সুস্থ চেতনা দেখাতে গেলে পাগলের হাতে খুনই হয়ে যেতে হবে।

কিন্তু তাই বলে অসত্য ও অসুন্দরের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে? বলতে বলতে দাঁড়িয়ে উঠলেন গোকুল।

দীনেশরঞ্জন চুপ করেই শুনছিলেন, এবার গোকুলের উত্তেজনা দেখে মুখ খুললেন, মেনে নিতে হবে না, তা ঠিকই ; কিন্তু নতুন জীবনবোধ শুধু মুখের কথায় ত প্রতিষ্ঠা করা যায় না ভাই!

গোকুল বললেন, কিন্তু পথ দেখাবেন সাহিত্যিকেরা। ইউরোপে সে অভিযান শুরু হয়ে গেছে। আর আমাদের দেশের সাহিত্যিকেরা গতানুগতিকতার তালে তালে তালি বাজাচ্ছেন।

উপায় কি বলুন, আমি বললাম। একজন দুজন হাততালি দিলে সে তালি হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে। আমি আপনি দীনেশবাবু বড় জোর এক-আধখানা 'ঝড়ের দোলা' বার করে গালাগাল খেতে পারি।

শুধু গালাগালিই খেয়েছি, একথা আমি বিশ্বাস করি না, বললেন গোকুল। দোলা লেগেছে নিশ্চয়ই অনেকের মনে। খবরটা হয়ত আমাদের কাছে পৌঁছয়নি এখনো।

ঢেউ তুলে দিতে পারলে ভাসতে ভাসতে অনেকেই আসবেন, বললেন দীনেশরঞ্জন, আসবেন পবিত্রবাবুর মত। ক'জনের খবর আমরা জানতে পারি?

অনেক দলে মেলামেশা করেছি, আমি বললাম, কিন্তু ভিড়ে পড়তে পারিনি এখনো কোন দলে। চাকরির দিক থেকে আজই আমি বেকার হয়েছি। দর্শনতত্ত্ব নীতি—সব ভাববার অবকাশ পাব, হয়ত মনের মধ্যে সিদ্ধান্তও করে ফেলেছি। কিন্তু আপাতত আমাকে চাকরি যোগাড় করতে হবে।

সাময়িক প্রয়োজনের তাগিদ আপনাকে মেনে নিতেই হবে, বললেন গোকুল, কিন্তু মনে যদি ঝড় জেগে থাকে, ক'দিন পারবেন নিজেকে বঞ্চিত করে জীবিকার দাসত্ব করতে?

যেদিন পারবেন না সেদিন পথ বেছে নেবেন ঠিকই, বললেন দীনেশরঞ্জন।

আমি বললাম, পথ বাছার সমস্যা বড় নয়, পথ বাঁধার সমস্যাই প্রধান। বাঁধা পথে চলে আনন্দ কোথায়, নিজের পথ কেটে নেবো মনের মত করে; কিন্তু একার হাতে পথ কাটায় ব্যর্থতা অনিবার্য।

তাহলে পথ কাটার সঙ্গী পেলে আপনি রাজী আছেন? জিজ্ঞাসা করলেন দীনেশরঞ্জন।

নিশ্চয়ই, জোরের সঙ্গে বললাম আমি, ঝড়ের দোলা লেগেছে আমারও মনে, সাধ্য যদি থাকত সব কিছু উড়িয়ে ভাসিয়ে দিতাম।

বেকারির বে-পরোয়ায় কিংবা গোকুল-দীনেশরঞ্জনের উৎসাহের আতিশয্যে জানি না, সেই মুহূর্তে মনের মধ্যে জেগে উঠল এক অপরিমেয় আত্মপ্রত্যয়। মনে হল, আমরা তুচ্ছ নগন্য হলেও আমাদের সম্ভাবনা অনন্ত। উদ্বেল হয়ে উঠতে পারলে এই অচলায়তনের ভিত্ নাড়িয়ে দিতে পারি আমরা। ভাসিয়ে দিতে পারি দুকুল।

তারপর?—তারপর আপনা থেকেই হবে নতুনের আবির্ভাব—প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে।

পরিশিষ্ট

শরতচন্দ্রের সাহিত্যিক হৃদয়াবেগের আলোচনায় যতই ভুলে থাকিনা কেন, হৃদয়-আবেগ ছাড়াও আর একটা জিনিসের যে বড্ড বেশী দরকার সেটা উপলব্ধি করি মেসে ফিরে এলেই। মেসের চার্জ দিতে না পারলে তারা দু'দিন, চারদিন, কি বড় জোর, দশদিন সইবে, কিন্তু তারপর খাবারের থালা আসবার রাস্তা যাবে বন্ধ হয়ে। হৃদয়ের আবেগও চুপসে যাবে।

দিন কয়েক ধরে মেসের অবস্থা শোচনীয়, খিটিমিটি আর ভাল লাগে না। ওরা বুঝতে পারছে টাকা শোধ করবার আশু কোন সম্ভাবনা নেই আমার পক্ষে। কিন্তু এ কথা উপলব্ধি করতে পারছে না যে, আজ না দিলেও শেষ পর্যন্ত মেরে দেবো না।। দেবো এই স্থির বিশ্বাস আছে এবং অচিরেই দেবো। কিন্তু কোথেকে আসবে, এ প্রশ্নের আমার কোন জবাব নেই। কাজেই স্থানত্যাগেন দুর্জনম্। অবশ্য হোটেলের বাকী টাকা মেরে দিয়ে নয়। টাকা শোধ দিয়েই যাব। তা যে করেই হোক। তবে যেতে আমাকে হবেই। তাই একদিন সকালের দিকেই ডেরার সন্ধানে বেরিয়ে পড়লাম। ঘুরতে ঘুরতে এলাম নন্দকুমার চৌধুরী (বর্তমানে ডি, এল, রায় স্ট্রীট) লেনে। সেখানে ২৭ নম্বর বাড়ীতে একটা বোর্ডিং, সেখানেই আশ্রয় চাইলাম।

মালিকের ঘরে ঢুকে দেখি কবিবন্ধু হেমেন্দ্রলাল রায় আসীন। ব্যাপার কি, আমি প্রশ্ন করতে সে জানালো, মাথা গুঁজবার একটু ঠাঁইয়ের জন্য এসেছি। আমিও তাই, বলেই মালিকের কাছে আবেদন পেশ করলাম। তিনি জানালেন, হেমেনবাবুকে যা আগেই বলেছি, অর্থাৎ বোর্ডিং-এ কোন খালি সীট নেই।

তবে আপনারা যখন দুজন এবং পরস্পর পরিচিত বটে, তখন একটা ব্যবস্থা হতে পারে। এ বাড়ীর ছাদের যে চিলে কোঠাটা আছে তাতে চিলের পক্ষে ডানা মেলে উড়ে বেড়ানো অসম্ভব নয়। আমি বলি, ঘরটা দেখে যদি আপনাদের পছন্দ হয়, দুই বন্ধুতে সেটা নিয়ে নিন। আরো যদি দু-একজনকে জুটিয়ে নিতে পারেন তাহলে ত কথাই নেই। জন চারেক থাকতে কোন অসুবিধা হবে না। আরো দু-একজন হলেও সচ্ছন্দে আপনারা তেঁতুল পাতায় ঠেলাঠেলি করে বেশ থাকতে পারবেন। ভাড়া

একজনের বেলাতে যা নেবো, চার-পাঁচজন থাকলেও তাই। মাসে বাইশ টাকা।

টাকার ভাবনা পরে ভাবা যাবে, আগে চল ঘরটা দেখে আসি, প্রস্তাব করলেন হেমেন্দ্রলাল।

বাঃ দিব্য ঘর তো! মস্ত বড়। প্রচুর আলো হাওয়া। আর শেলি যার জন্য পাগল ছিলেন: মৃত্তিকা থেকে অনেক উর্ধ্বে থাকতে পারব আমরা। কিন্তু তা বলে হাওয়া খেয়েই বাঁচতে হবে না। একতলা দোতলায় দিব্য হোটেল, তার দৌলতে প্রভাতী চা থেকে শুরু করে নৈশ ভোজন পর্যন্ত সবই মিলবে বিনা পয়সায়। টাকা দেবার ভাবনা ভাবতে হবে—সেই তো একমাস পরে। ততদিনে যদি নেহাৎ কিছু জুটে না-ই যায়, তখন ভাবনা করা যাবে। আপাতত দুই বন্ধুতে নিশ্চিন্ত মনে পাশাপাশি শয্যায় কাব্যচর্চা করা—রোমান্টিক!

এই রোমান্টিক পরিবেশ মধুরতর হয়ে উঠল যখন আরো একজন রুম্‌মেট পাওয়া গেল। অসহযোগ আন্দোলনের ছাত্রনেতৃত্বে আত্মনিবেদন করেছেন, তরুণ সমাজকে বিশ্ববিদ্যালয়ের গোলামখানা থেকে বার করে নিয়ে আসবার ব্রত নিয়েছেন এমন একজন দেশপ্রেমিক। আমরা যারা দেশের জন্য কিছুই করতে পারলাম না, তারা এঁদের ত্যাগ দেখে নিজেরাই যেন নিজেদের কাছে ছোট হয়ে যাই। বালুরঘাট থেকে কলকাতায় এসেছেন তিনি, তাঁর কাছে নিত্য নতুন ত্যাগ ও স্বরাজ আন্দোলনের বর্ধমান প্রবলতার সংবাদ আমরা মুগ্ধ হয়ে শুনি। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস এই বছরেই—১৯২১ খৃষ্টাব্দ—৩১এ ডিসেম্বরের মধ্যে স্বরাজ আসবে। কেমন করে আসবে সে প্রশ্ন অবান্তর, গান্ধীজী বলেছেন আসবে এবং তাতেই এঁর দৃঢ় প্রত্যয়। তাঁর প্রত্যয়ের গভীরতা ও দৃঢ়তায় চালিত হয়ে আমিও বিশ্বাস করতে লাগলাম—গান্ধীজীর কথা মিথ্যা হতে পারে না।

এই প্রফুল্লকুমার নিয়োগী কয়েকদিনের মধ্যে আমাদের ঘরের চতুর্থ স্থানটি পূর্ণ করবার জন্য আর একজন সমধর্মীকে নিয়ে এলেন। দুজনেরই পরনে হাতে-কাটা মোটা খদ্দর। কিন্তু নবাগত যা দিয়ে আমাদের বিস্মিত করলেন তা হল তাঁর দীর্ঘ দেহ, গায়ে মাংস নেই বটে কিন্তু এতবড় দীর্ঘ পুরুষ আমি আজ পর্যন্ত কাউকে দেখি নি। পরবর্তী জীবনে গায়ে যখন তার বেশ মাংস লেগেছে তখন ঘন অন্ধকারে তার আবছা মূর্তি দেখলেও আমি চিনে

নিতে পারতাম। অপরকে সহজে চিনিয়ে দিতে পারতাম এই বলে যে, দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে অনবদ্য সামঞ্জস্য সমন্বিত অতি-মানব আকার যদি কারো দেখতে পাও, সঙ্গে সঙ্গে বুঝে নেবে সে মন্মথ রায়।

মন্মথও বালুরঘাটের ছেলে, কলকাতার হোস্টেলে থেকে স্কটিশ চার্চ কলেজে পড়ত। বি. এ. পরীক্ষা দেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু গোলামখানা থেকে বেরিয়ে এসেছে, আর সেই সঙ্গে হোস্টেলও ছাড়তে হয়েছে।

গোলামখানা ছেড়েছে বটে, ৩১এ ডিসেম্বরের মধ্যে স্বরাজ আসার স্বপ্নেও উদ্বুদ্ধ হয়ে আছে, কিন্তু চরকা খদ্দর স্বরাজ সংগ্রামের সে যুগের এই দুই হাতিয়ার মন্মথর মনকে মন্থন করতে পারে নি। তার রক্তে আছে ইতিহাস চর্চা। কিন্তু শুকনো ইতিহাস নয়, ইতিহাসের বস্তুকে জীবনের রসে সঞ্জীবিত করে জাতীয় জাগরণের রসদ হিসাবে পরিবেশন করতে তার আগ্রহ বেশী। তাই তার সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গী—যা আমাদের সঙ্গে অনায়াসে খাপ খেয়ে গেল।

ইতিহাস চর্চা মন্মথর রক্তে। পিতা দেবেন্দ্রগতি রায় রাজশাহী বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, দীঘাপতিয়ার কুমার শরৎকুমার রায়, রমাপ্রসাদ চন্দ—এঁদের সহযোগী হিসেবে তখন দেবেনবাবু বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির সক্রিয় পরিচালক। উত্তর বঙ্গে বরেন্দ্রভূমির ইতিহাস রচনায় এই সমিতির গবেষণা ও অনুসন্ধান আজ হয় তো অনেকেই বিস্মৃত হয়েছেন, কিন্তু সে বিস্মৃতি তো আমাদের জাতীয় আত্মবিস্মৃতির দুরপণেয় কলঙ্কের অঙ্গীভূত।

মন্মথ বি. এ. পরীক্ষা না দেওয়ায় দেবেন্দ্রবাবু মনে যথেষ্ট দুঃখ পেয়েছিলেন নিশ্চয়ই, তবে একমাত্র পুত্রের প্রতি বিরূপ হন নি। বন্ধু স্যর আবদুল হালিম গজনভির কাছে অনুরোধ জানিয়েছিলেন পুত্রকে তাঁর আপিসে কিছু কাজকর্ম-শিক্ষার সুযোগ করে দিতে। গজনভি তখন মস্ত মার্চেন্ট আর হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বন্ধুত্বে কোন খাদ সেদিনও মিশ্রিত হয় নি, কাজেই গজনভি সাহেব বন্ধুর অনুরোধ সহজেই রক্ষা করলেন এবং মন্মথ তাঁর আপিসে শিক্ষানবীশ হিসেবে যাতায়াত শুরু করে দিল।

আপিসের কাজ ছাড়া মন্মথর চিন্তা সমাজ ও ইতিহাস ভিত্তিক সাহিত্য। 'বঙ্গে মুসলমান' নামে একখানি একাঙ্ক নাটিকা তখনই সে রচনা

করেছে। কিন্তু সে নাটক শোনানোর চেয়েও তার বেশী আগ্রহ আমার কাছে কলকাতার সাহিত্যিক সমাজের নাটকীয় আখ্যান শোনা। প্রমথ চৌধুরীর আমি সহকারী ছিলাম, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। কাজেই আমার প্রতি তার সমীহ ও বিস্ময়ের অন্ত নেই। প্রমথ চৌধুরীর বৈঠকের গল্প, শরৎচন্দ্রের আসরের কাহিনী, রবীন্দ্র-সান্নিধ্যের কথা দিনের পর দিন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সে শুনেছে।

এই ভাবই বার বার প্রকাশ করেছে মন্মথ, রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, শরৎচন্দ্র যে দেশের সাহিত্যিক, মহাত্মা গান্ধী চিত্তরঞ্জন যে জাতির নেতা, তাঁদের তো পরাধীন থাকার কথা নয়। বার বার সে বলেছে, ৩১এ ডিসেম্বরের মধ্যে স্বরাজ আসবেই, তুমি দেখে নিও।

শীতের রাত্রে লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছি, হঠাৎ মাঝরাত্রে ভোঁ ভোঁ শব্দ। ঘুম ভেঙে গেল, তবু মটকা মেরে চুপ করে পড়ে রইলাম। লেপ মুড়ি দিয়ে যতই জড়সড় হবার চেষ্টা করি, কন্‌কনে হাওয়া গায়ে এসে লাগে। একটু চোখ মেলতেই দেখলাম, দরজাটা খোলা।

ব্যাপার কি? যার ভুলেই হোক খোলা যখন রয়েছে, বন্ধ না করে দিলে শীতে কষ্ট পেতে হবে। অতএব লেপটাকে জড়িয়ে নিয়ে উঠে পড়লাম বিছানা থেকে, অন্য বিছানাগুলির দিকে তাকিয়ে দেখবার প্রয়োজনও বোধ করিনি। দরজা বন্ধ করতে গিয়েই সামনে তাকিয়ে দেখি বাইরে খোলা ছাদে দাঁড়িয়ে আছে দুজন; দীর্ঘ আকার দেখে মন্মথকে বুঝতে অসুবিধা হল না। এগিয়ে গিয়ে দেখি সঙ্গে প্রফুল্ল। তখনো সেই বিরাট ভোঁ ভোঁ আওয়াজ চলছে।

আমাকে দেখে দুজনে প্রায় উল্লাসে জড়িয়ে ধরে। এখনো লেপ মুড়ি দিয়ে বুড়ী হয়ে বসে আছ! শুনতে পাচ্ছ না, স্বরাজ এসে গেছে?

কোথায় এল, কখন এল, কোথা থেকে এল? আমি প্রশ্ন করলাম।

শুনছ না, স্বরাজ আগমনের ঘোষণা বাজছে? দিনের আলো ফুটুক তখন চোখে দেখতে পাবে স্বরাজ। মন্মথ ও প্রফুল্লর বাচনভঙ্গীতে কি গভীর প্রত্যয়!

আমি বললাম, চোখের দেখা কাল দেখব, আপাতত তোমরা দুজনে ঘরে এসো তো। শীতের রাত্রে লেপের তলা থেকে একলাফে উঠে খালি

গায়ে এসে বাইরে দাঁড়ালে যে পরিণতি হয় স্বরাজ না আসার চেয়ে তা বেশী ক্ষতিকর। মাসটা পৌষ—সে খেয়াল আছে?

আছে বই কি। ৩১এ ডিসেম্বরই তো স্বরাজ আসার কথা। আর তাই তো ভোঁ বাজছে।

তোমাদের মাথা! কি মুশকিলেই পড়েছি দুই 'বাহে'কে নিয়ে, প্রতিবছরে ৩১এ ডিসেম্বর মাঝরাতে এমন ভোঁ বাজে ইংরেজী নববর্ষকে স্বাগত জানিয়ে।

দপ্ করে নিভে গেল ওদের উৎসাহ। হতাশ পদে ঘরে ফিরে আসতে আসতে মন্মথ বলে, তুমি বলছ স্বরাজ আসে নি?

গান্ধীজীর কথা ফলেছে কি না, তা কাল দিনের আলোয় চাক্ষুস করা যাবে, আমি বললাম। তবে আপাতত ওই ভোঁ স্বরাজের তূর্য-নিনাদ নয়, ইংরেজ-রাজত্বে আমরা বাস করছি, তাদের বছরই আমাদের বছর—তারই বলিষ্ঠ ঘোষণা।

বোবার মত এসে দুই বন্ধুতে শুয়ে পড়ল।

পর দিন মন্মথর বুকে পিঠে ব্যথা, তারপর জ্বর। ডাক্তার বললে প্লুরিসি। কঠোরতর জীবনে অভ্যস্ত প্রফুল্ল বহাল তবিয়তে রয়েছে।

ডাক্তার তো বলে খালাস কিন্তু আমরা সবাই তো ফোতো কাপ্তান। ওষুধপত্রের খরচ আসে কোত্থেকে? আমি বললাম, হোমিওপ্যাথ ডাকো। ওরা আমাকে হেসেই উড়িয়ে দিলে: ওই হ্যানিম্যানের জলপড়ায় প্লুরিসি সারে না।

তাহলে?

তাহলে আর কি? টাকার যোগাড় করতে হবে, বললে প্রফুল্ল এবং পরদিন সকালবেলা উঠে চলে গেল খিদিরপুরে কার কাছে টাকার সন্ধানে। হেমেন্দ্রলালও বেরিয়ে গেছে। এই ফাঁকে আমি ডাঃ বারিদবরণ মুখার্জিকে ধরে নিয়ে এলাম। সাহিত্য-পরিষদের সুবাদে ওই প্রখ্যাত সাহিত্যরসিক ডাক্তারের সঙ্গে আমার যেটুকু পরিচয় ছিল তারই সুবাদে তিনি সাগ্রহে এসে দেখে গেলেন বিনা ফি-তে এবং যাওয়ার সময় এক কৌটা ওষুধ খাইয়ে দিয়ে গেলেন।

বিকেল বেলাই উঠে বসল মন্মথ, জ্বর নেই, ব্যথা নেই, শরীর অনেকটা ঝরঝরে। পরদিন সকালেই দেবেনবাবু সস্ত্রীক এসে হাজির।

ইতিপূর্বেই তাঁদের তার করা হয়েছিল। আনুপূর্বিক বিবরণ শুনে দেবেন বাবু ছেলেকে বাড়ী নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত জানালেন। এবং আমার সঙ্গে বারিদবরণ ডাক্তারের কাছে এলেন চিকিৎসা সম্পর্কে নির্দেশ নিতে।

ডাঃ মুখার্জি ওষুধ সেবনের পরবর্তী অবস্থা শুনে খুশী হয়ে ভরসা দিলেন, আর ওষুধের দরকার নেই। দুই-এক দিন বাদে অন্নপথ্য করিয়ে দেশে নিয়ে গিয়ে ছেলেকে বিশ্রাম দিন।

প্রফুল্ল ও হেমেন্দ্র হ্যানিম্যানের জলপড়ার কেরামতি দেখেও মানতে চাইল না। দেবেনবাবুকে অনুরোধ করল, যেন দেশে নিয়ে গিয়ে যথাসম্ভব সুচিকিৎসার ব্যবস্থা অবশ্য করান।

* * *

মন্মথর প্লুরিসি সারিয়ে ছিলাম এক ফোঁটায় কিন্তু মাস কয়েক বাদেই যখন খবর এল দেশ থেকে, আমার পিতৃদেবের মৃত্যু হয়েছে ইনফ্লুয়েঞ্জায় তখন পল্লীজীবনের অসহায়তার কথা বড় বেশী করে মনে বাজল। ইনফ্লুয়েঞ্জা পরে অনেক দেখেছি, অনেক ভুগেছি, কিন্তু তখনকার এই নবাগত রোগটি 'ওয়ার ফিবার' বলে আমার যে ত্রাস সঞ্চার করেছিল তা বোধ হয় একেবারে কাটিয়ে উঠতে পারি নি।

নির্ঘণ্ট

খ

ঘ

ম

ঠ